বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্য : বিষয় ও ভাষারীতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মোঃ শরিফুল ইসলাম

শিক্ষাবর্ষ ২০১৩-২০১৪

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৩৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক

ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ

অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নভেম্বর ২০১৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ শরিফুল ইসলাম কর্তৃক উপস্থাপিত 'বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্য : বিষয় ও ভাষারীতি' শীর্ষক পিএইচডি অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে রচিত।

এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ গবেষক অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি।

(ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ)
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
এবং
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

সূচি

প্রসঙ্গকথা ৪-৮

প্রথম অধ্যায়
বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ইতিহাস ৯-৬২

দ্বিতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের বিষয়-বৈচিত্র্য ৬৩-১৮৯

তৃতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ভাষা-বিচার ১৯০-২২০

উপসংহার ২২১-২২২

পরিশিষ্ট : ১
সংগৃহীত নাট্যপালা
ক. নটপালা : রাধা-কৃষ্ণের পথরুদ্ধ ২২৩-২২৭
খ. সঙযাত্রা : পিতা-পুত্র ২২৮-২৩৫

পরিশিষ্ট : ২
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ২৩৬-২৪০

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

সুদীর্ঘ কাল ধরে বিচিত্র রীতি ও পদ্ধতিতে বিকশিত হয়েছে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্য। এদেশীয় নাট্যের বিবর্তন ও বিকাশের একদিকে রয়েছে পরিবেশনরীতির ইতিহাস, অন্যদিকে রয়েছে বিষয়বস্তুর প্রাচুর্য ও ভাষারীতির বৈচিত্র্য।

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের সামগ্রিক পরিচয়, উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, বিষয়বস্তুগত উত্তরাধিকার এবং সমকালীন চর্চার গতিপ্রকৃতি এবং ভাষা ব্যবহারের স্বরূপ বিশ্লেষণের লক্ষ্যে আমি ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে পিএইচডি-গবেষণায় নিবন্ধিত হই এবং ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে এই অভিসন্দর্ভ রচনা সম্পন্ন করি।

অভিসন্দর্ভে প্রধানত বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ইতিহাস ও বিষয়বস্তুর আলোচনায় উপেক্ষিত ভাষারীতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছি। ঐতিহ্যবাহী নাট্য যেহেতু সামাজিক মানুষের যৌথ সৃষ্টি, জনমানুষের সৃষ্টিশীলতার যৌগিক চিন্তা, জীবনব্যবস্থা ও অধ্যবসায়ের সমন্বিত চর্চার ইতিহাসের পরিচয়বাহী, সেহেতু এর পূর্বাপর ইতিহাস ও বিষয়বস্তুর সামগ্রিক পাঠভিন্ন ভাষারীতির আলোচনা প্রায় অসম্ভব। এ কারণে অভিসন্দর্ভের প্রথম দুটি অধ্যায়ে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ইতিহাসের নতুন পাঠ, ঐতিহ্যবাহী নাট্যের বিষয়-বৈচিত্র্য ও পরিবেশনরীতিগত নানাবিধ তথ্য ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছি।

সাম্প্রতিক কালের বাংলাদেশে প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ভাষার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের আলোচনা-বিশ্লেষণে মূলত আমার ব্যক্তিগত জনসাংস্কৃতিক সমীক্ষণ অভিজ্ঞতা ব্যবহার করেছি। অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ভাষারীতির পাশাপাশি সমকালীন নাট্যচর্চার ইতিহাস ও বিকাশের ধারা সম্পর্কে যথাযথ তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যাবে। এই আলোচনা-বিশ্লেষণে বাংলাদেশে বসবাসরত ইসলাম, সনাতন, বৌদ্ধ, খ্রিষ্ট, বৈষ্ণব ইত্যাদি ধর্মসম্প্রদায় এবং অন্য নৃগোষ্ঠীদের নাট্যপালা অন্তর্ভুক্ত করেছি। এতে যুগপৎ এদেশের নানা ধর্মমতের মানুষের সক্রিয় চিন্তা ও নানাবিধ সাংস্কৃতিক তৎপরতার ইতিহাস ও অসাম্প্রদায়িক পরিচয়ের কথা নতুনভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি বলে মনে করি।

Dhaka University Institutional Repository

দুই

বর্তমান গবেষণা-অভিসন্দর্ভটি প্রামাণিক (Documentory) এবং বিশ্লেষণাত্মক (Analytical) পদ্ধতির মিথস্ক্রিয়ায় সম্পন্ন করেছি। গবেষণাকর্মে জনসাংস্কৃতিক সমীক্ষার যে ধাপগুলো অনুসরণ করা হয়েছে, তা নিম্নরূপ :

স্থান নির্ধারণ এবং পালাকার-গায়েন-কুশীলব বা দল নির্বাচন
↓
আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট
↓
ধর্মীয় চিন্তা, ধারণা, আচার ও সামাজিক ব্যাখ্যা
↓
দর্শক বা শ্রোতৃমণ্ডলীর পরিচয়
↓
নাট্যপালা বা গান [গীতাশ্রিত নাট্য] প্রত্যক্ষণ
↓
নাট্যপালা সংগ্রহ
↓
সংগৃহীত 'নাট্যপালা'-র বিষয় ও ভাষারীতি বিশ্লেষণ

উপর্যুক্ত ধাপগুলো যেভাবে এই অভিসন্দর্ভে প্রয়োগ করা হয়েছে, তা হল :

ক. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী নাট্যপালা প্রত্যক্ষণ, মৌখিকভাবে প্রচলিত ও হাতেলেখা নাট্যপালার পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ।

খ. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী নাট্যপালা পরিবেশনের সঙ্গে যুক্ত পালাকার-শিল্পীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ।

গ. ঐতিহ্যবাহী নাট্যপালা পরিবেশন স্থানের পরিচিতি, দর্শক-শ্রোতা ও আয়োজক সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ।

ঘ. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী নাট্যের বিশেষত্ব ও তার ভাষা-বিচার।

ঙ. ঐতিহ্যবাহী নাট্যপালার ইতিহাস, সাম্প্রতিক পরিবেশন ও নাট্যপালা বিষয়ক গ্রন্থ, পত্রিকা, প্রবন্ধ থেকে তথ্য সংগ্রহ।

পর্যায়ক্রমে এই ধাপগুলো অনুসরণের মাধ্যমে গবেষণাকর্মটি সম্পাদিত হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের প্রয়োজনীয় অংশে জনসাংস্কৃতিক সমীক্ষণ থেকে সংগৃহীত ঐতিহ্যবাহী নাট্যের বিভিন্ন অংশের উদ্ধৃতি এবং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তিন

অভিসন্দর্ভটি সর্বমোট ৩টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিষয় ও পরিবেশনরীতির আঙ্গিক-বৈচিত্র্য এবং তৃতীয় অধ্যায়ে চলমান নাট্য পরিবেশনরীতিসমূহের ভাষা বিচার করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ইতিহাসের আলোচনার শুরুতে বৈদিকযুগের এক দিগ্বিজয়ী সম্রাটকল্প-ব্রাত্য হতে সম্রাট অশোক ও ভরতমুণি-র কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের পূর্বাংশে তথা বাংলাদেশে নাট্য পরিবেশনের সূচনার ইতিহাস, তার বিবর্তনের সূত্র অন্বেষণ করা হয়েছে। পরে চর্যাপদে উদ্ধৃত 'বুদ্ধ নাটক'-এর স্বরূপ অন্বেষণের পথ ধরে যথাক্রমে *গীতগোবিন্দ*, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, *চৈতন্যভাগবত*, *শূন্যপুরাণ*, মঙ্গলকাব্য, *রামায়ণ*, *মহাভারত*, *গুপীচন্দ্রের সন্ন্যাস*, পিরপাঁচালি, গীতিকা ইত্যাদি আশ্রিত ঐতিহ্যবাহী নাট্যের পূর্বাপর ইতিহাস গ্রন্থিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতে বাংলাদেশে প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী নাট্যের বিষয়গত শ্রেণিকরণের পূর্বকৃত নানা তথ্য-উপাত্ত উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে একটি অধিক যুক্তিযুক্ত শ্রেণিকরণ উপস্থাপন করা হয়েছে এবং এই শ্রেণিকরণের সূত্র ধরে সমকালীন বাংলাদেশে প্রচলিত প্রায় সকল ধরনের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের বিষয়বস্তু, পরিবেশনরীতির স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা-বিশ্লেষণ প্রদত্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী নাট্যের মোট ১৫টি বিষয়গত শ্রেণি যথা–'ধ্রুপদী মহাকাব্য *রামায়ণ* ও তার চরিত্রসমূহের মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান', 'ধ্রুপদী মহাকাব্য *মহাভারত* ও তার ভক্তিবাদী চরিত্রের মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান', 'বাঙালির জাতীয় মহাকাব্য *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* ও তার বিভিন্ন লীলা-প্রকাশক আখ্যান', 'বৈষ্ণবধর্মগুরু শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পার্ষদদের জীবন-মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান', 'লোকায়ত হিন্দু দেব-দেবী শিব-কালী ও তাদের মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান', 'লোকায়ত নাথ-সংস্কৃতির তত্ত্ব-মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান', 'লোকায়ত সর্পদেবী পদ্মা বা মনসা ও তার মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান', 'লোকায়ত হিন্দুদের সংকরজাত দেবতা ত্রিনাথ ও তার মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান', 'ইসলামের ইতিহাসের মর্মান্তিক কারবালাযুদ্ধ ও তার বেদনা-প্রকাশক আখ্যান', 'লোকায়ত মুসলমান পিরদের কাল্পনিক জীবনী ও তাদের মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান', 'খ্রিষ্টীয় ধর্মপ্রবর্তক ও ধর্মপ্রচারকদের জীবন-ইতিহাস ও তাদের মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান', 'বৌদ্ধ ধর্মপ্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ ও অন্যান্য বৌদ্ধ ধর্মীয় চরিত্রের মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান', 'লোককথা, রূপকথা ও স্থানীয় ইতিহাস আশ্রিত মানবীয় প্রেম-মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান', 'বাংলার গ্রামীণ মানুষের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনচিত্র-প্রকাশক আখ্যান', 'তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের আলোকে উদার জ্ঞানতত্ত্ব-প্রকাশক আখ্যান'-এর অন্তর্ভুক্ত পরিবেশনের নানা ধরনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি, এই শ্রেণিকরণের বাইরে আরও দু'টি শ্রেণি যথা–ভ্রাম্যমাণ পরিবেশনশিল্প ও বিচিত্র নৃগোষ্ঠী নাট্যরীতি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আলোচনা সংযুক্ত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের বিষয়বস্তুর সাথে ভাষারীতির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের বাচনিক ও লিখিত রূপের গীত, বর্ণনা, সংলাপ ইত্যাদিতে প্রযুক্ত তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব শব্দের পাশাপাশি আরবি, ফারসি শব্দের প্রয়োগের কার্যকারণ নির্দেশসহ লোকভাষা তথা আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের কারণ শনাক্ত করা হয়েছে।

উপসংহারে সামগ্রিকভাবে এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভের সারাৎসার এবং আলোচনা-বিশ্লেষণ থেকে আহরিত সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত হয়েছে।

পরিশিষ্টে জনসংস্কৃতি সমীক্ষণ থেকে শব্দধারণযন্ত্রে ধারণকৃত ঐতিহ্যবাহী নাট্যের দুটি পালার শ্রুতিলিখন সংকলিত হয়েছে, যার প্রথমটি মৌলভীবাজার জেলায় বসবাসরত মণিপুরী নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী নটপালার অন্তর্ভুক্ত *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* আখ্যান-নির্ভর নাট্যপরিবেশন 'রাধা-কৃষ্ণের পথরুদ্ধ' পালা এবং দ্বিতীয়টি টাঙ্গাইল অঞ্চলে প্রচলিত সামাজিক ও পারিবারিক মানুষের জীবনচিত্র নির্ভর ঐতিহ্যবাহী নাট্যের অন্তর্ভুক্ত সঙযাত্রার 'পিতা-পুত্র' পালা। সংকলিত নাট্যপালা দুটি পাঠে পৌরাণিক আখ্যান নির্ভর ও জনজীবনের কাহিনি নির্ভর নাট্য পরিবেশনের ভাষারীতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা সম্ভব হবে বলে মনে করা যায়।

চার

এই গবেষণাকর্ম সম্পাদনে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সম্মানিত অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষের প্রতি। তাঁর দিক-নির্দেশনায় গবেষণাকর্মটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সম্মানিত সভাপতি ও অধ্যাপক ড. বেগম আকতার কামালের অকৃত্রিম সহযোগিতায় বাংলা বিভাগের একাডেমিক কমিটির সামনে দুটি সেমিনারে এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভের অন্তর্ভুক্ত দুটি অধ্যায় উপস্থাপন করেছি। সেমিনারে উপস্থিত অধ্যাপকদের মূল্যায়ন ও মতামত আমার এই অভিসন্দর্ভ রচনায় সহায়ক হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সভাপতি ও একাডেমিক কমিটির সকল সদস্যের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

অভিসন্দর্ভটি আদ্যপান্ত পাঠপূর্বক এর ভাষার কাঠামো, বানানরীতি ও যুক্তির পারম্পর্য সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত প্রদানের মাধ্যমে যিনি অকৃত্রিম অনুপ্রেরণা ও সাহস সঞ্চার করেছেন, তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জীবন্তকিংবদন্তি-অধ্যাপক ড. সৈয়দ আকরম হোসেন, তাঁর স্নেহছায়া মিশ্রিত পরামর্শে গবেষণাকর্মটি অনেকাংশেই সমৃদ্ধ ও সুগঠিত হয়েছে। তাঁর প্রতি হৃদয়মথিত কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি অর্পণ করি।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য, এ ধরনের জনসাংস্কৃতিক-সমীক্ষাধর্মী গবেষণাকর্ম সম্পাদনের চূড়ান্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক-সংগঠন বেঙ্গল ফাউন্ডেশন আমাকে গবেষণা-বৃত্তি প্রদান করে, যে-কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় মাঠ-গবেষণা সম্পাদন করে আমার পক্ষে অভিসন্দর্ভটি জমা প্রদান সম্ভব হল। তাই, বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সহৃদয় ও শিল্পরসিক মহাপরিচালক জনাব লুভা নাহিদ চৌধুরীসহ অন্য শুভার্থীদের প্রতি সবিশেষ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে, জনসাংস্কৃতিক-সমীক্ষণে যে-সকল সাধক-গায়ক, নাট্যশিল্পী, পালাকার, পরিচালক-নির্দেশকের নিকট থেকে এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি, তাঁদের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি ও প্রীতি। জানি, আমার গবেষণাকর্মে তাঁরা সততই প্রাণসঞ্চার করেন, তাঁদের জীবনাভিজ্ঞতায় অর্জিত সৃষ্টিশীল জ্ঞান দানের সেই ঋণ মাতৃজঠর থেকে জন্মগ্রহণ ও মাতৃস্তন্যপানের মতো কোনদিন কোনভাবেই পরিশোধযোগ্য নয়। অতএব, তাঁদের প্রতি পরম আবেগে, ভক্তিভাবে এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভ রচনার অপরিশোধ্য ঋণ স্বীকার করি।

জগতের সকল সৃষ্টিশীল জ্ঞানচর্চাকারী মানুষের এবং বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের সাধক-শিল্পী, পালাকার, নির্দেশক, পৃষ্ঠপোষক, দর্শক-শ্রোতার মঙ্গল কামনা করি।

২৫ নভেম্বর ২০১৫

(মোঃ শরিফুল ইসলাম)
শিক্ষাবর্ষ ২০১৩-২০১৪
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৩৩
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ইতিহাস

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সমুদ্রসৈকত থেকে উত্থিত যে ভূখণ্ড, তার নাম বাংলাদেশ। এই ভূভাগের পশ্চিমপার্শ্বে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ; উত্তরে আসাম ও মেঘালয়; পূর্বভাগে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও মায়ানমার। এই ভূখণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম সমুদ্র-উপকূলে রয়েছে পৃথিবীর অন্যতম প্রাণবৈচিত্র্যের লীলাভূমি ও বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন।

আকৃতিগত দিক থেকে বাংলাদেশ নামের এই ভূখণ্ডটি তেমন বৃহৎ না হলেও—সুদূর অতীত থেকে এই দেশে প্রবাহিত হয়েছে প্রায় তেরোশত নদী, এই দেশে উৎপাদিত হয়েছে প্রায় দশ হাজার প্রজাতির ধান। এই বিচিত্র প্রজাতির ধানের দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য অন্তহীন। কিন্তু কোনো লিখিত ইতিহাসে সাক্ষ্য নেই এদেশের মানুষ কবে থেকে গান গাইতে শুরু করেছিল, কবে থেকে নাচতে শিখেছিল, আর কবে থেকেইবা নাট্যাভিনয়, নাট্যচর্চা ও নাট্য রচনার বিচিত্র বৈভবের সূচনা করেছিল। লিখিত ইতিহাসের সাক্ষ্য মেনে যেটুকু জানা যায়—তাতে উল্লেখিত আছে যে, এদেশের মানুষ খ্রিষ্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বৌদ্ধধর্মীয় সংস্কৃতিচর্চায় নিবিষ্ট ছিল। সে সময়ের বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য-কবিদের রচিত ও গীত চর্যার চরণে সাক্ষ্য রয়েছে—নাট্যচর্চার ইতিহাসের; সেই সূত্র ধরে অধিকাংশ গবেষক সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, বাংলাদেশের মানুষ চর্যা রচনার কাল থেকেই গীত, নৃত্য, নাট্য, বাদ্য, কাব্য, আখ্যান, কথাকে জ্ঞানপ্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যম করেছিল। তৎপরবর্তীকালে তথা খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত রচিত *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে, *মনসামঙ্গল* কাব্যে, চৈতন্যমহাপ্রভুর জীবনীকাব্যে, মুসলিম পির পাঁচালিতে, কারবালার ইতিহাস নির্ভর পুথিসাহিত্যে এবং বাংলাভাষায় রচিত অন্যান্য আখ্যানকাব্যেও বারবারই উচ্চারিত হয়েছে এদেশের মানুষের ইতিহাসচর্চা, জ্ঞানপ্রকাশ, কৃত্যাচার পালন ও সামাজিক মানুষের সম্পর্ক-নির্মাণে গান, নৃত্য, নাট্য ইত্যাদি সাংস্কৃতিক আঙ্গিকগুলোই প্রধান ভূমিকা রেখেছে। বর্তমানকালেও সেই ধারাবাহিকতা বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনে অব্যাহত রয়েছে।

এদেশের বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম ফসল নাট্যচর্চার বিচিত্র বৈভব প্রত্যক্ষ করে স্পষ্টত বলা যায়—বাংলাদেশ কোনো একক ধর্মমতের দেশ নয়, এই দেশে ইসলাম, সনাতন, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, বৈষ্ণবসহ বিচিত্র লোকধর্মের অস্তিত্ব রয়েছে এবং এই দেশেই বসবাস করছে বহু ভাষাভাষী নৃগোষ্ঠী। আসলে, এদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যাঙ্গিকসমূহের বৈচিত্র্যের মূলে বহু ধর্মমতের প্রভাব যেমন রয়েছে, তেমনি প্রভাব রয়েছে নানা ভাষাভাষী নৃগোষ্ঠীর সামাজিক জীবন ও কৃত্যাচার।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ইতিহাস বর্ণনায়, মূলত বৃহৎবঙ্গের বিচিত্র নাট্যচর্চার পূর্বাপর ঐতিহ্যিক পরিচয়কে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এই পরিচয়ের একদিকে আছে বাংলা নাট্যের প্রাচীনতম সূত্রের বিবরণ, অন্যদিকে আছে বঙ্গীয় নাট্যচর্চার বিবর্তন ও ক্রমবিকাশের ধারা। এই ইতিহাসের মধ্যে সমান গুরুত্ব নিয়ে আলোচিত হয়েছে–প্রাচীন বাংলার 'বুদ্ধ নাটক'-এর ঐতিহ্য, মধ্যযুগের নাথ-সংস্কৃতির নাট্য-ঐতিহ্য, বৈষ্ণব-সংস্কৃতির নাট্যচর্চার ইতিহাস তথা–রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-বিষয়ক আখ্যানের নাট্য-ঐতিহ্য, একই সাথে শ্রীকৃষ্ণের অবতার হিসেবে আবির্ভূত বৈষ্ণবধর্মের আরাধ্যচরিত্র চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস হবার আখ্যানের নাট্য-ঐতিহ্য এবং শ্রীকৃষ্ণের পৌরাণিক জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে বাংলার সামাজিক জীবনকথার নাট্য পরিবেশন; মহাকাব্যকেন্দ্রিক নাট্য-ঐতিহ্য তথা–রামায়ণের আখ্যানকেন্দ্রিক নাট্যচর্চার ইতিহাস, মঙ্গলকাব্যের ধারায় সাপের পৌরাণিক দেবী মনসার সঙ্গে বাংলার সামাজিক মানুষের জীবনাচিত্র-নির্ভর নাট্য পরিবেশন; এমনকি হিন্দু পুরাণের প্রধান তিন দেবতা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের সঙ্গে বাংলার লোকায়তজীবনের সম্পর্ক-বিষয়ক নাট্য পরিবেশনের ঐতিহ্য ও ইতিহাস।

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যচর্চার ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, এদেশের নাট্যচর্চা শুধুই মৌখিকরীতির নয়, তার সঙ্গে লিখিত সাহিত্যের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে, যা প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে মধ্যযুগ হয়ে বর্তমান বাংলাদেশে এখনও চলমান।

এক

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ইতিহাসের প্রাচীনত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়–বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় গ্রন্থে, সাহিত্য-নিদর্শন, শিলালিপি এবং পর্যটকদের ভ্রমণ কাহিনিতে। তবে, বাংলা নাটকের আদিম ইতিহাসের সূত্র অনুসন্ধানের জন্য গবেষকগণ প্রথমেই ঋগ্বেদের কিছু সূক্তের বিবরণকে গ্রহণ করে থাকেন।[১] ঋগ্বেদের রচনাকাল আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ১০০০ অব্দ।[২] এই ঋগ্বেদের একাধিক সূক্তে পূর্ব-ভারত তথা বঙ্গভূমিতে প্রচলিত প্রাচীনতম নাট্য-ঐতিহ্যের ইঙ্গিত রয়েছে। বিভিন্ন দেশের গবেষক ঋগ্বেদের সূক্ত ব্যাখ্যা করে বঙ্গ ভূখণ্ডের প্রাচীন নাট্যকলার প্রকৃতি নির্ধারণ করেছেন।[৩]

নাট্যাভিনয়ের প্রাথমিক যুগের নিদর্শন হিসেবে ঋগ্বেদের ব্রাত্যখণ্ডে এক দিগ্বিজয়ী সম্রাটকল্প-ব্রাত্যের 'দিগ্বিজয়যাত্রা'র বর্ণনা আছে। সেখান থেকে জানা যায়–সম্রাটকল্প-ব্রাত্যের 'দিগ্বিজয়যাত্রা'য় তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েকজন পার্শ্বচর থাকতেন। পার্শ্বচরদের মধ্যে 'পুংশ্চলী' ও 'মাগধ'-এর বিশেষ ভূমিকা ছিল। কারণ, 'পুংশ্চলী' হচ্ছে নারী–এই নারী ছিলেন নৃত্য-গীত পটিয়সী নটী এবং 'মাগধ' হচ্ছেন পুরুষ–এই পুরুষ ছিলেন বাদ্যকার–গল্পকথক বা নাট্যভিনেতা। এই নট-নটীদ্বয় উভয়ে মিলে যুদ্ধের অবসরে নৃত্য-গীত-অভিনয় দেখিয়ে সম্রাটকল্প-ব্রাত্যের মনোরঞ্জন করতেন।[৪] ধারণা করা হয়–পরবর্তীকালে পূর্বভারতে, অর্থাৎ বঙ্গভূমি তথা বাংলাদেশের গ্রামীণ মানুষের মধ্যে সেই সব নৃত্য-গীত ও অভিনয়ের অনুশীলন-প্রচারিত হয়।

এই সম্রাটকল্প-ব্রাত্যের 'দিগ্বিজয়যাত্রা'র ধারাবাহিকতা পরবর্তী সময়েও প্রত্যক্ষ করা যায়। বিশেষ করে ঋগ্বেদ পরবর্তী কালের মৌর্য রাজদের 'বিহারযাত্রা'র সাথে পূর্ববতী 'দিগ্বিজয়যাত্রা'র অনেক সাদৃশ্য খুঁজে

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া যায়। কেননা, খ্রিষ্টপূর্ব ৩য় শতকে মৌর্য রাজ পুরুষেরা উচ্চধ্বনিতে ঢাক বাজিয়ে এক ধরনের 'বিহারযাত্রা' করতেন। এই 'বিহারযাত্রা'র উল্লেখযোগ্য লক্ষ ছিল মৌর্য রাজ পুরুষদের রাজ্য দর্শন। বৎসরের নির্দিষ্ট একটি সময় মৌর্য রাজ-পুরুষেরা কেন্দ্রীয় রাজধানী থেকে বের হয়ে 'বিহারযাত্রা'র মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করতেন। এমনই বিহার-যাত্রাকালে তাদের সঙ্গে বাহনের জন্য হাতি, রথ, রথের ঘোড়া থাকত; এছাড়া, থাকত রন্ধনের জন্য রন্ধনকারী; মালবাহী পশু, মালবাহী পশুর জন্য চালক ও খাদ্যদানকারী; থাকত সেবক ও মৃগয়ার সরঞ্জামাদি; এমনকি মনোরঞ্জন দানকারী নৃত্য-গীতে অভিজ্ঞ নারী-পুরুষ, নট-নটীরাও হতেন সেই যাত্রার সঙ্গী। ধারণা করা যায়—'বিহারযাত্রা'র দলের সদস্যগণ মাঝে মাঝে জনবহুল কোনো স্থানে শিবির স্থাপন করতেন। আর সন্ধ্যায় সেই শিবিরে জনসাধারণের মনোরঞ্জনের উপযোগী নৃত্য-গীতের আসর বসাতেন এবং নট-নটীরা সাজসজ্জা গ্রহণপূর্বক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাটক অভিনয়ে অংশ নিতেন। রাজ পুরুষগণ সে-নাটকগুলো রাজ্যের সাধারণ প্রজাসহ উপভোগ করতেন।

খ্রিষ্টপূর্ব ২য় শতকে সম্রাট অশোক এই 'বিহারযাত্রা'র পরিবর্তে 'ধর্মযাত্রা'র প্রবর্তন করেন। জানা যায়, অশোক প্রবর্তিত 'ধর্মযাত্রা'র মধ্যেও নৃত্য-গীতের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে অশোকের শিলালিপিতে বর্ণিত রয়েছে :

> অতীত কালে রাজারা বিহার যাত্রায় নির্গত হইতেন;
> ইহাতে মৃগয়া ও ঈদৃশ আমোদপ্রমোদ হইত।
> দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা দশ-বর্ষাভিষিক্ত হইলে সম্বোধিতে গিয়াছিলেন।
> তাহাতে ইহা ধর্মযাত্রা (হইল)।[৫]

অশোকের অন্য একটি শিলালিপিতে এই ধর্মযাত্রা সম্পর্কে যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তা নিম্নরূপ :

> But now (twelveth year of coronation) in consequence of the practice of Dharma on the part of the king Devanampriya Priyadarshin, the sound of drums has become the sound of Dharma, showing the people representations of aerial chariots, representations elephants, masser of fire and other divine figures.[৬]

সম্রাট অশোক প্রবর্তিত এ ধরনের 'ধর্মযাত্রা'য় উড়ন্ত রথ, হাতির মিছিল, আগুনের খেলা এবং বিচিত্র সজ্জার অঙ্গভঙ্গি বা নটভঙ্গি বা দিব্যরূপ প্রদর্শন করা হত। বৌদ্ধদেবতাদের বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়াকর্ম বা কার্যকলাপ নটভঙ্গির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় পরিবেশন করাই ছিল সেই ধর্মযাত্রার উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে যে, সম্রাট অশোকের সমসাময়িক কালে জনসাধারণের মধ্যে এই গ্রামীণ বা ঐতিহ্যবাহী নাট্যরীতির প্রচলন ছিল।[৭]

সুকুমার সেন বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার ইতিহাস অন্বেষণের প্রশ্নের মীমাংসায় জানিয়েছেন যে, পাণিনির সময়ে তথা আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে বাংলার জনসাধারণের মাঝে 'নট' এবং বিশেষ প্রকারের নাট্যধারার প্রচলন ছিল।[৮] এ ধরনের মন্তব্যের ব্যাখ্যায় তিনি আরও জানিয়েছেন—পাণিনির সময়ে

Dhaka University Institutional Repository

শুধু 'নট' শব্দই নয়, সেই শব্দ থেকে উৎপন্ন 'নাট্য' শব্দ প্রচলিত ছিল। 'নাট্য' শব্দটির অর্থ 'নটের কর্ম'।[৯] এ থেকে তিনি ধারণা করেন—পাণিনির সময়ে 'নটকর্ম' জীবিকারও বিষয় ছিল। সে সময়ে রচিত নটসূত্র নামক প্রাচীন কোনো রচনার সন্ধান না পাওয়া গেলেও তার বেশ পরে ভরতমুণি রচিত *নাট্যশাস্ত্র*-এর সন্ধান মিলেছে।[১০] বাংলা নাটকের ঐতিহ্যের সঠিক তথ্য উদ্ঘাটনের লক্ষ্যে সুকুমার সেন একইসঙ্গে একথাও বলেন—পাণিনি-পরবর্তীকালে 'ভিক্ষু' শব্দটি বৌদ্ধ সাধু অর্থেই ব্যবহৃত হতে শুরু করে। তবে, পাণিনির সময়ে ও তার পূর্বে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসীদের মধ্যে নৃত্যগীত অভিনয় প্রচেষ্টা অজ্ঞাত ছিল না। পরবর্তীকালের সাহিত্যে প্রাচীনকালের ভিক্ষুদের নাট্যসংশ্লিষ্টতার কিছু কিছু প্রমাণ মেলে। ভাগবতে 'ভিক্ষুচর্যা'র উল্লেখ আছে। এই শব্দটির সঙ্গে প্রাচীন বাংলাভাষার 'চর্যা' বা চর্যাপদের তুলনা করা চলে।[১১] ঐতিহ্যবাহী বাংলানাট্যের ইতিহাসের কাল-পরম্পরাগত শৃঙ্খলা রক্ষার্থে প্রাচীন বাংলার চর্যাপদে উদ্ধৃত নাট্যরীতি সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে।

ভারতবর্ষের নাট্যকলার ইতিহাস ও প্রকৃতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভরতমুণির *নাট্যশাস্ত্র* শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য হিসেবে স্বীকৃত। প্রাচীন বাংলায় ঐতিহ্যবাহী নাট্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে খ্রিষ্টপূর্ব ২য় শতকে রচিত ভরতমুণির *নাট্যশাস্ত্রে* সুস্পষ্টভাবে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। *নাট্যশাস্ত্রের* "প্রবৃত্তি-ব্যঞ্জক" অধ্যায়ে অঞ্চলভেদে চতুর্বিধ 'বৃত্তি-আশ্রিত' নাট্যের কথা আছে। ভরতমুণি 'প্রবৃত্তি' শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন—'নানাদেশবেষভাষাচারাবার্তাঃ', অর্থাৎ দেশ-বেশ-ভাষা ও রীতি অনুসারে চার ধরনের প্রবৃত্তি বর্তমান রয়েছে, এগুলো হল—আবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, পাঞ্চালী এবং ওড্র-মাগধী।[১২] ভরতমুণির বর্ণনা মতে, সেকালে যে-সকল অঞ্চলে ওড্র-মাগধী নাট্যপ্রবৃত্তি প্রচলিত ছিল তার মধ্যে পূর্ব-ভারত তথা 'বঙ্গ' বা বাংলাদেশও রয়েছে, আর ওড্র-মাগধী নাট্যপ্রবৃত্তি হচ্ছে উত্তেজনাপূর্ণ আবেগদীপ্ত বাচিক অভিনয়।[১৩] ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়—এই ওড্র-মাগধী নাট্যপ্রবৃত্তি ভারতী ও কৈশিকী প্রবৃত্তির আশ্রয়ে রচিত। এরমধ্যে কৈশিকী বৃত্তি শিবের শৃঙ্গার নৃত্য থেকে উদ্ভূত। আর কৈশিকী বৃত্তির জন্য ব্রহ্মা আলাদাভাবে তেইশজন অপ্সরা তৈরি করেছিলেন। এক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে কৈশিকীর প্রয়োগ সম্ভব নয়।[১৪] ভরতমুণির *নাট্যশাস্ত্রে* এর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বসন-ভূষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে—এর পোশাক বা আহার্য হবে মনোরম এবং এই প্রবৃত্তি আত্মা হচ্ছে 'ক্রিয়া' ও 'রস'। এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভরতমুণি বলেছেন—এ হচ্ছে 'বহুনৃত্তগীতবাদ্য' সহযোগে দলিত-অঙ্গাভিনয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন, প্রয়োগ-বিচারে ভরতকৃত 'নৃত্ত' ও 'নৃত্য'-এর রীতি ভিন্ন। 'নৃত্ত' হচ্ছে জনপ্রিয় লৌকিক নাট্যাভিনয়—যা ছন্দ-তালে সাধারণ অঙ্গভঙ্গি সহকারে প্রদর্শিত হয়ে থাকে। এতে নাট্যশাস্ত্র নির্দেশিত কোনো মার্গীয় মুদ্রারীতির অনুকরণ বা অনুসরণ করা হয় না।[১৫] ভরতমুণির *নাট্যশাস্ত্রে* কৈশিকী প্রসঙ্গের বিবরণে 'নৃত্ত' শব্দটির ব্যবহার দেখে প্রাচীনকালের ওড্র-মাগধী নাট্যরীতির লৌকিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা করা যায়। কাল বিচারে বলা যায়, এই ওড্র-মাগধী রীতি ভরতমুণি এবং তাঁর পূর্বকালেও প্রচলিত ছিল। এক্ষেত্রে অনুমান করা যায়—*নাট্যশাস্ত্রের* 'প্রচলিত রূপটি'র নিম্নতর সীমারেখা অষ্টম শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত বর্তমান ছিল।[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

দুই

বাংলাদেশের প্রাচীনতম সাহিত্য-সাংস্কৃতিক নিদর্শন হল চর্যাপদ বা চর্যাগীতি। যার রচনাকাল আনুমানিক অষ্টম থেকে দ্বাদশ খ্রিষ্টাব্দ। চর্যার পদেই বাংলাদেশের প্রাচীনতম নাটকের প্রসঙ্গ রয়েছে। 'সে নাটক আধুনিক নাটকের মতো সংলাপসর্বস্ব অভিনয় পালা কি-না, তা বলা দুষ্কর। কিন্তু শব্দটি নাটকই ব্যবহৃত হয়েছে এবং নাটকের বিষয়বস্তু, নাটকের রচনাকৌশল ও প্রয়োগ-কলা স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে। এইভাবে বাংলা সংস্কৃতির উদ্ভবমুহূর্তেই নাটকের দর্শন মিলছে।'[১৭]

বাংলা সাহিত্যের আদিম নির্দশন চর্যার পদে 'নাটক' শব্দের উল্লেখ আছে। কিন্তু বাংলা নাটকের আদি ইতিহাসের অস্তিত্বের আলোচনার শুরুতে তা গৃহীত হয়নি। অথচ খ্রিষ্টীয় নবম শতকে রচিত চর্যার ১৭ সংখ্যক পদের শেষে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে :

নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী
বুদ্ধনাটক বিসমা হোই ॥

অর্থাৎ, 'বজ্রাচার্য (পুরুষ) নাচছেন আর দেবী (নারী) গান করছেন–এর ফলে বুদ্ধ নাটক বিপরীতভাবে অনুষ্ঠিত হল।'[১৮] এই পদ থেকে প্রাচীন বাংলার বিশেষ ধরনের ঐতিহ্যবাহী নাট্যরীতি 'বুদ্ধ নাটক' সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। এ ধরনের নাট্যের অভিনয়ে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই অংশগ্রহণ করতেন।[১৯]

উপর্যুক্ত পদের ব্যাখ্যায় শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন যে, 'এইরূপ নৃত্যগানের ভিতর দিয়া এই সব গায়ক-গায়িকা কোনও বিশেষ ঘটনাকে নাট্যরূপ দান করিতেন।"[২০] অন্যদিকে শশিভূষণ দাশগুপ্তের এই অভিমতের সাথে সুরেশচন্দ্র মৈত্র তাঁর নিজের মন্তব্য যুক্ত করে বলেছেন যে, চর্যাপদের বাণীতে যে বুদ্ধ নাটকের কথা বলা হয়েছে, তার পরিবেশনে "বাদ্যযন্ত্র হেরুক বীণার উল্লেখ আছে। তাল মানের উল্লেখ রয়েছে। বোঝা যাচ্ছে নৃত্যগীতের মধ্য দিয়ে নাট্যাভিনয় সম্পন্ন হচ্ছে। এ কিন্তু সংস্কৃত ছল্লিক নয়। এ হোল বাংলা নাটকের আদিম রূপ; নাটক নৃত্য-শব্দের সঙ্গে তখন যুগল বন্ধনে আবদ্ধ। বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যবহৃত 'নাটক' শব্দটি এই অর্থ-ঔদার্য আমাদের মনে রাখতে হবে। কারণ আধুনিক যুগের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আমরা একই অর্থ প্রত্যক্ষ করব। নেপালের নাটকে নটনাথের চরণে প্রণতি জানান হয়নি; নৃত্যেশ্বরের চরণে প্রণতি পৌঁছেছে। চর্যাপদগুলি নেপালে আবিষ্কৃত হয়েছে। নেপালের নাট্য-ইতিহাসে একটা ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যাচ্ছে।

'বুদ্ধ নাটক' চর্যাপদগুলির মত নিশ্চয়ই বাংলা ভাষার মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ করেছিল।"[২১] এখন প্রয়োজন পড়েছে বাংলাদেশের মাটিতেই বিবর্তনের পথ পাড়ি দিয়ে প্রাচীন 'বুদ্ধ নাটক'-এর সাম্প্রতিক রূপের অনুসন্ধান।[২২]

চর্যাপদে উদ্ধৃত 'বুদ্ধ নাটক' পরিবেশনের স্বরূপ ও প্রাচীনত্ব নিয়ে তো কথা হল। এবার 'বুদ্ধ নাটক'-এর আসরে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু বলা যাক। এ সম্পর্কে গবেষকদের অভিমত হল–এ ধরনের নাট্যরীতিতে মূলত বুদ্ধদেবের জীবনের কোন বিশেষ ঘটনা বা বুদ্ধদেবের সমগ্র জীবনকাহিনিকে নাচ, গান

Dhaka University Institutional Repository

ও অভিনয়ের আশ্রয়ে দর্শকদের সামনে মঞ্চরূপ দেওয়া হত।[২৩] এক্ষেত্রে আমাদের স্বতন্ত্র অভিমত হল—চর্যাপদ অভ্যন্তরস্থ কাহ্নু-ডোম্বী, শবর-শবরীর নাটকীয় সম্পর্কের ইঙ্গিত একথাও প্রমাণ করে যে, শুধু বুদ্ধদেবের জীবন কাহিনিকেই প্রাচীন বাংলার ঐতিহবাহী নাট্যরীতি 'বুদ্ধ নাটক'-এ রূপ দেওয়া হত না—তার পাশাপাশি বাংলার লোকজীবনের সাধারণ নর-নারীর জীবন-কাহিনির অনেক ঘটনাও বুদ্ধ নাটকের আসরে উপস্থাপন করা হত। বাংলার গ্রামীণ মানুষের সাধারণ জীবন কাহিনিকেও উপস্থাপন করা হত।[২৪]

চর্যাপদে আরো অনেক স্থানে আছে নৃত্যগীতের উল্লেখ। 'ডোম, কাপালিক, নট ইত্যাদি জীবিকার এবং জাতির লোকদের মধ্যে নৃত্য করা কিংবা গীত-বাদ্যের সমাদর করা খুবই প্রচলিত ছিল মনে হয়। সেই সময়ে বাঙালী সমাজের নিম্নস্তরে এমন এক শ্রেণির লোক বোধ হয় ছিল, যারা নাচ-গান করেই জীবিকা নির্বাহ করত।'[২৫] শশিভূষণ দাশগুপ্তের বিশ্লেষণ গ্রহণপূর্বক গবেষক সেলিম আল দীন বলেছেন—'১০ সংখ্যক চর্যায় নড়পেড়া শব্দের অর্থ যদি নটপেটিকা হয় তবে দেখা যায় যে, সে-কালে ছোট পেটিকা বা পেটরায় নটনটীর সকল সাজপোশাক থাকত।'[২৬] এক্ষেত্রে বলা যায়—পেটরায় সাজপোশাক রক্ষণাবেক্ষণ পেশাজীবীদের পক্ষেই সঙ্গত।[২৭] উক্ত ১০ সংখ্যক চর্যায় বিভিন্ন স্থানে নৌকায় করে ডোম্বীর আসা-যাওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। এ পদে ডোম্বীর সৌন্দর্য ও নৃত্যমুগ্ধ চর্যাপদ-কর্তা কাহ্নুপা প্রেম নিবেদন করে প্রশ্ন বলেছেন :

'ওগো ডোম্বী তোমাকে সৎভাবে জিজ্ঞাসা করছি, ডোম্বী কার নৌকায় তুমি আসা-যাওয়া করো।' মূল চর্যাপদে একথাটি যেভাবে আছে, তা হচ্ছে :

আলো ডোম্বী তু পুছমি সদভাবে।
আইসসি যাসি ডোম্বী কাহেরী নাবেঁ ॥

পদটির পাঠ গ্রহণ করে *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*-এ গবেষক সেলিম আল দীন সিদ্ধান্ত দিয়েছেন—'সেকালে নিম্নবর্ণের নারী-পুরুষেরা নৃত্যগীতাভিনয় প্রদর্শনের জন্য নানা স্থানে আসা যাওয়া করত।'[২৮] একই পদের অন্য দুটি চরণে নৃত্য-পটয়সী ডোম্বীর সুষম নৃত্যকলার কথাও বিবৃত হয়েছে বেশ স্পষ্টভাবে :

এক সো পদমা চউসট্ঠী পাখুড়ী।
তঁহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ি ॥

অর্থাৎ, একটি সে পদ্মের চৌষট্টিটি পাপড়ি। তাতে চড়ে নাচে ডোম্বী বেচারি ॥[২৯]

উল্লেখিত চর্যায় নৃত্য-গীত প্রসঙ্গে নতুনভাবে দৃষ্টিপাত করেন অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের চর্যার সংগ্রাহক শশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৯১১-৬৪)। তিনি ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে নেপাল থেকে একশোটি নতুন চর্যাপদ সংগ্রহ করে আনেন এবং জানান—তাঁর সংগৃহীত চর্যার গানগুলি পাওয়ার সময় পর্যন্ত নেপালে বজ্রাচার্যরা তা 'নৃত্যগীত সহযোগে' পরিবেশন করতেন এবং নাচ-গানের সময় হাতেলেখা পুথি ব্যবহার হত। এই রকম ব্যবহারে কোনো পুথি নষ্ট হয়ে গেলে তা আবার নকল করে নেওয়া হত।[৩০] এ ধরনের বক্তব্যে থেকে প্রতীয়মান হয় যে—চর্যার পদ বা গানগুলো মূলত নৃত্য ও গীত পরিবেশনের পাণ্ডুলিপি। তবে, চর্যায় সঙ্কলিত পদসমূহের নৃত্য-গীতমূলক পরিবেশনের পূর্ব, মধ্য ও অন্তে খুব সম্ভবত কাহিনি বর্ণনা ও ব্যাখ্যা বর্তমান থাকত।[৩১]

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিককালের নাটকে দ্বন্দ্ব সংঘটনে সাধারণত দু'টি পক্ষ ক্রিয়াশীল থাকে। যে দু'টি পক্ষের একদিকে থাকে নায়ক, অপরদিকে থাকে প্রতিনায়ক বা নায়কের প্রতিপক্ষ। চর্যায় সাধনকর্মে সিদ্ধি লাভের পথে একাধিকবার দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। সে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলে কখনো নিজের ইন্দ্রিয়-রিপুর সঙ্গে, কখনো তা বহির্মোহের সঙ্গে। অনেক ক্ষেত্রেই সেই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের কথা চর্যায় বেশ নাটকীয় ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৬ সংখ্যক চর্যার বর্ণনায় এক চিত্ত-বিজয়ী নায়কের উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে :

মহারস পানে মাতেল রে তিহুঅন সএল উএখী।
পঞ্চবিষয়রে নায়ক রে বিপখ কোবী ন দেখী ॥

অর্থাৎ, ওরে মহারস পানে সেই (চিত্ত) মাতাল, ত্রিভুবন সমস্তই উপেক্ষিত; পঞ্চ বিষয়ের নায়ক রে, বিপক্ষ কাউকে দেখা গেল না।[৩২]

এখানে মূলত দেহ বা চিত্ত সাধনকথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু, সাধন কথা ছাড়াও এখান থেকে প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্য বা 'বুদ্ধ নাটক' প্রসঙ্গে অনুমান করা যায় যে—তৎকালীন নাট্য পরিবেশনায় নায়ক এবং নাট্যক্রিয়ায় বিপখ বা বিপক্ষ (নায়কের প্রতিপক্ষ) উপস্থিত থাকত।

এবারে চর্যাপদকর্তাদের জীবনবৃত্তান্ত ও তিব্বত থেকে সংগৃহীত রেখাচিত্র অবলম্বনে প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার অভিনয়-সূত্র অনুসন্ধান করা যেতে পারে। চর্যাপদে উল্লেখিত 'বুদ্ধ নাটকে' নারী-পুরুষের যে নৃত্য ও গীতের বিবরণ আছে, তিব্বত থেকে সংগৃহীত চিত্রগুলোতে তার সংকেত দেখা যাচ্ছে।

তিব্বতে প্রাপ্ত রেখাচিত্রে চর্যার যে আঠারোজন পদকর্তার সাক্ষাৎ মিলেছে, তারা হলেন—১. মীনপা, ২. জলন্ধরপা, ৩. কাহ্নুপা, ৪.দাড়িকপা, ৫. ডোম্বীপা, ৬. লুঈপা, ৭. শান্তিপা, ৮. বিরূপা, ৯. জয়ানন্দ, ১০. গুণ্ডরিপা, ১১. তিলোপা, ১২. কংকণপা, ১৩. ভুসুকপা, ১৪. বীণাপা, ১৫. ভদ্রপা, ১৬. তন্তিপা, ১৭. কর্ণরিপা এবং ১৮.সরহপা।

চর্যার উপর্যুক্ত পদকর্তাদের পরিচিতি বা জীবনবৃত্তান্ত থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়, তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন পদকর্তা গীত-বাদ্য-নৃত্য বা প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাট্য পরিবেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। গবেষকগণ উক্ত বিষয়টির সঙ্গে চর্যাপদকর্তাদের তিব্বতে প্রাপ্ত রেখাচিত্রে বিভিন্ন ধরনের নৃত্য মুদ্রা প্রত্যক্ষ করে প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধ নাট্যরীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করেছেন।[৩৩] এ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন পদকর্তার জীবনী, রেখাচিত্র অবলম্বনে বুদ্ধ নাটকের স্বরূপ সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

Dhaka University Institutional Repository

সরহপা

সরহপা চর্যাপদকর্তাদের মধ্যে অন্যতম সিদ্ধাচার্য কবি। তাঁর জীবনবৃত্তান্তে জানা যায়–সিদ্ধিলাভ করবার পূর্বে তিনি রাহুল ভদ্র নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন ব্রাহ্মণ আর মাতা ছিলেন জনৈকা ডাকিনী। তিনি নিজেকে পূর্বদেশের অধিবাসী বলেছেন। গবেষক জানান, এই পূর্বদেশ বঙ্গ বা বর্তমান বাংলাদেশ হবার সম্ভাবনাই বেশি। তারানাথের বিচার অনুসারে ইনি শৈশবেই বেদ্-বেদান্ত অধ্যয়ন করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পর ইনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্যের পদ অধিকার করেন। সে সময় প্রাচ্যদেশে রাজা ছিলেন চন্দনপাল। গল্প আছে রাজা চন্দনপাল তাঁর অসংখ্য প্রজা সঙ্গে নিয়ে একবার সরহপাকে দেখতে গিয়েছিলেন। সরহ তখন বলেছিলেন, 'আমি যদিও ব্রাহ্মণ তবু আমি নিম্নবর্ণের কন্যার সঙ্গে বাস করি। জাতি বা অজাতি, পুণ্য বা পাপ আমার জন্য সবই সমান।' সরহপা'র এমন উক্তিতে রাজা এবং তাঁর প্রজারা সকলে বিভ্রান্ত হলেন। কিন্তু সরহপা যখন দোহা গাইতে লাগলেন তখন রাজা তার পাঁচ লক্ষ প্রজাকে সঙ্গে নিয়ে বজ্রযান মন্ত্রে দীক্ষিত হন।[৩৪]

সরহপা যে বাদ্য বাজিয়ে দোহা গাইতেন এ বিষয়ের প্রমাণ সরহপার রেখাচিত্রেও দৃষ্ট হয়। চিত্রে দেখা যায় সরহ সম্ভবত বাঘের চামড়ার উপর বসে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন। বসার ভঙ্গিটি লক্ষ করার মতো, একটি পা সম্পূর্ণভাবে ভাঁজ করে উরুসন্ধির কাছাকাছি রেখে অন্য পা'টি কিছুটা মুক্ত করে রেখেছেন। আর বাদ্যযন্ত্রটি বুকের উপর রেখে দোতরা বাজানোর মতো করে বাজাচ্ছেন।

রেখাচিত্রে সরহপার কেশবিন্যাস ও অঙ্গ-আভরণ বেশ চমকপ্রদ। কেশের কিছু অংশ মাথার উপরে ঝুটি করে বাঁধা, কিছু অংশ কাঁধের নিচ পর্যন্ত ছড়ানো। অঙ্গ-আভরণ হিসেবে দুই বাহুতেই বাহুবন্ধন, গলায় বিভিন্ন ধরনের মালিকা এবং পরনে ধুতির মতো এক টুকরো উন্মুক্ত কাপড় দৃষ্ট হয়। সরহপার এইরূপ বাদন বা সঙ্গীত পরিবেশনের রেখাচিত্র দৃষ্টে এবং জীবনবৃত্তান্ত পাঠে প্রাচীন বাংলার গীত ও নাট্য পরিবেশনরীতি সম্পর্কে কিছু সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[৩৫]

সর্বাধিক চর্যাপদের রচয়িতা হচ্ছেন–কাহ্নুপা। তিনি একজন মহান আচার্য ছিলেন। বিদ্যা এবং কবিত্বে ছিলেন চর্যার সকল পদকর্তার অগ্রগণ্য। কাহ্নুপার জন্মস্থান উড়িষ্যা না-কি কর্ণাটক এ সম্পর্কে গবেষকদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ থাকলেও, সম্প্রতি প্রকাশিত চর্যাপদকর্তা সিদ্ধদের তিব্বতী ভাষায় প্রাপ্ত মূল জীবনীগ্রন্থ *চতুরশীতি-সিদ্ধ-প্রবৃত্তি*-র বাংলা অনুবাদ *চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী*-তে সোমপুর তথা বর্তমান বাংলাদেশের জয়পুরহাট জেলার পাহাড়পুরকে কাহ্নুপা'র দেশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৬] *চুরাশি সিদ্ধর*

Dhaka University Institutional Repository

কাহিনী অবলম্বনে কাহ্নুপা'র পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার বাস নিয়ে গবেষকদের মধ্যে তেমন কোনো ভিন্ন মত নেই। দেবপালের রাজত্বকালে (৮০৬-৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে) কাহ্নুপা পণ্ডিত ভিক্ষু নামে খ্যাত হয়ে পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারে অবস্থান করেন। কাহ্নুপা নিজে সম্ভবত গীত পরিবেশন করতেন। কেননা, তাঁর পদের ভণিতায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ পাওয়া যায় :

কাহ্নে গাই তু কাম চণ্ডালী।
ডোম্বী তো আগলি নাহি ছিণালী ॥ (চর্যা-১৮)

অর্থাৎ, কাহ্নু গাইছে, তুমি চণ্ডালী কামচতুরা; ডোম্বী তোমার অধিক ছিনালী (ছলনাময়ী) নাই। এখানে 'কাহ্নে গাই' (কাহ্নু গাইছে) ভণিতা দৃষ্টে কাহ্নুপাকে সুস্পষ্টভাবেই সঙ্গীত পরিবেশনকারী পদকর্তা হিসেবে শনাক্ত করা যায়। এতদ্ব্যতীত কাহ্নুপার একাধিক পদে বাদ্য, গীত, নৃত্য প্রসঙ্গ এবং সেকালের বাদ্যযন্ত্রের নাম (ডমরু, পটহ, মাদল, কর বা ঢোল, কাঁসি) ও নৃত্যে বা যোগাচার যাত্রায় ব্যবহৃত কিছু সাজ অলংকার বা অঙ্গ আভরণ (ঘণ্টানূপুর, কুণ্ডল, মুক্তাহার, হাড়ের মালা)-এর নাম উল্লেখ আছে।[৩৭]

কাহ্নপা

তিব্বতে প্রাপ্ত রেখাচিত্রেও কাহ্নুপাকে নৃত্যমান দেখা যায়। রেখাচিত্রে কাহ্নুপা দু'পা ফাঁক করে নৃত্যের ভঙ্গিতে দাঁড়ানো। তার পরনের ধুতি হাঁটুদ্বয়ের উপর পর্যন্ত বিস্তৃত, খুব সম্ভবত একটি উত্তরী কাহ্নুপার ডান কাঁধ থেকে বক্ষ বরাবর এসে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। কাহ্নুপার বাম হাতে কিছু একটা ধরা, তালু ঊর্ধ্বমুখী। ডান হাতটি তীর্যকভাবে নিচে নামানো। যদিও রেখাচিত্রের অস্পষ্টতার কারণে ডান হাতের ক্রিয়া বা ভঙ্গিটা তেমন বোঝা গেল না। তবে, উক্ত হাতের নিচে সম্ভবত জল বা জলাশয় থেকে জোড় হস্তে প্রার্থনারত একজন নারীর আকৃতি বোঝা যায়। রেখাচিত্রে কাহ্নুপাকে নৃত্যমান দেখে এবং তাঁর রচিত পদমধ্যস্থ নৃত্য-গীত-বাদ্য প্রসঙ্গকে বিবেচনায় এনে কাহ্নুপাকে প্রত্যক্ষভাবে নৃত্য-গীত বা প্রাচীন বাংলার নাট্য সংশ্লিষ্ট বলে ধারণা করা যায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে—কাহ্নুপা সিদ্ধাচার্য হিসেবে পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারে অষ্টম শতকে অবস্থান করেছিলেন। এক্ষেত্রে কাহ্নুপা যদি সত্যিকার অর্থেই নাট্য-গীত সংশ্লিষ্ট সিদ্ধাচার্য হয়ে থাকেন, তবে তো পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারে গীত, নৃত্য বা নাট্য পরিবেশিত হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। গবেষকগণ উল্লেখ করেছেন—সেকালের নৃত্য বা নাট্যের অভিনয়, আহার্য প্রভৃতি 'লোকায়ত ধারা'র পরিচয় পাওয়া যায় 'পাহাড়পুর ও ময়নামতিতে প্রাপ্ত পোড়া মাটির ফলকে'।[৩৮] এছাড়া, বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক ও নাট্যগবেষক এই পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারে হলঘরের উপস্থিতি আবিষ্কার করে সেখানে

Dhaka University Institutional Repository

নাট্য পরিবেশনের সম্ভাবনা সম্পর্কে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন।[৩৯] তাই পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার ও তার মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ টেরাকোটাগুলোর দিকে নাট্য-গবেষকের দৃষ্টিতে তাকালে সেখানে পরিবেশিত নৃত্য, গীত ও নাট্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া যায়।

নাট্যগবেষক সৈয়দ জামিল আহমেদ পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারে প্রাপ্ত টেরাকোটা দৃষ্টে নৃত্য, বাদ্য ও নাট্যে ব্যবহৃত সাজ বা পোশাকের আলোচনায় তিন ধরনের পরিবেশনমূলক চিত্রের সন্ধান দিয়েছেন, যথা–১. একাধিক নর-নারীর নৃত্য ক্রিয়া, ২. একাধিক নরের বাদ্য বা ঢোল বাদন ক্রিয়া এবং ৩. কিছু নর-নারীর মুখোশ পরিহিত বিচিত্র অভিনয় ক্রিয়া।[৪০]

টেরাকোটায় উৎকীর্ণ একজন বাদককে পণ্ডিত-গবেষক কাহ্নুর পদে উদ্ধৃত 'ডমরু' বাদনরত বলে অনুমান করেছেন। কাহ্নুর পদে উল্লেখ আছে–'অনহা ডমরু বাজএ বীর নাটে ॥' (চর্যা-১১) অর্থাৎ, অনাহত ডমরু বাজছে বীরনাদে। যদিও কাহ্নুপার পদে 'বীরনাদে' শব্দটি মূলে আছে 'বীর নাটে'। এক্ষেত্রে কাহ্নুপা'র উক্ত উদ্ধৃতিটিকে আধুনিক বাংলায় 'অনাহত ডমরু বাজছে বীরনাট্যে' পাঠ করা যেতে পারে এবং বীরনাদে বা বীরনাটে শব্দবন্ধ থেকে প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত একটি নাট্যের 'বীর রস' সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[৪১]

পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারে প্রাপ্ত টেরাকোটাতে বীর রসের বহুচিত্র উৎকীর্ণ আছে। এ ধরনের বীর রসের টেরাকোটাতে দেখা যায়–কোনোটিতে ডান হাতে একটি অস্ত্র ধরে ধুতি পরিহিত এক নর উতুঙ্গ নৃত্যরত, অন্যটিতে সম্ভবত ওই একই ধরনের অস্ত্র দুই উরুর মাঝখানে রেখে দৌড় বা দ্রুত হেঁটে চলার ভঙ্গিতে আরেকজন নর কোনো বাহনযাত্রার অভিনয় করছে। আর তার পাশের টেরাকোটাতে একজন নর সম্ভবত শিকারির ভূমিকায় ধনুকের জ্যা বাম হাতে ধরে ডান হাতটি গতিশীল ভঙ্গিমায় ধনুক-জ্যায়ের বিপরীত দিকে টেনে রেখেছে, যেন-বা এক মুহূর্ত পূর্বেই সে জ্যা থেকে শিকারের উদ্দেশ্যে তার ধনুকটি ছুঁড়ে দিয়েছে। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিটি একজন দক্ষ শিকারির মতোই আত্মপ্রত্যয়ী ও দৃঢ়তায় ভরা।[৪২]

সাধনকথা প্রকাশার্থে রূপক-কথার আড়ালে চর্যায় শবরপার একটি পদে শিকারের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–'গুরুবাক্যকে ধনুক করে নিজ মনকে বাণে বিদ্ধ কর (চর্যা-২৮)।' এখানে টেরাকোটায় উৎকীর্ণ উক্ত ধনুক-জ্যা বহনকারী শিকারিকে প্রতীকীভাবে চর্যাপদের এই 'গুরুবাক্য-ধনুক'-ধারী সাধন-শিকারির ভূমিকায় আঙ্গিক অভিনয়রত বলে অনুমান করা যেতে পারে।[৪৩] পরম দুঃখের বিষয় শবরপার কোনো রেখাচিত্র পাওয়া যায়নি। তবে, গবেষকগণ শবরপার জীবনবৃত্তান্তে তাকে অষ্টম শতকের 'বাঙ্গাল দেশের

Dhaka University Institutional Repository

অধিবাসী বলে চিহ্নিত করেছেন' এবং তাকে কোনো 'এক নর্তকজাতি সম্ভূত বলেছেন।' শবরপা যদি নৃত্যক জাতি সম্ভূতই হয়ে থাকেন, তাহলে তো নৃত্য বা অভিনয় তার রক্তপ্রবাহের সঙ্গে থেকে যাবার কথা। অত্র প্রসঙ্গে এও বলা যায় যে, একই সময়ে রচিত চর্যায় শবরপার পদে উদ্ধৃত 'গুরুবাক্য-ধনুক' এবং পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের টেরাকোটায় উৎকীর্ণ ধনুকধারীর বীর-রসাত্মক অভিনয় বা নৃত্য-ভঙ্গিমার সম্পর্ক ব্যক্ত করা অবান্তর নয়।[৪৪]

বিরূপা

কাহ্নুপা ব্যতীত আরেকজন চর্যাপদকর্তা বিরূপা ভিক্ষুরূপে পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারে বাস করতেন। অষ্টম শতকে দেবপালের রাজত্বকালে তিনি সেখানে অবস্থান করেন। চর্যায় বিরূপার একটি পদের সন্ধান মিলেছে। তার পদে মূলত যোগতান্ত্রিক সাধনকথা প্রতীকী ব্যঞ্জনায় উপস্থাপিত হয়েছে। রেখাচিত্রে 'বিরূপা মহার্ঘ আসনে সমাসীন, বাম হাত কোলের কাছে ন্যস্ত, হাতে কঙ্কণ আছে, ডান হাতের তর্জনী উত্থিত, বৃদ্ধাঙ্গুল স্বাভাবিক, কিন্তু অন্য তিনটি আঙ্গুল ঈষৎ বাঁকানো', অত্র হাতের নিচে একটি অস্পষ্ট মানবমূর্তি যেন-বা বরপ্রার্থী, আর বিরূপা হাতটিকে সেই বরপ্রার্থীর মাথার উপর শূন্যতায় ধরে রেখেছে। আসনে বিরূপার বামপা ভাঁজ করে গোড়ালি ঊরুসন্ধির কাছে রাখা, ডানপা কৌণিক ভঙ্গিমায় আসন থেকে বেরিয়ে এসেছে। তার পরনে ধুতি, হাঁটুর উপর পর্যন্ত তোলা। মাথার চুলগুলো ছোট ছোট করে ঝুটি বাঁধা। বিরূপার সম্মুখে সম্ভবত একটি প্রদীপপাত্রে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত।[৪৫]

শান্তিপা

রেখাচিত্রে দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া বিরূপার মতো একই ধরনের আসনে সমাসীন দেখা যায় শান্তিপাকে। ক্ষেত্রে শান্তিপার রেখাচিত্রে দেহের উপরের অংশের বস্ত্র এবং সম্মুখে রাখা প্রদীপ ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে বিরূপার রেখাচিত্রের সাথে যথেষ্ট সাদৃশ্য চোখে পড়ে। বর্ণিত এই সকল 'আসনে সমাসীন' রেখাচিত্রের মুদ্রার সঙ্গে পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারে প্রাপ্ত টেরাকোটায় উৎকীর্ণ 'আসনে সমাসীন' মুদ্রার কিছু সাদৃশ্যও উল্লেখ করার মতো, যেমন– কঙ্কণপার পদ্মাসন মুদ্রার সঙ্গে পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারে প্রাপ্ত টেরাকোটার পদ্মাসন মুদ্রা তুলনীয়।

প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটকে নারীদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে চর্যার পদের মতোই আরোধিক নিঃসন্দেহ করে চর্যাপদকর্তাদের রেখাচিত্র এবং পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারে প্রাপ্ত টেরাকোটা। একাধিক রেখাচিত্রে ও

Dhaka University Institutional Repository

টেরাকোটাতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম মীনপা'র রেখাচিত্রের বর্ণনা দেওয়া যায়–মীনপা বিশেষ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পদদ্বয় আড়াআড়িভাবে ন্যস্ত। ডান হাত বাম হাতের উপর, বৃদ্ধাঙ্গুল স্বাভাবিক, অন্য চারটি আঙ্গুল ঈষৎ বাঁকানো, সামনে দু'টি মূর্তি, একটি ক্ষুদ্রাকৃতির নারীর এবং অন্যটির মুখমণ্ডল ঠিক মানুষের আকৃতির নয়। এই নারী ঊর্ধ্বমুখী, হস্তদ্বয়ের বিশেষ মুদ্রায় সে যেন মীনপা'র কাছে কিছু চাইছে। এমনই নারীর উপস্থিতি আরো লক্ষ করা যায় জলন্ধরপা, কাহ্নুপা, লুঈপা, শান্তিপা, জয়ানন্দ, বিরূপা, কঙ্কণপা, ভদ্রপা, কর্ণরিপা ও সরহপা'র রেখাচিত্রে।[৪৬]

চর্যাপদকর্তাদের কেউ কেউ প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটকের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। পদকর্তাদের জীবনবৃত্তান্তে দেখা গেছে সরহপা দোহা গাইতেন। তিনি বীণাপা বীণাযন্ত্র সহকারে পদাবলি গান করতেন। বীণাপার রেখাচিত্রেও তাঁকে বীণা বাদনরত দেখা যায়। অলোকা চট্টপাধ্যায় অনূদিত *চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী* থেকে জানা যায়–বীণপা বা বীণাপা তাঁর জীবৎকালে বীণ বা বীণা বাজাতেন[৪৭], অন্যদিকে সরহপা গীত বা দোহা গেয়ে রাজা-প্রজা সব শ্রেণির মানুষকে উপদেশ দিয়েছিলেন।[৪৮]

বীণাপা

এতদ্ব্যতীত পদকর্তাদের রেখাচিত্রে, তাদের অঙ্গ-আভরণের বিচিত্রতা এবং কেশ-বিন্যাস ও বন্ধনের বিচিত্রতা লক্ষ করা যায়। চিত্রে দেখা যায় ভুসুকপা'র সর্বাঙ্গ বস্ত্রে আবৃত, মস্তকে বিশেষ ধরনের টুপি যা কাঁধ পর্যন্ত প্রলম্বিত, তাঁর অঙ্গ-আভরণের মধ্যে থেকে হস্তপত্রদ্বয়, বের হয়ে বক্ষদেশ বিশেষ মুদ্রা ধারণ করে আছে। কর্ণরিপার অঙ্গ-আভরণ বেশ আকর্ষণীয়, রেখাচিত্রে তাঁর ভঙ্গি দেখে মনে হয় সে যেন কিছু পরিবেশন করছেন অভিনয়ের আঙ্গিকে। শান্তিপা ও বীণাপা'র অঙ্গ-আভরণও উল্লেখ করার মতো। তন্তিপা, কাহ্নুপা, জলন্ধরপা ও মীনপা'র রেখাচিত্রে তাদেরকে নৃত্যরত দেখা যায়।

ভুসুকপা

চর্যাপদে বেশ গুরুত্ব সহকারে বহুবার নৃত্যের প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে এসেছে। আবার পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারে প্রাপ্ত টেরাকোটাসমূহেও ব্যাপকভাবে নৃত্যক্রিয়া উৎকীর্ণ আছে। সার্বিক দিক বিবেচনায় এনে গবেষকগণ অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের বাংলায় প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারাকে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সজ্জিত নর-নারীর সম্মিলিত অংশগ্রহণে পরিবেশিত নৃত্য-গীতের অভিনয় বলে শনাক্ত করেছেন।[৪৯]

প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত বুদ্ধ নাটকের প্রকৃতি খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকের পর সম্ভবত কিছুটা পরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করে। কেননা, সে সময়ে বাংলাদেশে ইসলাম অনুপ্রবেশ ঘটে। আর বাংলার বৌদ্ধগণ নবাগত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইসলাম ধর্মে যদিও নৃত্য-গীত-অভিনয় নিষিদ্ধ,

Dhaka University Institutional Repository

তবুও নবধর্মগ্রহণকারী এদেশের সাধারণ মানুষেরা স্বদেশের গ্রাম্য নাট্যরীতি পরিত্যাগ না করে তাকে নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত সজীব ভাবেই লালিত রাখে। এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেনের অভিমত হচ্ছে–'দু-হাজার আড়াই হাজার বছর ধরে যে বিশিষ্ট নাট্যরীতি আমাদের দেশে সাধারণ জনগণের–রাজপণ্ডিত, ধনীর নয়–চিত্তবিনোদন করে এসেছে তা কালবশে ক্ষীণধারা ও লুপ্তপ্রায় হলেও অদ্যাবধি প্রধানত মুসলমান নাটুয়াদের দ্বারাই রক্ষিত হয়েছে।'[৫০] এ ধরনের মন্তব্য থেকে বাংলার নাট্যঐতিহ্যের সাম্প্রতিক রূপের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যা প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম ও বৈদিকধর্মের পথ পাড়ি দিয়ে অপরাপর ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন নতুনভাবে চর্চিত হয়ে আসছে।

তিন

চর্যাপদের মতো প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যের প্রমাণ ধারণ করে রয়েছে–খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষের দিকে বাংলার রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেব রচিত *গীতগোবিন্দ*। 'সমালোচকেরা বলেছেন গীতগোবিন্দ নাটগীতির আঙ্গিকে লেখা।'[৫১] কথিত আছে যে, "জয়দেব গীতগোবিন্দের পদ গাহিতেন। আর পদ্মাবতী তাল অনুরূপ নাচিতেন, এই জনশ্রুতি অর্বাচীন নয়।"[৫২] খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে কোচবিহারের কবি রামসরস্বতীর 'জয়দেব' শীর্ষক কাব্যে নিম্নোক্ত বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে :

জয়দেব মাধবক স্তুতিয়া বর্ণাবে,
পদ্মাবতী আগন্তু নাচত ভঙ্গিভাবে।
কৃষ্ণের গীতক জয়দেব নিগ্‌দতি,
রূপক তালর চেবে নাচে পদ্মাবতী।[৫৩]

চর্যাপদের ১৭ সংখ্যক পদের কথাবস্তুর সাথে জয়দেব-পদ্মাবতীপ্রসঙ্গ মিলিয়ে পড়লে একটি কথা স্পষ্ট হবে যে, নাটক তখন ছিল নৃত্য ও গীতের ওপর নির্ভরশীল; আর সমস্ত অভিনয় কাজটি ছিল দুই-ব্যক্তির যুগ্ম ক্রিয়াকর্ম। তখনও কথা অধিক প্রশ্রয় পায়নি, নৃত্য ও গীত আধিপত্য করছে।[৫৪]

বাংলা নাটকের ইতিহাস রচয়িতা সুরেশচন্দ্র মৈত্রের মতে, 'অভিনয়ের আঙ্গিক যাই হোক, জয়দেব-লিখিত গীতগোবিন্দ নাটক হিসেবে খুবই পরিণত রচনা।'[৫৫] তাঁর মত প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আরও বলেছেন–

> *গীতগোবিন্দ* 'নাটগীতি'র আকারে লেখা, একথা প্রথমে বলেন ল্যাসেন; অধ্যাপক লেভিও অনুরূপ মত প্রকাশ করেন। শ্রেয়াডর আর একটু অগ্রসর হয়ে বলেছেন, *গীতগোবিন্দ* একখানি 'সুমার্জিত যাত্রা'।
>
> যাত্রা অপেক্ষাকৃত উন্নত নাট্যকলা। নাটগীতি অপেক্ষা যাত্রার মধ্যে নাট্যকলার কিঞ্চিৎ পরিণত রূপ ফুটে উঠেছে। দৃশ্যসংস্থান ও অঙ্কবিভাগ দেখা যায়, কুশীলবের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যাত্রায় নৃত্যগীতের প্রাধান্য লোপ পায়নি, কিন্তু সংলাপ থাকা অত্যাবশ্যকীয়। তাই যাত্রা কেবল নাটগীতি

Dhaka University Institutional Repository

নয়। জে. এল. ক্লীন *গীতগোবিন্দ*কে একপ্রকার "Divine idyll" এবং "a mystery play of the Hindus" বলেছেন। অধ্যাপক ক্লীনের মতটি গ্রহণযোগ্য মনে হয়।[৫৬]

মনে রাখা প্রয়োজন যে, *গীতগোবিন্দ*-এর উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক গীতগুলি শুধু নাট্যবস্তু নয়। তার মধ্যে একই সঙ্গে কিছু সন্দর্ভ আছে। গীতিগুলি অভিনয়কালে পৃথক পৃথক কুশীলব কর্তৃক নৃত্যসহ গীত হত, আর সন্দর্ভগুলি সূত্রধার বা নাট্যের অধিকারী স্তোত্রের মতো আবৃত্তি করতেন–সে আবৃত্তিতে সুরের স্পর্শ থাকত। চর্যাপদের মতোই জয়দেবের *গীতগোবিন্দ*-এর অভিনয় মঞ্চ ছিল দেবমন্দির প্রাঙ্গণে।[৫৭]

দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত *গীতগোবিন্দ* কাব্য যেন দ্বাদশ অঙ্কে বিভক্ত একটি নাটক। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এই কাব্যকে নাট্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়ে কোনো অন্যায় করেননি।[৫৮] এই নাট্যকাব্যে প্রধান দুটি চরিত্র হল–কৃষ্ণ ও রাধা; তাঁদের লীলা-ই হল এই নাট্যকাব্যের কথাবস্তু। তৃতীয় আরেকটি চরিত্র হল সখী, তিনি লীলার সহায়িকা। এই তৃতীয় চরিত্রের প্রবর্তনায় এই কাব্যের নাট্যরস জমাট বেঁধেছে।[৫৯]

গীতগোবিন্দ-এর শ্লোক সংখ্যা ৮০ এবং গানের সংখ্যা ২৪। শ্লোকসমূহ সূত্রধার বা মূলগায়েন কর্তৃক পরিবেশিত হত এবং গানগুলি দোহার কণ্ঠে ধুয়াসহ গীত হত। আর গানের হাব-ভাব ফুটিয়ে তুলতো মূলত নর্তকী। অর্থাৎ *গীতগোবিন্দ* গীতি-নৃত্য ও বর্ণনার মাধ্যমে আসরে পরিবেশিত হত। বাংলা নাট্যবিশেষজ্ঞ সেলিম আল দীনের মতে, গীতগোবিন্দ 'একটি নৃত্য সম্বলিত গীতিনাট্য'। তবে, যেহেতু রাধা, সখী ও কৃষ্ণের পৃথক সংলাপ আছে, সেজন্য কারো কারো মতে, সমগ্র *গীতগোবিন্দ* তিনটি পৃথক চরিত্র দ্বারা অভিনীত হত। সে যা-ই হোক জয়দেবের *গীতগোবিন্দ*-এর এই পরিবেশনরীতি নিশ্চিতভাবে প্রাচীন বাংলার নাট্যরীতিরই অংশ। আর একথাও ঠিক যে, পরবর্তীকালে এই *গীতগোবিন্দ* বাংলা সীমান্তবর্তী প্রাদেশিক নাট্যধারায় বিপুল প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়।[৬০]

জয়দেবের *গীতগোবিন্দ*-এর অনুসরণ লক্ষ করা যায়–খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে শেষের দিকে বাংলা ভাষায় রচিত বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে। এই কাব্যে কবি বড়ু চণ্ডীদাস জয়দেবের গানের অনুবাদও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৬১] শুধু তা-ই নয়, এই কাব্যে *গীতগোবিন্দে*-র মতোই প্রধান তিনজন পাত্র-পাত্রী বর্তমান–কৃষ্ণ, রাধা ও বড়ায়ি। তবে, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের ঘটনা জটিল ও ব্যাপক। স্থান ও কাল জয়দেবের তুলনায় অনেক বেশি বিস্তৃত। রাধা সহজে কৃষ্ণকে ধরা দিতে চান নি। কৃষ্ণ ছলে বলে কৌশলে রাধাকে বশে এনেছেন। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* রাধা চরিত্রে নাটকোচিত দ্বন্দ্বের ভূমিকা উজ্জ্বল। সব মিলে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যকে বাংলা ভাষার প্রাচীন 'নাটগীতি'র উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে উল্লেখ করা যায়।[৬২] কিন্তু *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* একটি অখণ্ড নাটক নয়, এটি অনেকগুলি পালা বা নাটকের সমষ্টি।[৬৩]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কাহিনির কাঠামো কয়েকটি স্বতন্ত্র খণ্ডে বিভক্ত। যার মধ্যে জন্মখণ্ড ঠিক নাটকের আকার পায়নি, অনেকটা পাঁচালীর গায়েনের মুখনিঃসৃত পালা-কাহিনির আদল পেয়েছে। তাম্বুল খণ্ড নাটক ও আখ্যানকাব্যের মাঝামাঝি রূপ পেয়েছে। দান ও নৌকা খণ্ড থেকে পুরোপুরি নাট্যরীতি অবলম্বিত হয়েছে,

Dhaka University Institutional Repository

দান খণ্ডে সখী বা বড়ায়ির ভূমিকা মুখ্য। বংশী খণ্ডে রাধা প্রধানা হয়েছেন, তবু সখীর ভূমিকা পরিহার্য নয়। এমনকি বিরহ পালাতে রাধা যেখানে সর্বপ্রধানা, সেখানেও বড়ায়ি পরিত্যজ্য হতে পারে না।[৬৪]

নাটকীয় ঘটনা সংঘটনে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর নাটকীয়তা *গীতগোবিন্দ* থেকেও বেশি বলে শনাক্ত করা যায়। কেননা, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর রাধা ক্রমবিকাশের নানা পর্যায় সুচারু রূপে অর্জন করেছেন। শুধু উত্তরপ্রত্যুত্তরে এই কাব্যেও নাটকীয়তা নির্ভর করেনি, বা সখী চরিত্রের প্রবর্তনায় নাট্যরূপ ঘনীভূত হয়নি। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রথম চরিত্রের বিকাশ প্রত্যক্ষ করা গেল। নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে রাধিকা যতটা বিকশিত হয়ে উঠেছেন, ততটা নায়িকা হয়ে উঠেছেন। নাটকে সচারাচার অঙ্কে অঙ্কে চরিত্র বিকশিত হয়। এই কাব্যে এক একটি খণ্ড বা পালার মধ্যদিয়ে রাধা বিকশিত হয়ে উঠেছেন। দ্বিতীয়ত এই নাটকের ঘটনা সংস্কৃত নাটকের মতো অতটা নৈপথ্য-নির্ভর নয়। সব কিছু দর্শকের চোখের সামনেই ঘটেছে।[৬৫]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে স্পষ্টত নাট্যনির্দেশ জ্ঞাপক কতকগুলি সংকেত ব্যবহার প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন–দণ্ডক (বর্ণনাত্মক বা বিবৃতিময়), লগনী (দ্বিসংলাপময় নাট্যরসাশ্রিত গীতপদ্ধতি), চিত্রক লগনী বা লগনী চিত্রক (চেষ্টা বা উদ্যোগ সমন্বিত দ্বিসংলাপময় গান), বিচিত্র (চিত্রক), লগনী দণ্ডক (সচেষ্টিত দ্বিসংলাপ গানের অংশ যা বর্ণনাত্মক বা বিবৃতিময়), প্রকীর্ণ বা প্রকীর্ণক লগনী (একাধিক দ্বিসংলাপময় ও বর্ণনা বিবৃতিময় অংশ), প্রকীর্ণ বা প্রকীর্ণক লগনী দণ্ডক (পূর্বোক্ত প্রকীর্ণ লগনী যদি আদ্যন্ত বর্ণনা বিবৃতিময় হয়), চিত্রক প্রকীর্ণ বা প্রকীর্ণক লগনী দণ্ডক (চেষ্টাময় একাধিক দ্বিসংলাপময় অংশের সঙ্গে বর্ণনা বিবৃতির মিশ্রণ), কাব্যোক্তি প্রকীর্ণক লগনী (প্রকীর্ণক লগনী গানে হৃদয়াবেগ যুক্ত চেষ্টিতের প্রাধান্য)।[৬৬]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের আখ্যানে দেবতাদের মন্ত্রণায়-কংস-বিনাশের জন্য কৃষ্ণের জন্ম, রাধার প্রতি কৃষ্ণের প্রেম নিবেদন, সম্ভোগ, মান-বিরহ ইত্যাদি এক সুগভীর জুগুপ্সার পথ বেয়ে ক্রম পরিণতি লাভ করেছে। যা একটি নাট্যকাহিনির সুবিন্যস্ত আঙ্গিক ও তা পরিবেশনে ব্যবহার উপযোগী। শুধু তাই নয়, এই আখ্যানের বিশেষত্ব হচ্ছে, এর প্রায় প্রতিটি পদেই স্বতন্ত্রভাবে গীতিকবিতার ধাঁচ আছে। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে পরবর্তীকালের পাঁচালি কাব্যের পদ-রচনা কৌশলে এ কাব্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাকৌশল ও বিস্তৃত সংলাপ সহযোগে গঠিত পদগুলির আঙ্গিকগত প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে।[৬৭]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর পদসমূহকে সর্বমোট চার ভাগে ভাগ করা যায়–শুদ্ধ বর্ণনাত্মক পদ, সংলাপ ও বর্ণনার যুগল মিশ্রণে রচিত পদ, উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক পদ ও চরিত্রের একক সংলাপভিত্তিক পদ। এর বর্ণনামূলক পদসমূহের বহু স্থলে বর্ণনা ও সংলাপের পারস্পর্যময় উপস্থিতি বর্ণনাকে জীবন্ত ও গতিশীল করে তুলেছে। অন্যদিকে উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক পদসমূহ চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক উন্মোচন ও কাহিনির অগ্রগতি সাধনের এক সূক্ষ্ম অথচ প্রাণবন্ত শিল্পকৌশলের দৃষ্টান্ত।[৬৮] সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, সংলাপাত্মক পদের পরিসর *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর সর্বত্রই বিস্তৃত আকারে পাওয়া যায়।[৬৯]

গভীরভাবে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, বড়ু চণ্ডীদাস হচ্ছেন *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর রচয়িতা এবং প্রথম গায়েন। কাব্যের পদান্তে ভণিতার সর্বত্রই 'গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে' দেখা যায়। এর অর্থ, বড়ু চণ্ডীদাস গায়েন রূপে আসরে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' পরিবেশন করতেন। এছাড়া, এ কাব্যে সুনির্দিষ্টভাবে ধ্রুপদ অর্থাৎ ধুয়ার ব্যবহার

Dhaka University Institutional Repository

দেখা যায়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ আখ্যান পরিবেশনে সুনির্দিষ্টভাবে দোহারের ভূমিকা বিদ্যমান। কাজেই বাংলা বর্ণনাত্মক নাট্যরীতির দুটি প্রধান উপাদান—গায়েন ও দোহার *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* লভ্য।[৭০]

এ কাব্যের উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক পদসমূহ বিচার করে মধ্যযুগের বাংলানাট্যের ইতিহাস রচয়িতা অধ্যাপক সেলিম আল দীন দেখিয়েছেন—*শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* নিরালম্ব বর্ণনাত্মক পদের চেয়ে সংলাপাত্মক পদেরই প্রাধান্য। এ সকল সংলাপের প্রাসঙ্গিকতা ও অনিবার্যতা বিচার করলে দেখা যায় যে, সেগুলি চরিত্রমূলক উপস্থাপনের ক্ষেত্রেই অধিকতর প্রযোজ্য। কেবল গায়েনকেন্দ্রিক উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে রচিত হলে বড়ু চণ্ডীদাস সমগ্রকাব্যে সংলাপ বা উক্তি-প্রত্যুক্তির এত বিস্তৃত ও নাট্যমূলক প্রয়োগকৌশল অবলম্বন করতেন না। এ কাব্যে পদধৃত উক্তি-প্রত্যুক্তি পাত্রপাত্রীর মনস্তাত্ত্বিক সংকট, দ্বন্দ্ব ও কাহিনির অগ্রগতি সাধন করেছে। এ কারণেই এর আঙ্গিক হয়ে উঠেছে নাট্যমূলক।[৭১]

সাম্প্রতিক কালে প্রচলিত লীলাশ্রেণীর নাটকে [যেমন—রামলীলা, কৃষ্ণলীলা, চৈতন্যলীলা ইত্যাদি পরিবেশনশিল্পে] পাত্রপাত্রীর গীত সংলাপের শেষ পদ বা চরণ সাধারণত দোহার সহযোগে গীত হয়। দোহারের দিশাগীতের এই অতিরিক্ত পরিবেশন বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যরীতির একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য।[৭২]

চর্যাপদ, গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর সাহিত্য ভাণ্ডার থেকে বাংলা নাটকের ইতিহাস নির্মাণের যুক্তিনিষ্ঠ অভিযাত্রার পূর্ণাঙ্গতা আসে চৈতন্য মহাপ্রভুর অভিনয় আয়োজনে। আসলে, প্রাচীন কালের পর মধ্যযুগের বাংলায় অভিনয়চর্চার সুস্পষ্ট ইতিহাস পাওয়া যায় মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সপার্ষদ অভিনয়ে। চৈতন্যদেবের অভিনয়-লীলার প্রসঙ্গ *চৈতন্যচন্দ্রোদয়, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, ভক্তিরত্নাকর* প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। *চৈতন্যচন্দ্রোদয়* মহাপ্রভুর তিরোধানের ঊনচল্লিশ বছর পরে রচিত। মহাপ্রভুর লীলা বিষয়ে গ্রন্থকর্তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল। কবিকণপুর বলেছেন, মহাপ্রভুর প্রেমভক্তি প্রভৃতি লীলার মাধুর্য অশেষ; কিন্তু তার থেকেও আকর্ষণীয় হল তাঁর এই সব নৃত্য-গীতি-অভিনয়াদির লৌকিক লীলা।[৭৩]

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে চৈতন্য মহাপ্রভুর এই নাট্যাভিনয়ের স্থান, কথাবস্তু, কুশীলবের প্রকৃতি, এমনকি শ্রোতাদের পরিচয় পর্যন্ত সংকলিত হয়েছে।[৭৪]

অভিনয় বাইরে বা সাধারণ বারোয়ারি স্থানে হয়নি; হয়েছে রসজ্ঞের গৃহে। আচার্যরত্ন অর্থাৎ চন্দ্রশেখরাচার্যের গৃহে চৈতন্যের অভিনয়লীলা সুসম্পন্ন হয়; অভিনয়ের কথাবস্তু ছিল বৃন্দাবন-লীলার দানখণ্ড পালা। নাটকে কার কোন ভূমিকা, তাও বিধৃত হয়েছে, যথা :

১. শ্রীকৃষ্ণ—অদ্বৈতাচার্য।
২. শ্রীরাধিকা—মহাপ্রভু চৈতন্যদেব।
৩. সূত্রধার—হরিদাস।
৪. পারিপার্শ্বিক—মুকুন্দ।
৫. দূতী যোগমায়া—নিত্যানন্দ।
৬. নারদ—শ্রীবাস।

Dhaka University Institutional Repository

৭. স্নাতক–শুক্লাম্বর।

শ্রীবাসের তিন সহোদর গায়ক; নেপথ্য রচনার ভার পড়ল বাসুদেব আচার্যের স্কন্ধে। নেপথ্যকারক অর্থে 'dresser' বলা হয়েছে; অনুবাদক প্রেমদাস বলছেন–"বাসুদেবাচার্য হৈল বেশ সম্পাদক।" বাসুদেবাচার্যের 'make-up' খুব প্রশংসিত হয়েছিল; অনুবাদক লিখিছেন :

রাধাবেশে গৌরচন্দ্র আসি প্রবেশিলা॥
বিশ্বম্ভর বলি কেহ চিনিতে না পারে।
আকৃতি প্রকৃতি রাধা সভে মনে করে॥
(*চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী*–প্রেমদাস–পৃ. ৪৬)

শ্রীবাস ও তাঁর সহোদরগণের বধূগণ, আচার্যরত্ন, মুরারি প্রভৃতির স্ত্রী অভিনয়-প্রাঙ্গণে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন। উল্লেখ্য, *চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী* নাটকের এই বিবরণের সাথে চৈতন্যভাগবতের বিবরণের কোন বড়ো রকমের গরমিল নেই।[৭৫] তবে, বৃন্দাবন দাস রচতি *চৈতন্য-ভাগবতে*র মধ্যখণ্ডের অষ্টাদশ অধ্যায়ে চৈতন্যের (১৪৮৬ থেকে ১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দ) নাট্যাভিনয়ের বিবরণ অধিক বিস্তৃত।

বৃন্দাবন দাসের বিবরণ থেকে জানা যায়–একদিন চৈতন্য তাঁর বৈষ্ণব-স্বজনকে বললেন :

একদিন প্রভু বসিলেন সবাস্থানে।
আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বন্ধনে॥

অর্থাৎ, একদিন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ভক্তদের মাঝে বসে বললেন–আজ আমি অঙ্কবন্ধ নাটক (নাটপালা) অভিনয় করব।

এ থেকে জানা গেল, চৈতন্যদেব অঙ্কে বিভক্ত নাটগীতিই অভিনয় করেছিলেন। *পারিজাতহরণ*, *জগন্নাথবল্লভ*, *বিদগ্ধ মাধব*, *ললিত মাধব*, *অংকীয়া নাটে*র মতোই তা ছিল অঙ্কে বিভক্ত।[৭৬]

এই অভিনয়ের প্রয়োগকলা সম্বন্ধেও বিস্তৃত তথ্য আছে। যার প্রথমেই সাজসজ্জার প্রসঙ্গ বলা হয়েছে।

চৈতন্যপ্রভু নিজে নাটক করবেন বলে সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানকে ডেকে সাজসজ্জার ভার দিলেন :

বলিলেন প্রভু কাচ সজ্জ কর গিয়া
শঙ্খ, কাঁচুলী, পাটশাড়ী, অলঙ্কার
যোগ্য যোগ্য করি সাজ কর সভাকার ॥

শুধু তা-ই নয়, চৈতন্যপ্রভু বলে দিলেন–নাট্যাভিনয়ে কে কী ভূমিকা নেবেন। বললেন–গদাধর পণ্ডিত সাজবেন রুক্মিণী ('গদাধর করিবেন রুক্মিণীর, কাচ'), ব্রহ্মানন্দ সাজবেন 'তলবুড়ি', রাধার সখী সাজবেন সুপ্রভা, নিত্যানন্দ হবেন বড়াই, কোতোয়ালের ভূমিকায় অভিনয় করবেন হরিদাস, নারদ সাজবেন শ্রীবাস পণ্ডিত, নারদের চেলা ('স্নাতক') সাজবেন শ্রীবাসের ভাই শ্রীরাম।

Dhaka University Institutional Repository

এমন কথা শুনে শ্রীবাসের আরেক ভাই শ্রীমান বললেন—আমি 'দেউটিয়া' (দীপধারী) হব।

তখন অদ্বৈত বললেন, কাকে নায়কের ভূমিকা দিচ্ছেন ('কে করিবে পাত্র কাচ?')।

চৈতন্যপ্রভু বললেন, গোপীনাথ সিংহ পাত্র হবে।

তারপর বুদ্ধিমন্ত খানকে তাড়াতাড়ি গোছগাছ করবার আদেশ দিয়ে চৈতন্যপ্রভু বললেন—'কাচ সজ্জ কর গিয়া নাচিবাঙ আমি।' এই বাক্য থেকে প্রতীয়মান হয়—চৈতন্যপ্রভু নাচবেন মানে তিনি রাধার ভূমিকা নেবেন। আর চরিত্রাভিনয়ের তালিকা থেকে একথাও অনুমান করা যায়—চৈতন্যের সংকল্পিত অভিনয় ছিল 'রাধা-বিরহ।'

কৃষ্ণ রুক্মিণীকে নিয়ে দ্বারকায় সুখে আছেন, আর রাধা ব্রজে থেকে কৃষ্ণকে না-দেখার ব্যাকুলতায় দুঃখে আছেন। কখনো হয়তো তাদের দুজনের ক্ষণিক মিলন হত, কিন্তু তাতে তৃপ্তি হত না। অর্থাৎ তাদের অবস্থা চৈতন্যের প্রিয় শ্লোক—'যা কৌমারহরঃ য এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপাঃ'-এর মতো।

সাজসজ্জার পর মোটামুটি একটি মঞ্চ তৈরির বিবরণও লাভ করা যায়। এবং একজন মঞ্চাধ্যক্ষও ছিলেন সেই মঞ্চের।

যেইক্ষণে কথিয়ার চাঁদোয়া টানিয়া।
কাচ সাজ করিলেন সুচ্ছন্দ করিয়া॥

নাট্যাভিনয়ের জন্য চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়ির আঙিনায় কাণ্ডার ('কথিয়ার') ও চান্দোয়া টাঙিয়ে মঞ্চ প্রস্তুত করা হল। এই অবসরে বুদ্ধিমন্ত খান অভিনয়-সামগ্রী যোগাড় করে চৈতন্যের কাছে নিয়ে এলেন। তা দেখে চৈতন্য খুশি হলেন। তিনি ঠাট্টা করে বৈষ্ণবদের সাবধান করে দিলেন :

প্রকৃতিস্বরূপা নৃত্য হইব আমার
দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয় তার অধিকার।
সেই সে যাইব আজি বাড়ির ভিতরে
যে যে জন ইন্দ্রিয় ধরিতে শক্তি ধরে।

একথা শুনে অদ্বৈত আচার্য প্রথমেই মাটিতে দাগ কষে বললেন—'আজি নৃত্য দরশনে মোর নাহি কার্য।' শ্রীবাস পণ্ডিত বললেন—'মোর ওই কথা।' তখন হেসে চৈতন্য বললেন—তা কি হয়? চৈতন্য বললেন :

তোমরা না গেলে নৃত্য কিসের লাগিয়া।

যথাসময়ে দলবল নিয়ে চৈতন্য চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে গেলেন। পুত্রবধূকে নিয়ে শচীও চললেন। তার সঙ্গে চলল—'যত আপ্ত বৈষ্ণবগণের পরিবার।'

চৈতন্য সঙ্গীদের নিয়ে কাজ করতে বসলেন। অদ্বৈত হাতজোড় করে বারবার বলতে লাগলেন—'মোরে আজ্ঞা প্রভু কোন কাচ কাচিবার?'

Dhaka University Institutional Repository

চৈতন্য বললেন—সব কাচেই তো তোমার দক্ষতা, 'ইচ্ছা অনুরূপ কাচ আপনার।'

অদ্বৈত আনন্দে আত্মহারা, কোন একটা ভূমিকায় লেগে থাকবার মতো তার মনের অবস্থা নয়। মোটামুটি তিনি বিদূষকের ভূমিকা নিয়েছিলেন।

বাহ্য নাহি অদ্বৈতের কি করিব কাচ
ভ্রূকুটি করিয়া বুলে শান্তিপুরনাথ ॥
সর্বভাবে নাচে মহা বিদূষক প্রায়
আনন্দসাগর মাঝে ভাসিয়া বেড়ায় ॥

নাটক আরম্ভ হল কীর্তন দিয়ে। *চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে* মৃদঙ্গধ্বনির কথাও অধিকন্তু বলা হয়েছে :

কীর্তনের মহারম্ভ করিল মুকুন্দ।
রামকৃষ্ণ নরহরি গোপাল গোবিন্দ॥

পারিজাতহরণ, *জগন্নাথবল্লভ*, *অংকীয়া নাটে* যেমন শ্লোক দিয়ে সূচনা হয়েছে, এখানেও তাই প্রত্যক্ষ করা যায়।[৭৭]

অর্থাৎ, মুকুন্দ দত্ত অভিনয়ের শুভারম্ভ করলেন। মঞ্চে এসেই তিনি—'রাম কৃষ্ণ নরহরি গোপাল গোবিন্দ' এই ছত্রটি কীর্তন করতে শুরু করলেন।

কীর্তনের পর সূত্রধারের অর্থাৎ কোটালের প্রবেশ ঘটেছে। হরিদাস এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। বৃন্দাবন দাসের রচনায় কোটালের ভূমিকায় হরিদাসের অভিনয়ের বর্ণনায় বলা হয়েছে :

প্রথমে প্রবিষ্ট হইলা প্রভু হরিদাস।
মহা দুই গোঁফ করি বদনে বিলাস॥
মহা পাগ শিরে শোভে ধটি পরিধানে।
অঙ্গদ বলয় করে নূপুর চরণে॥

হাতে লাঠি নিয়ে তিনি রঙ্গভূমিতে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে বলতে লাগলেন :

আরে আরে ভাই সব হও সাবধান।
নাচিব লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ॥

সূত্রধার ও নটী যেভাবে নাটকের বক্তব্য বিষয় উপস্থাপন করে থাকে; এখানেও তাই দৃষ্ট হয়। এইভাবে চৈতন্য-অভিনীত নাটকের (হোক না তা অ-লিখিত, কিন্তু রচিত বটে!) কিছু কিছু সংলাপ বৃন্দাবন দাসের অনুগ্রহে লভ্য।[৭৮] যেমন—হরিদাস যখন বলেন :

কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ সেব বল কৃষ্ণ নাম।
দম্ভ করি হরিদাস করয়ে আহ্বান॥

Dhaka University Institutional Repository

হরিদাসের অভিনয় ও মুখের এই সংলাপ শুনে দর্শক-শ্রোতাগণ সমস্বরে হেসে ওঠেন। কেউ কেউ বললেন—কে তুমি? এখানে কোটাল কেন?

হরিদাস বললেন—আমি বৈকুণ্ঠের কোটাল, 'কৃষ্ণ জাগাইয়া আমি বুলি সর্বকাল।' বৈকুণ্ঠ ছেড়ে প্রভু আজ এখানে এসেছেন, তিনি লক্ষ্মীভাবে এখন নৃত্য করবেন। তোমরা হুঁশিয়ার হয়ে প্রেমভক্তি লুটে নাও।

এত বলি দুই গোঁফ মুচুড়িয়া হাথে
নড় দিয়া বুলে গুপ্ত মুরারির সাথে।

এর একটু পরেই নারদের বেশে শ্রীবাস প্রবেশ করে :

মহা-দীর্ঘ পাকা দাড়ী ফোঁটা সর্ব-গায়।
বীণা স্কন্দে কুশ হস্তে চারিদিগে চায় ॥
রামাঞি পণ্ডিত কক্ষে করিয়া আসন।
হাথে কমণ্ডলু-পাছে করিলা গমন ॥

অর্থাৎ নারদের পিছনে পিছনে রামাই পণ্ডিত চেঁলা সেজে বগলে আসন হাতে কমণ্ডলু নিয়ে এলেন। এসেই আসন বিছিয়ে দিলেন। শ্রীবাস বসলেন যেন সাক্ষাৎ নারদ। অদ্বৈত গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন,—কে তুমি? এখানে কেন এলে?

শ্রীবাস উত্তর দিলেন—আমি নারদ, কৃষ্ণের গায়ন। আমি অনন্ত, ব্রহ্মা ঘুরে বেড়াই। বৈকুণ্ঠে গিয়েছিলুম কৃষ্ণকে দেখতে। সেখানে শুনলাম কৃষ্ণ নদীয়ায় এসেছেন, দেখলুম সব ঘর দ্বার শূন্য। শূন্য বৈকুণ্ঠপুরীতে থাকতে না পেরে ঠাকুরকে মনে করে এখানে এসেছি। প্রভু আজ লক্ষ্মীর বেশে নাচবেন। অতএব এ সভায় আমার অধিকার।

শ্রীবাসের কথা শুনে শ্রোতারা জয়ধ্বনি তুললে, মেয়েরা শ্রীবাসকে চিনতেই পারলে না। শচী-মাতা বিস্ময়ভরে মূর্ছিত হয়ে গেলেন।

সাজঘরে চৈতন্য রুক্মিণীর বেশ ধরেছিলেন। তখনই তাঁর ভাবাবেশ হয়েছিল। সেইখানেই থেকে তিনি পিতৃগৃহে উৎকণ্ঠিত রুক্মিণীর মতো আচরণ করতে লাগলেন—

আপনা না জানে প্রভু রুক্মিণী আবেশে
বিদর্ভের সুতা হেন আপনাকে বাসে।
নয়নের জলে পত্র লিখেন আপনে
পৃথিবী হইল পত্র অঙ্গুলি লিখনে।

চৈতন্য যেন এখানে রুক্মিণীর বেশে শ্রীকৃষ্ণের সেই পত্রের কথা মনে করতে পারল—যে পত্রে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে তার বিপদের কথা জানিয়েছিল। রুক্মিণীর বেশে ঘরের মধ্যে বসেই চৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণের সেই

Dhaka University Institutional Repository

বিপদকথা অনুভব করে আবিষ্ট হয়ে পড়লেন। তিনি মঞ্চে এলেন কি-না বোঝা গেল না। কিংবা মঞ্চের মধ্যেই গৃহান্তর ছিল কি-না তাও জানা-বোঝা গেল না? বৃন্দাবন দাস তার বর্ণনায় শুধু জানিয়েছেন :

এইমত বোলে প্রভু রুক্মিণী-আবেশে।
সকল-বৈষ্ণবগণ প্রেমে কান্দে হাসে।

এখানে 'বৈষ্ণবগণ' আসে কী করে? কেননা, সে সময় শ্রীবাস ও হরিদাসের অভিনয় চলছিল। আসরে হরিদাস কোটালের ভূমিকায় 'জাগ জাগ' বলে ঘুরছিলেন। আর নারদের ভূমিকায় শ্রীবাস অভিনয় করছিলেন, নাচছিলেন। এভাবেই প্রথম প্রহরের কৌতুক অভিনয় শেষ হয়।

দ্বিতীয় 'প্রহরে' (এই প্রহর কি নাটকের অঙ্ক?) গদাধর রাধার সাজ ধরে সখী সুপ্রভাকে সঙ্গে নিয়ে আসরে প্রবেশ করলেন। পিছনে পিছনে বড়াই এল :

হাতে নড়ি কাঁখে ডালী নেত পরিধান
ব্রহ্মানন্দ যেহেন বড়াই বিদ্যমান।

হরিদাস কোটাল ডাক দিয়ে বললেন—'কে সব তোমরা?'

বড়াইয়ের ভূমিকায় ব্রহ্মানন্দ বললেন—আমরা মথুরা চলেছি।

নারদের ভূমিকায় শ্রীবাস বললেন—তোমরা কাদের বউ?

(ব্রহ্মানন্দ) সখী সুপ্রভা বললে—একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?

নারদ শ্রীবাস বললেন—জানা কি অন্যায়?

সুপ্রভা ঘাড় দুলিয়ে বললেন—হ্যাঁ।

গঙ্গাদাস (সম্ভবত কোটালের অনুচর) বললেন—আজ কোথা রাত কাটাবে?

ব্রহ্মানন্দ বললেন—তুমি তো ঘর দেবে।

গঙ্গাদাস বললেন—জিজ্ঞাসা করে তো মুশকিল হল। তোমরা চট করে সরে পড়।

অদ্বৈত বলয়ে এত বিচারে কি কাজ
মাতৃসম পরনারী কেনে দেহ লাজ।

অদ্বৈত রাধাকে উদ্দেশ করে বললেন—আমার কর্তা নাচ গান খুব ভালোবাসেন। তোমরা এখানে নাচো, 'ধন পাইবা প্রচুর।'

একথা শুনে গদাধর নাচ জুড়লেন। ভাবের উপযুক্ত গান ধরা হল—

রমা (রাধা) বেশে গদাধর নাচে মনোহর
সময় উচিত গীত গায় অনুচর।

Dhaka University Institutional Repository

গোপিকাবেশী গদাধরের নাচে সকলে যখন তন্ময়, তখন দেবী ('আদ্যশক্তি') রূপে চৈতন্য প্রবেশ করলেন।

আগে নিত্যানন্দ বুড়ী বড়াইর বেশে
বঙ্ক বঙ্ক করি হাঁটে প্রেমরঙ্গ ভাসে।

চৈতন্যকে দেখে সকলে অবাক হয়ে গেলেন। কেউই চিনতে পারলেন না। তবে বড়াই নিত্যানন্দকে দেখে অনুমান করা গেল। সকলে ভাবতে লাগলেন, সমুদ্রগর্ভ থেকে কি কমলা উঠে এলেন? 'রঘুসিংহ গৃহিণী কি জানকী আইলা?' না মহালক্ষ্মী পার্বতী এলেন? 'কিম্বা বৃন্দাবনের সম্পত্তি মূর্তিমতী?'

জগৎজননী ভাবে নাচে বিশম্ভর।
সময়-উচিত গীত গায় অনুচর।

চৈতন্যের তখন ভাব থেকে ভাবান্তর চলেছে :

নয়নে আনন্দধারা দেখিয়ে যখন
মূর্তিমতী গঙ্গা যেন দেখিয়ে তখন।
ভাবাবেশে যখন বা অট্ট অট্ট হাসে
মহাচণ্ডী হেন সবে বুঝেন প্রকাশে।
ঢলিয়া ঢলিয়া প্রভু নাচেন যখনে
সাক্ষাৎ রেবতী যেন কাদম্বরী পানে।
ক্ষণে বলে—চল বড়াই যাই বৃন্দাবনে
গোকুলসুন্দরী ভাব বুঝিয়ে তখনে।
বীরাসনে ক্ষণে প্রভু বসে ধ্যান করি
সবে দেখে যেন মহা কোটি যোগশ্বরী।...
আদ্যাশক্তি বেশে নাচে প্রভু গৌরসিংহ
সুখে দেখে তার যত চরণে ভৃঙ্গ।...
সমুখে দেউটি ধরে পণ্ডিত শ্রীমান
চতুর্দিকে হরিদাস করে সমাধান।

এমন সময় নিত্যানন্দ ভাবাবেশে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। আর চৈতন্যদেব ঠাকুর-ঘরে গিয়ে বিগ্রহকে কোলে নিয়ে ঠাকুরের সিংহাসনে বসলেন। অভিনয় আগেই তলিয়ে গিয়েছিল, এখন নাচও ঘুচে গেল। চৈতন্য মহালক্ষ্মীভাবে ভোর হয়ে রইলেন। বৈষ্ণবেরা তাঁকে স্তব করতে লাগল।

আনন্দে সকল লোক বাহ্য নাহি জানে
হেনই সময়ে নিশি হৈল অবসানে।

চৈতন্য যে নাটকটি অভিনয় করেছিলেন তার নাম জানা নেই। তবে, সুকুমার সেন মনে করেন রাধা-বিরহ জাতীয় নাটক।[৭৯]

Dhaka University Institutional Repository

চৈতন্য মহাপ্রভুর এই নাট্যাভিনয়ের বিবরণ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, দর্শকদের সঙ্গে, শ্রোতাদের সঙ্গে অভিনেতাদের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এই অভিনয়ে তদুপরি শুধু যে অন্তরঙ্গদেরই ছিল প্রবেশাধিকার। *চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে* বলা হয়েছে–'অন্তঃপরংণ কেষোমাপি তত্র প্রবেশঃ।'

আচার্যরত্ন ও বিদ্যানিধির ওপর দ্বাররক্ষকের দায়িত্বভার অর্পিত হয়েছিল। আধুনিক ভাষা যাকে 'Intimate Theatre' বলে, চৈতন্য-রঙ্গালয় ছিল তাই।[৮০]

অভিনয়শিল্পীর সাথে দর্শক-শ্রোতার সংলাপ বিনিময়ের বিষয় *চৈতন্যভাগবতে* বর্ণিত চৈতন্য মহাপ্রভু অভিনীত নাটকের শুরুতেই প্রত্যক্ষ করা যায়, যেমন–কোটাল বা সূত্রধার হিসেবে মঞ্চে যখন হরিদাস আবির্ভূত হন তখনই দর্শক-অভিনেতার পারস্পরিক সংলাপ ঘটে এভাবে :

হরিদাস দেখিয়া সকলগণ হাসে।
কে তুমি এথায় কেন সবাই জিজ্ঞাসে॥
হরিদাস বলে আমি বৈকুণ্ঠ কোটাল।
কৃষ্ণ জাগাইয়া আমি বুলি সর্বকাল॥

এখানে কোটাল চরিত্রটি একই সঙ্গে সূত্রধার আর পারিপার্শ্বিকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। কারণ, অন্যান্য নাটকে সামাজিক লোকদের সম্বোধন করে তাঁরাই কিছু না কিছু বলতেন।[৮১]

চৈতন্য মহাপ্রভু অভিনীত এই নাটকে কোটাল চরিত্রে হরিদাসের অভিনয়ের পর এবার নারদ চরিত্রে মঞ্চে অবতীর্ণ হন শ্রীবাস। হরিদাসের মতো শ্রীবাসের চরিত্রাভিনয়ের মধ্যেও দর্শক-শ্রোতাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রচিত হয়, আর দর্শকের সাথে সংলাপেই সেই সম্পর্ক প্রকাশিত হয়, যেমন :

শ্রীবাসের বেশ দেখি সর্বগণ হাসে।
করিয়া গভীর নাদ অদ্বৈত জিজ্ঞাসে॥
কে তুমি আইলা হেথা কোন বা কারণ।
শ্রীবাস বলেন শুন কহিবে বচন॥
আমার নারদ নাম কৃষ্ণের গায়ন।

সকল ভাষা-নাটকের হাস্য রসের জোগানদার নারদ; উমাপতি উপাধ্যায়ের *পারিজাতহরণ* থেকেই তাঁর এই সকৌতুক ভূমিকা দর্শকদের পরিচিত।[৮২]

নারদের কথাবার্তার পর নাটকের গুরুত্বপূর্ণ অংশ অভিনীত হতে শুরু করে। এখান থেকে নাটকে আর কোনো সংলাপ চোখে পড়ে না। সম্ভবত নাটকের অবশিষ্টাংশে নৃত্য প্রধান হয়ে পড়েছে। অঙ্কের বন্ধনে বন্ধনে সে নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়েছে। গীতের সহযোগিতা লাভ করে সেই নৃত্য পরিপূর্ণ হয়েছে।[৮৩]

রমা বেশে গদাধর নাচে মনোহর।
সময় উচিত গীত গায় অনুচর॥

রীতিটা হল বাংলাদেশের বহু ব্যবহৃত রীতি, ইতিহাসবিদিত রীতি। 'বুদ্ধ নাটক' এইভাবে অভিনীত হয়েছে, জয়দেবের 'মঙ্গল গীত' এইভাবে 'নাটগীতে' রূপান্তরিত হয়েছে। অংকীয়া নাটকের 'কালিদমন যাত্রা' এইভাবেই নাটক হয়ে উঠেছে। প্রণালিটি এক, বিষয় শুধু ভিন্ন, এবং দল বা গোষ্ঠীভেদে উপকরণের কিঞ্চিৎ পার্থক্য।[৮৪]

প্রায় একই সময়ে সংস্কৃত কবি জয়দেবের অনুসরণে চৈতন্যের সুহৃদভক্ত রায় রামানন্দ জগন্নাথবল্লভ রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলাকে আশ্রয় করে নাটগীত জাতীয় নাটক লিখেছিলেন। যার পাত্রপাত্রী ছিল সাতজন–কৃষ্ণ, রাধা, বিদূষক, মদনিকা, অশোকমঞ্জরী, শশিমুখী ও মাধবী। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত এ নাটকটির পরিসর খুবই ছোট। এ নাটকে একই চরিত্র প্রয়োজনমতো কখনো সংস্কৃত, কখনো প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করেছেন। এই নাটকটির বেশ কয়েকটি বাংলা অনুবাদ পাওয়া যায়।[৮৫] রামানন্দের নাট্যানুরাগের কথা সবিস্তার বিবরণ আছে কৃষ্ণদাস কবিরাজের *চৈতন্যচরিত্রামৃতে*। যেখান থেকে জানা যায় তিনি রূপ গোস্বামী রচিত *ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব* নাটকের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। রামানন্দ বৈষ্ণবীয় ধর্মগুরু চৈতন্য মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য প্রকাশে পুতুল নাচের উপমা ব্যবহার করেছেন, যথা :

ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে।
কাষ্ঠের পুতুলী তুমি পার নাচাইতে ॥[৮৬]

একজন ভাল নাট্যনির্দেশক হিসেবে রামানন্দের খ্যাতি ছিল। প্রদ্যুম্ন মিশ্র রায়গৃহে উপস্থিত হলে তাঁর সেবক বললেন :

দুই দেবকন্যা হয় পরম সুন্দরী।
নৃত্যগীতে নিপুণতা বয়সে কিশোরী ॥
তাহা দোঁহা লঞা রায় নিভৃত উদ্যানে।
নিজ নাটক গীতের গান শিক্ষায় নর্তনে ॥
সেই দুই জনা লঞা।
স্বহস্তে করান তাঁর অভ্যঙ্গ মর্দন ॥
স্বহস্তে পরান বস্ত্র সর্বাঙ্গম ন...।
তবে সেই দুই জনে নৃত্য শিখাইল।
গীতার গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইল ॥
সঞ্চারী সাত্ত্বিক স্থায়িভাবের লক্ষণ।
মুখ নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন ॥
ভাব প্রকট লাস্য রায়ে যে শিক্ষায়।
জগন্নাথের আগে দোঁহে প্রকট দেখায় ॥

এ থেকে অনুমান করা যায়, *জগন্নাথবল্লভ* নাটকটি অভিনীত হয়েছিল। কেননা, রায় 'নিজ নাটক গীতের' মহড়া বা রিহার্সল দিয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য, রায় রামানন্দ বাঙালি ছিলেন না। কিন্তু তাঁর রচনার প্রভাব বাংলা বৈষ্ণবসাহিত্যে গুরুতরভাবে পড়েছে। বাংলার ঐতিহ্যবাহী বৈষ্ণবীয় নাট্যচর্চার ভেতরেও তাঁর প্রভাব পড়েছে। সে যাই হোক বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যচর্চার আরেকটি উদাহরণ ধরা আছে *চৈতন্যচরিত্রামৃতে*–

বঙ্গদেশী এক বিপ্র প্রভুর চরিতে।
নাটক করি লইয়া আইল শুনাইতে ॥

স্বরূপ দামোদর এই নাটকটি অনুমোদন করেননি। নাটকটির নামও জানা যায় না। কে এই বিপ্র তাও জানা যায় না। তবে নাটকটির নান্দী শ্লোক *চৈতন্যচরিত্রামৃতে* উদ্ধৃত আছে। ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে গোবিন্দদাস *সঙ্গীতমাধব* নামে একখানি 'সঙ্গীত-নাটক' লিখেছিলেন, কিন্তু তার কোনো লিখিত নিদর্শন এখনও হস্তগত হয়নি।[৮৭]

'নাটগীত' মধ্যযুগের বাংলায় প্রচলিত এক সমৃদ্ধ নাট্যরীতি। আনুমানিক ১৫৪৫ খ্রিষ্টাব্দে রচিত শেখ ফয়জুল্লাহ-র *গোরক্ষবিজয়* কাব্যে এই শ্রেণীর নাট্যরীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে :

নাট কর নাটুয়া তাল বাহ ছলে।
তোহ্মার মাদলে কেন গুরু গুরু বোলে।[৮৮]

এখান থেকে স্পষ্টত অনুধাবন করা যায়–নৃত্যসম্বলিত গীতের পরিবেশনকে মধ্যযুগে নাটগীত বলা হয়েছে। আর নাটগীতের অভিনয়ে সাধারণত রামায়ণ, মহাভারত এবং পৌরাণিক কাহিনি পরিবেশিত হত। আসলে, নাটগীতের পরিবেশনে কোনো ধরনের গদ্য সংলাপ থাকত না, শুধু নৃত্য ও গীতের মাধ্যমেই নাটগীত পরিবেশত হত। সাম্প্রতিক কালের বাংলাদেশের কিছু কিছু পরিবেশনে এখনও এই রীতি অনুসৃত হয়।[৮৯]

চার

ত্রয়োদশ শতকের শুরুতেই বাংলাদেশে মুসলমানদের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা হয়। সে সময়ে এদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনচিত্রের যেমন পরিবর্তন ঘটতে থাকে, তেমনি এদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার সকল কর্মকাণ্ডের সাথে নবাগত ইসলাম ধর্মেরও যোগ ঘটে–প্রথমত মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার পর এদেশের সমাজচিত্রে যে পরিবর্তন ঘটতে থাকে তার বিবরণের মাধ্যমে, দ্বিতীয়ত নব-উদ্ভাবিত সেই ধর্মমত প্রচারের জন্য লিখিত বিভিন্ন নাট্যাখ্যান-গীতে মুসলমানদের ধর্মীয় আচারের সম্মিলনে। নব-উদ্ভাবিত এই ধর্মমতের নাম হচ্ছে 'ধর্মপূজা', যে পূজার দেবতার নাম দেওয়া হল 'ধর্ম-ঠাকুর'। আর তার পূজায় সকল ধর্মের সম্মিলন সম্পর্কে সুকুমার সেন জানান–'ধর্ম-ঠাকুরের পূজায় হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান সর্ব ধর্মেরই অনুষ্ঠান অল্পবিস্তর নেওয়া হইয়াছে।'[৯০] আবার একথাও ঠিক যে, এই ধর্ম বা ধর্ম-ঠাকুরের পূজা ও ধর্মমঙ্গলকে আশ্রয় করে বাংলাদেশে ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার একটি বিশেষ ধরনের পরিবেশনরীতি গড়ে ওঠে।

Dhaka University Institutional Repository

শূন্যপুরাণ-এর রচনার কারণে রামাই পণ্ডিতকে ধর্ম-ঠাকুরের আদি পুরোহিত ও ধর্মপূজার প্রবর্তক হিসেবে অভিহিত করা হয়। মূলত তিনিই প্রথম ধর্মপূজার কৃত্যমূলক অনুষ্ঠানে পরিবেশনের জন্য *আগমপুরাণ* বা *শূন্যপুরাণ* রচনা করেন। এই গ্রন্থে ধর্মপূজার বিভিন্ন বিধান ছাড়াও, মুসলমানদের বঙ্গবিজয় প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। গবেষক সেলিম আল দীন *শূন্যপুরাণকে* নাট্যাঙ্গিকে পরিবেশনযোগ্য আদ্যন্ত 'পাঁচালি সঙ্গীত' বলে আখ্যায়িত করে বলেছেন–এটিই বাংলা পাঁচালি ধারার প্রথম কাব্য।[৯১] কেননা, রামাই পণ্ডিত এই কাব্যে বিবৃত করেছেন :

পরভুর চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীযুত রামাই রচিল পাঁচালী সঙ্গীত ॥[৯২]

এ কাব্যকে কবি কর্তৃক 'গীত' হত বলেও বর্ণিত হয়েছে :

গাইল পণ্ডিত রামাই জালালি-পাবন সার
ধর্মের গাজনে পড়ে জয়জয়কার ॥[৯৩]

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে :

শ্রী ধম্ম চরণে গীত পণ্ডিত রামাই গাঅ।
কলুস নাসিব ভজ নিরঞ্জন পায় ॥[৯৪]

অতএব, এই কাব্যকে গেয়কাব্য হিসেবে উল্লেখ করা যায়। *শূন্যপুরাণ* কাব্যের দু-একটি অধ্যায় কথকতার ঢঙে ও বাকি অধ্যায়গুলি গীত রূপে পরিবেশিত হত। আর এই গীত হচ্ছে কৃত্যমূলক অর্থাৎ তা আসলে ধর্মপূজার নানা অনুষ্ঠানের অঙ্গ। *শূন্যপুরাণে* গীতগুলি কোনো ধারাবাহিক কাহিনি সূত্রে একত্রিত হয়নি, বরং তা আনুষ্ঠানিকভাবে পরিবেশিত হবার জন্য একত্রে গ্রন্থিত হয়েছে। এমন বর্ণনা থেকে, প্রাচীন বাংলার পাঁচালি-রীতির নাট্য-পরিবেশন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। মোট ৫৫টি অধ্যায়ে বিভক্ত এই কাব্যের অধ্যায়গুলি সেকালের পাঁচালি ধারার নমুনা রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। *শূন্যপুরাণ* পাঁচালি হলেও তা ছিল মূলত কৃত্যমূলক পরিবেশন, অভিনয়মূলক গেয়কাব্য হিসেবে তা তখনও পূর্ণতা লাভ করেনি।[৯৫]

শূন্যপুরাণ-এর কোনো কোনো অধ্যায়ে গদ্য রচনা স্থান পেয়েছে এবং কোনো কোনো অধ্যায়ে গদ্য-পদ্যের মিশ্রণ দেখা যায়। এই গদ্য-পদ্য মিশ্রিত রচনাকে প্রাচীন বাংলা ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার কথকতা-রীতির একটি দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করা যায়। এ প্রসঙ্গে *শূন্যপুরাণ*-এর 'অথ ধর্ম্মস্নান' অধ্যায়টি উদ্ধৃত হল :

> ওঁ কার জঅঙ্কার জঅদেব ধম্ম করতার নির খাএ নিরমান খাএ জোগাএ সিদ্ধেস্বরি অমৃতমুখে বৈস বিদি বিদি কাল কেমন ঘরে রামন্তি রাম রামেশ্বর। মচ্ছ কুম্ভীর সতেক হাত অগ্নি সতেক হাত জল এতটা জলে স্তান করেন নিল্লেপ নৈরাকার।
>
> সংখ উপজিল সংখ সংখর বিচার।
> কহ কহ পণ্ডিত সংখর সার।

Dhaka University Institutional Repository

কোন সংখ জলে স্তান করেন অনাদ্দ করতার ॥১
আদ্দ সংখ জলার জুতি।
হরি হরি সংখ পাপ মুকতি ॥২
কোন সংখে না ছোঁএ পানি।
দখিন সংখে না ছোঞে পানি ॥
দখিন সংখে আপ পঅমানি ॥৩
কে সিরজিল গঙ্গা কে সিরজিল পঙ্ক।
তাহে উপজিল দ্বাদশ অঙ্গুল সংখ ॥৪

হে জধসঙ্খ হে বিজঅসঙ্খ তুম্হি সংখ হইএ চিরাই। তুম্হার জলে স্তান করেন শ্রীধর্ম্ম গোসাঞি। অভিসেক জলে স্তান মনখির কৈসের পাবন। সইতের পাবন সচল অচল। সৃষ্টি সৃজিলেন গোসাঞি ভকত-বৎসল। সুবন্নের কোদাল রূপার বাঁট। মহাদেব কুদালেন স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল। জটার কুলে পেলেন নীর। সে নীর লইআ দসমদ্য গতি বাখানি। ব্রহ্মা হইলেন পণ্ডিত বিষ্টু হইলেন কন্নি—মহাদেব মেলি করেন জলপাবন; মূলপাবন স্থলপাবন গোষ্ঠীপাবন ছায়াপাবন পণ্ডিতপাবন উত্তর দখিন পূব পচ্চিম পাবন। জীব্ভাপাবন। কাআপাবন মুণ্ড পাবন ধড় পাবন। সুবন্নর পুস্কর্ণি রূপার ঘাট এহি ফুল জলে স্তান করেন শ্রীদেব করতার। আদ্দপতি অনাদ্দপতি করিব সার। এহি সুদ্ধ পাটে ধর্ম্মর আগুসার। অস্সখ বেল পলাস মোউলর পাত। সিনান করেন পরভু তিদসর নাথ। স্তান সন্ধ্যা গোসাঞির চাম্পান দিব ঘাট। ধবল সিংহাসন গোসাঞর ধবল পাট। উরিলেন গোসাঞি ঝলমল করিএ কন্ধে নবগুন পৈতা।[৯৬]

এখানে লক্ষণীয় যে, ভাষা-রীতিতে গদ্য-পদ্যের মিশ্রণ থাকলেও প্রায় সর্বক্ষেত্রে ভাষার মধ্যে যমক অনুপ্রাসের ব্যবহার ও অন্ত্যমিল রয়েছে। এক্ষেত্রে এর গদ্য গীতল ও সুরেলা। উল্লেখ্য, নাট্যমধ্যে এ ধরনের গদ্যের নমুনা, শঙ্করদেব রচিত কালিয়দমনযাত্রায় দেখা যায়।[৯৭] সাম্প্রতিক কালে প্রচলিত *গাজীর গান*, *পদ্মাপুরাণ*, *কিচ্ছাগান* প্রভৃতি লোকনাট্যে গায়েন কর্তৃক তাৎক্ষণিকভাবে রচিত গদ্যে অনুরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে–*শূন্যপুরাণ* যে পাঁচালি-রীতিতে পরিবেশিত হত, তার বিবরণ এ কাব্যের বহু স্থানে রয়েছে। এই কাব্যের 'টীকা-প্রতিষ্ঠা' অধ্যায়ে 'নাটগীত' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

নাটগীত করে গতি এ চারি চৌপর রাতি
তামর অঙ্গুরী লইএ করে ॥[৯৮]

এছাড়া, *শূন্যপুরাণের* 'অথ গাম্ভারী মঙ্গলা' অধ্যায়ে নৃত্য-গীত-বাদ্যসহ 'গামারি মঙ্গল' নামে এক প্রকার শোভাযাত্রার উল্লেখ রয়েছে–

চৌদিকে জঅ জঅ আনন্দেত পূরল
কৌতুকেত বাজএ বাজনা।

Dhaka University Institutional Repository

গামারি মঙ্গলে চলিল ভকতাগনে
সুনিআ ধাএ সর্ব্ব জনা ॥
আনন্দে কুতুহলে নিত্ত গীত ভালে
পতাকা চলে সারি সারি।
সোল সংখ ধ্বনি দেহি নিতম্বিনী
অঙ্গনা চলে সারি সারি ॥[৯৯]

এ শ্রেণীর শোভাযাত্রার সঙ্গে ঋগ্বেদে উল্লেখিত 'দিগ্বিজয়যাত্রা'র যেমন তুলনা করা চলে, তেমনি তুলনা করা চলে মৌর্য রাজত্বকালের 'বিহারযাত্রা' এবং সম্রাট অশোকের 'ধর্মযাত্রা'র। সেই সঙ্গে একালে এদেশে প্রচলিত চৈত্র-সংক্রান্তি বিভিন্ন গ্রামীণ শোভাযাত্রার তুলনা করলে একেবারে অমূলক হবে না। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিকালে এদেশের উত্তরবঙ্গের পঞ্চগড় জেলাতে চৈত্র-সংক্রান্তি 'গমীরা' নামে এক ধরনের শোভাযাত্রার চল আছে, যেখানে বাঁশ ও কাগজের তৈরি বিভিন্ন পশু-পাখির প্রতিকৃতি নিয়ে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণের নিয়ম প্রচলিত রয়েছে।[১০০] তবে, এ প্রকার গমীরা শোভাযাত্রার সাথে *শূন্যপুরাণে* বর্ণিত 'গামারি মঙ্গল' শোভাযাত্রার সাদৃশ্য যথেষ্ট বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

সেলিম আল দীনের মতে *শূন্যপুরাণ* রচনার সমসাময়িক কালে ধর্মপূজা বিধানের অঙ্গ হিসেবে এক শ্রেণির উক্তি-প্রত্যুক্তি বা প্রশ্নোত্তরমূলক প্রথা প্রচলিত ছিল। হিন্দু-বৌদ্ধ বিরোধের যুগে শত্রু-মিত্র, আপন-পর এবং স্বধর্মীর পরিচয় জ্ঞাত হবার উপায় হিসেবে এই প্রশ্নোত্তরমূলক প্রথা উদ্ভাবিত হয়।[১০১] একই ভাবে এ সময়ে মুসলমান পির-ফকির-দরবেশদের নিয়ে যেমন সংলাপমূলক কাব্য রচিত হয়, তেমনি হিন্দু-মুসলমান ভেদ নিয়েও সংলাপমূলক কাব্য রচিত হয়। যা স্পষ্টই নাট্যসংলাপের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে ধর্মপূজার 'ছোট জালালী' পর্বে হিন্দু-মুসলমানের ভেদ নিয়ে খোন্দকারের প্রশ্নোত্তরের কিছুটা উদ্ধৃতি করা যায় :

প্রশ্ন : কাঁহা জাতে হো খোনকার আঙ্গারাখা লাগায়ে গায়।

শিরমে টোপি তেরা
হাতমে ছুরি তেরা
পাউষ দেকে পায়।

উত্তর : হারাম কি উর।
কাঁহা হাল্লাল করেগা।
ইত বাবু রামাই গায়।

এরপর অশ্বারোহী তীর-কামান-ধারী খোন্দকার এসে শ্বেত-শিমূলের তলে বসে হিন্দু-মুসলমানদের বিচার শুরু করেন। বিচারের পুরা পর্বটি প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতেই করেন। এক্ষেত্রে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে :

: আমি খোন্দকার মেরা জন্ম হৈলা কোথা।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তর এল :

: মারিয়া দুশমন কি শির।

আবার প্রশ্ন :

: বাদি সাধি কোন?

উত্তর :

: মহামদ বীর।

প্রশ্ন এল :

: কো হিন্দু কো মুসলমান।

উত্তর :

: হিন্দু পূজন্তি কাষ্ঠ পাষাণ।

মুসলমান পূজন্তি খোদায়

পুণ্য রেখ নাই।[১০২]

এভাবেই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে খোন্দকারের বিচারকার্য সমাপ্ত হয়।

এখানে সুস্পষ্টভাবে প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যের সংলাপাত্মক অংশের পরিচয় পাওয়া যায়।

শূন্যপুরাণে সে সময়ে প্রচলিত বাংলা ঐতিহ্যবাহী নাট্যের একটি জনপ্রিয় আখ্যান 'রাজা হরিচন্দ্রের ধর্ম্মপূজা' অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মূলত একটি অধ্যায়ের আকারেই রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনি বিবৃত হয়েছে, যথা :

হরিচন্দ্র রাজা করে ধর্ম্মপূজা
ভরএ নবাহুতি ঘর।
নৌতন মণ্ডপে ধর্ম্মর সমীপে
রাণী মাগে পুত্রবর॥১
পচ্চিম দুআরে চন্দ্রর গোচরে
রাজা করে নিবেদন।
সঙ্গে চারিসঅ গতি ভেটী জুগপতি
কপাট কর নিবারন ॥২
শুনিআ রাজার বাণী ঘুচাল কপাট খানি
দুআর মুক্ত করিল মদনা।
চন্দনর ছড়া ঝাটী করি নানা পরিপাটী
চন্দ্র পদে করিল বন্দনা ॥৩

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গে আটসঅ গতি মদনা জুবতী
দখিন দুআরে উপনীত।
সুন বীর হনুমান ঘুচাঅ কপাট খান
দুআর মুক্ত করিব তুরিত ॥৪
সুনিআ রাজার রাণী ঘুচাল কপাট খানি
দুআর মুক্ত করিল চন্দনে।
মদনা জুবতী ভেটিতে জুগপতি
চলিলেন গতিগনে ॥...
সুনিআ রাজার রাণী ঘুচাল কপাট খানি
দুআর মুক্ত করিল রাজন।
দিআ রাজা গঙ্গার জল পবিত্র করিল থল
ভেটিবারে দেব নিরঞ্জন ॥[১০৩]

ধর্মপূজায় কৃত্য হিসেবে হরিশ্চন্দ্রের পালা পরিবেশিত হত।[১০৪] তবে, কোনো কোনো গবেষক মনে করেন যে, হরিশ্চন্দ্রের কাহিনিটিই *ধর্মমঙ্গলের* মূল উপজীব্য। পরবর্তী সময়ে লাউসেনের কাহিনিটি নায়ক হিসেবে *ধর্মমঙ্গলের* সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। 'হরিশ্চন্দ্র পৌরাণিক ব্যক্তি' এবং তার পুত্র 'লুহিচন্দ্র' হচ্ছেন 'পৌরাণিক রোহিতাশ্ব'। নাট্যগবেষক সেলিম আল দীনের মতে–*ধর্মমঙ্গলের* বিভিন্ন কাহিনির মধ্যে হরিশ্চন্দ্রের কাহিনি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। আর এ কাহিনি *ধর্মমঙ্গলের* অন্তর্গত হলেও, তা কাব্যে গৃহীত হবার পূর্বে স্বতন্ত্র পালারূপে প্রচলিত ছিল।[১০৫]

বাংলা নাট্যের আবহমান কালের রীতি অর্থাৎ গায়েন-দোহার রীতিতে *ধর্মমঙ্গল* বা *শূন্যপুরাণ*-এর কাহিনি পরিবেশিত হত। এতে সাধারণত একজন মূলগায়ক এবং ধুয়া ও যন্ত্রসঙ্গতের জন্য থাকতেন দু-চারজন দোহার-বাদ্যকর। নৃত্যে তাল ও ঝঙ্কার সৃজনে গায়ক পায়ে ঘুঙুর ব্যবহার করতেন। ধর্মের আশীর্বাদ ও আরোগ্য দানের প্রতীক হিসেবে গায়ক হাতে 'চামর' ধরে রাখতেন। মূলগায়ক নৃত্য ও 'অঙ্গভঙ্গি সহকারে' *ধর্মমঙ্গলের* 'আখ্যানমূলক পদগুলি' পরিবেশন করতেন।[১০৬]

শূন্যপুরাণ-এর সময়েই মুসলমান দরবেশদের চরিত্র ও তাঁদের আধ্যাত্মিক পরিচয় প্রকাশক এক ধরনের কাব্য প্রচলিত হয়। এই ধারায় রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি হলায়ূধ মিশ্র রচনা করেন *সেখ শুভোদয়া*। এটি বাংলা ভাষায় পির মাহাত্ম্যমূলক রচনার আদি নিদর্শন। এই গ্রন্থে শেখ জালালুদ্দিন তাবরিজির অলৌকিক মহিমা প্রকাশ করা হয়েছে।

সেলিম আল দীনের মতে, *সেখ শুভোদয়া* ষোড়শ শতকের আগের রচনা নয়। তবে, এতে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতির যথেষ্ট পরিচয় বিধৃত হয়েছে। কাব্যটি আরব্য ও পারস্য-রোমান্সের ধারার মিশেলে রচিত হলেও তাতে সোমদেব রচিত *কথাসরিৎসাগর*-এর গল্প-কথনরীতি অধিক অনুসৃত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সেখ শুভোদয়ায় কথকতা-ঢঙে বক্তা ও শ্রোতার সুস্পষ্ট ভূমিকা রয়েছে।[১০৭] এই গ্রন্থটি মূলত ইহলৌকিক কল্যাণ ও বিঘ্ন-বিদূরণ করার জন্য কল্যাণের নিমিত্তে রচিত। এর 'প্রাদুর্ভাব' নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে–লোকসভাতে সেখের চরিত্র সম্যক শ্রবণ করলে বিঘ্ন ও চোরের ভয় সেখানে থাকে না। 'লোকসভা' হচ্ছে শ্রোতা-দর্শক, সুতরাং বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের আসরের সামগ্রী রূপেই *সেখ শুভোদয়া* প্রথম থেকে গৃহীত হয়েছিল।[১০৮]

পাঁচ

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ইতিহাস বহু রূপে ও বহু দিকে সম্প্রসারিত। সুকুমার সেন বাংলাদেশের সাহিত্যে ও লোকসমাজে চর্চিত বিচিত্র নাট্যরীতিকে মুখ্যত চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন, যথা–১.সংগীত-নাটক, ২.চিত্রগীত, ৩.অঙ্কিয় অর্থাৎ স্বাঙ্গ অভিনয় এবং ৪.পাত্র-নৃত্য (পাতা নাচ)।[১০৯] এর মধ্যে 'সংগীত-নাটক' থেকে উদ্ভূত হয়েছে বাংলার প্রধান দু'টি নাট্যরীতি, যথা–ক. পাঁচালি বা পাঞ্চালিকা-আখ্যায়িকা ও খ. পদাবলি-কীর্তন।

'সংগীত-নাটক' মূলত গত সহস্রাব্দের গোড়ার কয়েক শতাব্দীতে পৌর-সাহিত্যে, অর্থাৎ রাজসভাপুষ্ট পরিকাঠামো অনুসরণ করে পূর্বভারতে তথা বাংলাদেশে আবির্ভূত হয়। সংস্কৃত নাটকের তুলনায় এগুলি খুব ছোটো রচনা। ভাষা সংস্কৃত, সংস্কৃতের মতোই নান্দী প্রস্তাবনা অঙ্ক-বিভাগ লক্ষ করা গেলেও এই নাট্যরীতির প্রধান অঙ্গ হচ্ছে গান। আর গানগুলি সাধারণত কথ্যভাষায় লেখা। এই গানগুলিই নাট্যের প্রাণ। নাটকের গল্প ও রস পুরাপুরি এই গানগুলিই যোগান দিয়েছে। এ যেন *গীতগোবিন্দ*-এর মতো নাট্যগীতিকে সংস্কৃত নাটকের ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেওয়া। তীরহুতের ও নেপালের রাজসভায় এই ধরনের 'সংগীত-নাটক' বিকাশ লাভ করেছিল। সংগীত-নাটকের সবচেয়ে পুরানো এবং ভালো উদাহরণ হল–চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদে মিথিলার রাজমন্ত্রী উমাপতি ওঝার *পারিজাতহরণ*। বিদ্যাপতিও এই ধরনের সঙ্গীত-নাটক দু'একটি লিখেছিলেন। বাংলাদেশে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে কবিরাজ গোবিন্দদাস একটি সংগীত-নাটক লিখেছিলেন। সে নাট্যবীজ গানগুলি রয়ে গেছে কীর্তন-পদাবলি হয়ে, নাটক-শাঁস বিলুপ্ত। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম অথবা দ্বিতীয় দশকে চৈতন্যের সুহৃদভক্ত রামানন্দ রায় যে সংগীত-নাটকটি লিখেছিলেন তার গানগুলি শুদ্ধ সংস্কৃতে রচিত, *গীতগোবিন্দের* ছাঁদে। উমাপতি, গোবিন্দদাস ও রামানন্দ রায় তিনজনেরই নাটকের বিষয় কৃষ্ণলীলা। তবে, বিদ্যাপতির যে নিতান্ত ক্ষুদ্র সংগীত-নাটকের পুঁথি পাওয়া গেছে, তার বিষয় হল *মীনচৈতন্য-গোরক্ষবিজয়*।[১১০]

সুকুমার সেনকৃত শ্রেণিকরণের দ্বিতীয় পর্যায়ে আসে 'চিত্রগীত' রীতির কথা। এ রীতি পাঞ্চালিকা-আখ্যায়িকা ও পদাবলি-কীর্তনের মাঝামাঝি। এখানে পুতুল অথবা প্রতিমার বদলে থাকতে চিত্রপট (পূর্বতন যমপট)। চিত্র দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে পাত্রপাত্রীর জবানিতে গান চলত। এই রচনার পুরোনো ও দুর্লভ নিদর্শন *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*। শ্রীচৈতন্য প্রথমবার বৃন্দাবন যাত্রায় উদ্যোগের কালে গৌড়ে রামকেলি গ্রামের সন্নিকটে 'কানাইর নাটশালে' এই ধরনের ছবি (অথবা পুতুল) সহযোগে কৃষ্ণলীলার পরিবেশন দেখেছিলেন।[১১১]

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পর্যায়ে আসে 'অঙ্কিয়' বা 'স্বাঙ্গ অভিনয়'-রীতি। উল্লেখ্য, এই ধরনের অভিনয়ের নিদর্শনে পেয়েছি শ্রীচৈতন্যের উদ্যোগে। বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্যভাগবতে* অঙ্কিয় নাট্যরীতির ('অঙ্কের বন্ধনে নৃত্য') অভিনয়ের বর্ণনা আছে। চৈতন্য সমসাময়িক এমন নাট্য-অভিনয়ের বর্ণনা আর কোথাও নেই। চৈতন্য যখন গৃহাশ্রমে ছিলেন তখন একদিন তাঁর মেসো চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে রীতিমত আয়োজন করে কৃষ্ণলীলা অভিনয় করেছিলেন। অভিনয়ের তোড়জোড় ভালোই হয়েছিল, কিন্তু এমন সুখের নাটক বা যাত্রা যা-ই হোক না কেন তার অভিনয় শেষ হবার আগেই চৈতন্যের হৃদয়ে ভাবের প্লাবন আসে। তাতে প্লট যায় গুলিয়ে, অভিনয়ও সম্পূর্ণ হতে পারে নি। যতটুকু হয়েছিল তার বিবরণ বৃন্দাবনদাস দিয়ে গেছেন। আমাদের কাছে সেইটুকুই বহু মূল্য। আধুনিক কাল পর্যন্ত এই নাট্যরীতির প্রচলন বহুভাবেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমান রয়েছে।[১১২]

সুকুমার সেনকৃত শ্রেণিকরণের চতুর্থ পর্যায়ে আসে 'পাত্র-নৃত্য' বা পাতা নাচের পরিবেশনরীতি। এটা প্রাচীন শোভিক-রীতি। ধর্মঠাকুরের বিশিষ্ট চরিত্রের মুখোশ পরে এই রীতিতে নাচের প্রচলন শুরু হয়। এখনও বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে শিবের গাজনে, চৈত্র-সংক্রান্তির বিভিন্ন আয়োজনে ও অনুরূপ অনুষ্ঠানে এ রীতির 'নৃত্য' প্রচলিত।[১১৩]

ছয়

ষোড়শ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশে যে নাটপালার অত্যাধিক জনপ্রিয়তা তৈরি হয়, তা হচ্ছে—'মঙ্গলকাব্য'। নাটপালাগুলিতে উল্লেখিত 'দিবস' এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। মঙ্গলকাব্যের 'পালা'র মতো এক একটি বিষয় এক এক দিবসে মঞ্চে পরিবেশিত হত। তবে. মঙ্গলকাব্যগুলি যেমন আট পালা বা বারো পালায় বিভক্ত হয়ে নৃত্য-গীত সহযোগে অভিনীত হত। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় হচ্ছে—লোকায়ত বাংলার সর্পদেবী মনসার আখ্যান। উল্লেখ্য, খ্রিষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকের পূর্বেই এদেশে মনসাপূজার প্রচলন ঘটেছিল। কিছু কিছু 'পুরাতাত্ত্বিক' আবিষ্কার থেকে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বাংলাদেশ ও সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে 'অসংখ্য, মনসামূর্তি' প্রাপ্ত 'উৎকীর্ণ লিপি' দৃষ্টে অনুমান করা যায় যে, এর কালও পূর্বোক্ত শতাব্দী। এই উৎকীর্ণ লিপিতে রাজা বিজয় সেনের নাম লভ্য।

বাংলাদেশে মনসার ব্রতকথারূপে এমন কিছু কাহিনি প্রচলিত রয়েছে, যার সঙ্গে প্রচলিত *মনসামঙ্গল* কাব্যে বিবৃত আখ্যানের কোনো সাদৃশ্য পাওয়া যায় না।

বিষহরি ও চণ্ডীপূজা উদ্ভবের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়—চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অথবা তারও আগে এই দুই লৌকিক দেবীর পূজা প্রচলিত হয়েছিল। বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্যভাগবতে* আছে :

ধর্ম কর্ম লোকসব এইমাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে ॥

Dhaka University Institutional Repository

দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরী।
তাহা সে পূজেন সেও মহাদম্ভ করি ॥

খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী শেষ হবার আগেই *মনসামঙ্গলের* কাহিনি 'পরিপূর্ণ পাঞ্চালীর' অবয়ব পেয়েছিল। শুধু মনসা বা চণ্ডী দেবতার পূজাও চৈতন্য-পূর্বকালে প্রচলিত ছিল। এ প্রসঙ্গে *মনসামঙ্গলের* প্রাচীনতম পাঁচালি গীতের রচয়িতা কানা হরিদত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। বিজয়গুপ্তের *মনসামঙ্গলে* এই পাঁচালিকারের নাম পাওয়া যায় :

প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত।
মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য ॥

এ উক্তি থেকে ধারণা করা যায়–কানা হরিদত্ত মৌখিকরীতিতে পাঁচালি রচনা করেছিলেন। এছাড়া, পাঁচালি অর্থে গীত ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পংক্তিদ্বয়ে মিলছে। কানা হরিদত্তের আবির্ভাবকাল খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিক। বিজয় গুপ্তের বর্ণনাতে কানা হরিদত্তের গীত পরিবেশনরীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেলেও তা বিলুপ্ত হবার কথাও জানা যায়।[১১৪]

গেয়কাব্য হিসেবে পাঁচালি শুধু নিরালম্ব মৌখিকরীতির নাট্য ছিল না, তা একইসঙ্গে উচ্চকোটির মানুষের লেখ্যকাব্যেরও রীতি ছিল। সাধারণ গ্রামীণ আসর থেকে রাজদরবারের সম্ভ্রান্ত আসর পর্যন্ত এর প্রভাব বিস্তৃত ছিল। আসলে, মধ্যযুগে একমাত্র পাঁচালি-রীতিই সুবিস্তৃতরূপে অনুসৃত হয়েছিল। কারণ, বাংলার মানুষের শিল্পরসের পিপাসায় সহস্র বছর ধরে অদ্বৈত রুচিই প্রবল। পাঁচালিতে তারই সংশ্লেষণ ঘটেছে। পাঁচালি–একই সঙ্গে কাব্য, আখ্যান, নৃত্যগীত এবং অভিনয়ের দ্বৈতাদ্বৈত শিল্পরূপ।[১১৫]

রামায়ণ ও *মহাভারত*-এর পরিবেশন পাঁচালির পরিবেশনরীতিতে মধ্যযুগের বাংলায় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এর অবশ্য একটা পূর্ব প্রেক্ষাপট বাংলার জনসমাজে আগেই প্রস্তুত ছিল। কেননা, সংস্কৃত মহাকাব্য *রামায়ণ* ও *মহাভারত*-এর নানা আখ্যানের সঙ্গে প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার মানুষের পরিচয় ছিল। তবে, বাংলায় মহাভারত ধর্মশাস্ত্র হিসেবে পাঠ্য এবং সচরাচর তা কথকতা-রীতিতে পরিবেশিত হয়ে থাকলেও *রামায়ণ* প্রথম থেকেই নৃত্যগীতের মাধ্যমে পাঁচালি আকারে অভিনীত হত। আদর্শগতভাবে বাঙালি মানসে *মহাভারত*-এর চেয়ে *রামায়ণ*-এর প্রভাব গভীরতর। সমগ্র *রামায়ণে* বিবৃত গার্হস্থ্য জীবনের চিরায়ত সম্পর্কের মধ্যে লোভ-কুটিলতার দ্বন্দ্ব, রাজ্য ও রাজত্বের জটিলতায় সংঘটিত অমোচ্য ও বিয়োগান্ত পরিণাম বাঙালির চিত্তভূমি সহজেই অধিকার করতে পেরেছিল।[১১৬]

রামায়ণের আখ্যানের প্রতি প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার মানুষের মনে ও প্রাণে যে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল, তা প্রথমবারের মতো পূর্ণাঙ্গ কাব্যরূপে গ্রন্থন করেন বাঙালি কবি কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাস রচিত *রামায়ণ* মূলত *শ্রীরাম পাঁচালী*, সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, কৃত্তিবাসের *রামায়ণ* আক্ষরিক অর্থে 'সংস্কৃত রামায়ণে'র অনুবাদ নয়। এ কাব্যে 'তরণীসেন বধ', 'মহীরাবণ অহিরাবণ বধ' প্রভৃতি আখ্যান কবির নিজস্ব সংযোজন। এ কাহিনিগুলো কতদূর করিব স্বীয় উদ্ভাবনা অথবা তা পূর্ব থেকে

Dhaka University Institutional Repository

লোককথা রূপে প্রচলিত ছিল কিনা সে কথা বিচার করা কঠিন। *রামায়ণে*র কাহিনি সম্পূর্ণ আর্যদের নয়। আর্যদের ভারতবর্ষে প্রবেশের বহু পূর্ব থেকে 'অনার্যজাতিসমূহের মধ্যে' *রামায়ণে*র কাহিনি প্রচলিত ছিল।[১১৭] এই অভিমত বিবেচনায় বলা যায়–'শ্রীরাম পাঁচালী'র যে সকল আখ্যান কৃত্তিবাসের নিজস্ব কিংবা পরবর্তীকালের গায়েনদের দ্বারা সংযোজন, পূর্ব থেকেই সেগুলোর মধ্যে কোনো কোনো প্রসঙ্গ লোককথা রূপে প্রচলিত ছিল।

কৃত্তিবাসের *রামায়ণ*-এর পরিবেশন-রীতি সম্পর্কে সেলিম আল দীন বলেন–"কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' পূর্বাপর জনপ্রিয় ও আসরকেন্দ্রিক গেয়কাব্য। এইজন্য 'গায়ক-কথক-লিপিকররা' মূল আখ্যানের সঙ্গে নিজেদের কাহিনি কোথাও কোথাও যুক্ত করেছেন। এর ফলে বাঙলা রামায়ণে নানা কালের ভাষা, উপাখ্যান, জনরুচি ও ধর্ম-চেতনার প্রভাব বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সমগ্র রামায়ণে রামভক্তিবাদের উচ্ছ্বাস শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব জাত। অন্যদিকে বাঙলা মঙ্গলকাব্যের প্রভাবও রামায়ণে দৃষ্ট হয়। বিশেষজ্ঞের মতে *মনসামঙ্গলে* ধৃত শঙ্কর 'গারড়ী'র উপাখ্যান অবলম্বনেই পরবর্তীকালে রামায়ণে হনুমান কর্তৃক রাবণ বধ নিমিত্তে 'মৃত্যুবাণ' সংগ্রহের কাহিনি তৈরি হয়েছে।"[১১৮] নানা কালের নানা বিষয় সংযোজনে কৃত্তিবাসের *রামায়ণ* এভাবেই সকল কালের নিজস্ব রুচির ধারক-বাহক হয়ে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে সমাদৃত হয়ে আছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, *রামায়ণ* গেয়-পাঁচালিকাব্য হিসেবে নৃত্য-গীতের মাধ্যমে আসরে পরিবেশিত হত, সেদিক দিয়ে *রামায়ণ-গান* পরিবেশনের সঙ্গে একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের যোগ অদ্যাবধি রয়ে গেছে; আর *মহাভারত* পাঁচালি পাঠের সঙ্গে তেমন কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের যোগ ছিল না।[১১৯] সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশের মৈতৈ মণিপুরী সম্প্রদায় রাসপূর্ণিমার তিথিতে জগন্নাথ মন্দির প্রাঙ্গণে কৃত্যানুষ্ঠানের অংশ হিসেবে কাশীদাসী মহাভারত পাঠ করে থাকেন।[১২০] পাশাপাশি সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার জগন্নাথ মন্দিরে বাঙালিরাও কাশীদাসী মহাভারত পাঠ করেন বলে জানা যায়।[১২১]

রাজসভায় পুরাণ-পাঠ বাংলার প্রাচীন রীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এক্ষেত্রে পুরাণ বলতে প্রধানত *মহাভারত*-কেই বোঝানো হত। পালবংশের অন্যতম শেষ রাজা মদনপাল বৌদ্ধ হলেও তাঁর মহিষী চিত্রমাতিকা প্রায় নিয়মিত *মহাভারত* পাঠ শুনতেন। এদিক দিয়ে রাজসভায় পুরাণ-পাঠকারীদের পাঠক, ব্যাস (প্রচারক) ইত্যাদি পদবী দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বাংলায় প্রথম *মহাভারত*-কাহিনি রচিত হয়েছিল সভাকবির দ্বারা এক মুসলমান সেনাপতি শাসনকর্তার অভিপ্রায়ে।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস হলেন বাংলায় প্রথম *মহাভারত*-কাহিনির রচয়িতা। তাঁর রচিত কাব্যকে *পরাগলী মহাভারত কথা* (১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দ) বলা হয়। তবে, তাঁর রচিত *মহাভারত*-কাহিনির নাম হচ্ছে *পাণ্ডবিজয়* বা *ভারত কথা*। *মহাভারত*-কাহিনি রচনার ইতিহাস সম্পর্কে কবি জানিয়েছেন যে :

শ্রীযুত পরাগল খান মহামতি
পঞ্চম গৌড়েত যার বিখ্যাত খেয়াতি।

Dhaka University Institutional Repository

নৃপতি হুষন সাহা গৌড়ের ঈশ্বর
তার এক সেনাপতি হয়ন্ত লস্কর।...
পুত্রে পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি
পুরাণ শুনন্ত নিত্য হরষিত মতি।
সংস্কৃত মহাশ্লোক অতিগুরুতর...
কুতূহল বহুল ভারত-কথা শুনি
কেমতে পাণ্ডবে হারাইল রাজ্য খানি।
বনবাসে বঞ্চিলেক দ্বাদশ বৎসর।
কোন কোন কর্ম কৈল বনের ভিতর...
কেমতে পৌরসে পাইল নিজ বসুমতী।
এহি সব কথা কহ সংক্ষেপ করিয়া।
দিনেক শুনিতে পারি পাঁচালি বলিয়া।[১২২]

অর্থাৎ, 'দিনেক' (পাঠান্তর 'একদিনে') কথাটি থেকে এরূপ অনুমিত হয়েছে যে, *মহাভারতে*র মতো সুবিশাল কাব্য একদিনে পরিবেশন করা সম্ভব নয়, কাজেই একদিনে 'যদি অল্প দিনে' এই অর্থ বহন না করে তাহলে মূলে 'পরমেশ্বরের কাব্য আকারে অনেক ছোট ছিল'।

ভারত-কথা তথা *মহাভারত*-কাহিনি সম্পর্কে পরাগল খাঁ বেশ কৌতূহলী ছিলেন। কারণ, যুদ্ধকথা ও কূটনীতি সমগ্র *মহাভারত*-কাহিনির প্রধান বিষয়বস্তু। একজন সেনাপতি হিসেবে পরাগল খাঁর সে সকল বিষয়ের প্রতি আগ্রহ থাকা অতিশয় স্বাভাবিক। *মহাভারতে* পাঁচালির 'ছাপ' লক্ষ করা যায়। কিন্তু পাঠ্য কাব্য হিসেবে তার প্রসিদ্ধি অধিক ছিল বলে মনে করা হয়। বাংলায় *মহাভারত-কথা*র আদি রচয়িতা কবীন্দ্র পরমেশ্বরের সাক্ষ্যমতে, সেনাপতি পরাগল খাঁ স্বয়ং পাঁচালিরূপে *মহাভারত* (দিনেক শুনিতে পারি পাঁচালি বলিয়া) শ্রবণেচ্ছুক। তাঁর পক্ষে নিরাবলম্ব পাঠরীতি অপেক্ষা পাঁচালির ক্রীড়াশীল অভিনয়-রীতিতেই *মহাভারত*-কাহিনি উপভোগ করার ইচ্ছা থাকা যুক্তিযুক্ত। কেননা, সেনাপতির সভায় *পাণ্ডববিজয়* শুধু ধর্মকথা শ্রবণ নয়, তা পৌরাণিক যুদ্ধকাব্যের পূর্ণাঙ্গ রসাস্বাদনই স্বাভাবিক।[১২৩]

মহাভারত-কাহিনির গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করে বাংলার অন্যান্য কবিদের মধ্যে শ্রীকরনন্দী, সঞ্জয়, নিত্যানন্দ ঘোষ, কাশীরাম দাস প্রমুখ ভিন্ন ভিন্নভাবে একই বিষয়ে পাঁচালি ও কাব্য রচনা করেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় *মহাভারত*-কাহিনি আশ্রিত সেই সব পাঁচালি ও কাব্য কমবেশি আসরের সামগ্রী হিসেবে অভিনীত যেমন হয়েছে, তেমনি পঠিতও হয়েছে, যার ধারাবাহিকতা অদ্যাবধি বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে প্রচলিত।[১২৪]

Dhaka University Institutional Repository

সাত

খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে বাংলায় কৃত্য ও ধর্মীয় আখ্যানমূলক পাঁচালি-রীতিতে ধর্ম-কাহিনির বাইরে প্রণয়মূলক পাঁচালির উদ্ভব ঘটে। এ পর্যায়ে লোককথা, উপকথা, পুরাণ বা বাস্তব জীবনের চরিত্র নিয়ে প্রণয়মূলক আখ্যান ঐতিহ্যবাহী পাঁচালি-নাট্যরীতিতে পরিবেশিত হতে শুরু করে। সেলিম আল দীনের মতে, কৃত্যপাঁচালি-গায়েনের নৃত্যগীতাভিনয়ের অংশই প্রণয়কাব্যের পরিবেশনে গৃহীত হয়। পাঁচালির আঙ্গিকগত লক্ষণ যে সকল উপাদান, যেমন—বন্দনা, ধুয়া, পয়ার, লাচাড়ি ইত্যাদি এ শ্রেণির প্রণয়কাব্যে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।[১২৫]

কৃত্যপাঁচালির মতো এ ধরনের প্রণয়মূলক পাঁচালির পদশীর্ষে রাগরাগিণীর নির্দেশ লক্ষ করা যায়। উপরন্তু বাংলায় প্রচলিত মঙ্গলকাব্যসমূহ বা অন্যবিধ পরিবেশনমূলক কাব্যের আঙ্গিকের সঙ্গে এর সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করা যায়। তবে, প্রণয়কাব্যের পুরাতন বাংলার ধর্মতান্ত্রিক দৈবচেতনার পরিবর্তে এমন এক নবতর কাহিনির আস্বাদ সংযুক্ত করেন যাতে দৈব নির্ভর ভক্ত-পূজারির স্থানে মানবিক প্রেমের অভিসারী রক্ত-মাংসের মানুষ।[১২৬] মানুষের একান্ত জীবনের আখ্যান হিসেবে এ রকম প্রণয়োপাখ্যানের জনপ্রিয়তা লোকায়ত বাংলার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে আপ্লুত করে তোলে।

বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত কিচ্ছাগানের আসরে 'সয়ফুলমলুক-বদিউজ্জামাল', 'লাইলী-মজনু'র চিরায়ত প্রণয়োখ্যানের পাশাপাশি স্থানীয় উপকথা বা লোককাহিনির আশ্রয়ে গাঁথা 'অতুলাসুন্দরী কাকাধরের খেলা', 'মহুয়া', 'মলুয়া', 'দেওয়ানা মদিনা'র কাহিনি অদ্যাবধি অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে অভিনীত হয়ে চলেছে।[১২৭]

আট

সপ্তদশ শতকের বাংলাদেশে নাথ-নাট্যরীতি বিকাশ লাভ করে। নাথপন্থা মূলত বাংলার লোকায়ত বৌদ্ধধর্ম থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সেই সূত্রে নাথ-নাট্যরীতিরও একটি প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে। আসলে, প্রাচীনকালে নাথপন্থী সাধকগণ তাদের দেহ-সাধনা বা যোগ-সাধনার কথা পদ্য আকারে মুখে মুখে রচনা করে আসরে পরিবেশন করতেন। এই প্রক্রিয়াতেই পরবর্তীকালে নাথগীতিকা ও নাথ-নাট্যরীতির উদ্ভব ঘটে।

কবি শুকুর মাহমুদ সপ্তদশ শতকে নাথগীতিকার একটি প্রাচীন কাব্য *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস* এবং শেখ ফয়জুল্লাহ অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে *গোরক্ষবিজয়* রচনা করেন। এই সকল কাব্য-গীতিকা পাঠে জানা যায়—নাথসম্প্রদায়ের ধর্মচর্চার সঙ্গে নৃত্য-বাদ্য ও নাট্যের গভীর সম্পর্ক ছিল। আনুমানিক ১৭০৫ খ্রিষ্টাব্দে রচিত *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাসে* একথার প্রমাণ রয়েছে।[১২৮]

ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্যের কুশীলব হিসেবে নটী, নৃত্য, বাদ্যের প্রসঙ্গ পাওয়া যায় *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাসের* কাহিনিতে। এই কাব্যের কাহিনি থেকে স্পষ্ট ধারণা করা চলে যে, সেকালের লোকসমাজে গীত ও নৃত্যধর্মী ঐতিহ্যবাহী নাট্যরীতি প্রচলিত ছিল। এছাড়া, *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস*-এর সংলাপাত্মক অংশ নাট্যমূলক

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশনে সংলাপাত্মক অভিনয়রীতির পরিচয় প্রদান করে। যেমন, এই কাব্যের 'গুরু-শিষ্য ছওয়াল-জবাব' অংশে নাটকীয় সংলাপ প্রত্যক্ষ করা যায়, যথা :

পুছারি শিষ্য অর্থাৎ শিষ্যের প্রশ্ন :

আকাশের মধ্যে গুরু কোথাএ বৈসে চন্দ্র।
পুষ্পমধ্যে গুরু কোথাএ বৈসে গন্ধ ॥
দধি দুগ্ধ মধ্যে গুরু কোথাএ বৈসে ঘিউ।
শরীরের মধ্যে গুরু কোথায় বৈসে জীউ ॥

গুরুর উপদেশ :

আকাশের মধ্যে বাছা গগনে বৈসে চন্দ্র।
পুষ্প মধ্যে বাছা নাসিকাতে বৈসে গন্ধ ॥
দধি দুগ্ধ মধ্যে বাছা মথনে বৈসে ঘিউ।
শরীরের মধ্যে বাছা প্রতি লোমে জিউ ॥

পুছারি শিষ্য :

আকাশ না ছিল যখন কোথা ছিল চন্দ্র।
পুষ্প না ছিল যখন কোথা ছিল গন্ধ ॥
দধি দুগ্ধ না ছিল যখন কোথা ছিল ঘিউ।
শরীর না ছিল যখন কোথা ছিল জীউ ॥

গুরুর কথা :

আকাশ না ছিল যখন ললাটে ছিল চন্দ্র।
পুষ্প না ছিল তখন মৃত্তিকাতে ছিল গন্ধ ॥
দধি দুগ্ধ না ছিল তখন তৃণত ছিল ঘিউ।
শরীর না ছিল তখন জ্যোতেৎ ছিল জিউ ॥

পুছারি শিষ্য :

নিশিনিশি নিদ্রা গুরু দিশিদিশি বাই।
কোথা হইতে নিদ্রা আইসে কোথা হইতে যাই ॥
গুরু পরম ব্রহ্মা পুছি তোমারে ॥
কোথা হইতে নিদ্রা গুরু চাপিয়া আইসা ধরে ॥[১২৯]

এ ধরনের সংলাপাত্মক অংশ প্রমাণ করে যে, *গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস*-এর নাট্যমূলক পরিবেশনে সংলাপ ব্যবহৃত হত।

নাথ-নাট্যরীতির পরিচয়বাহী অপর গ্রন্থ হল–*গোরক্ষবিজয়*। এই কাব্যের কবি এর কেন্দ্রীয় চরিত্র গোরক্ষনাথকে একজন নাটগীত সিদ্ধ পুরুষ রূপে চিত্রিত করেছেন। প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যরীতি 'বুদ্ধ নাটকে' সঙ্গীত ও নৃত্যের যে যুগল সম্মিলন আছে শেখ ফয়জুল্লাহ রচিত *গোরক্ষবিজয়ে* তারই ধারাবাহিকতার সন্ধান পাওয়া যায় :

নাচেন্ত গোর্খনাথ তালে করি ভর।
মাটিতে না লাগে পদ আলগ উপর ॥
নাচেন্ত যে গোর্খনাথ ঘাঘরীর রোলে।
কায় সাধ কায় সাধ মাদল হেন বোলে ॥
হাতের ঠমকে নাচে পদ নাহি লড়ে।
গগণ মণ্ডলে যেন বিজুলী সঞ্চরে ॥

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কালে চর্চিত ঐতিহ্যবাহী নাট্যের অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকায় পুরুষ কুশীলবগণ নারীর রূপসজ্জা গ্রহণের মাধ্যমে অভিনয় উপস্থাপন করেন। *গোরক্ষবিজয়ে* তা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। গোরক্ষনাথের 'ঘাঘরী'র সজ্জা থেকে ধারণা করা যায় সেকালের কোনো কোনো 'নাট্যে' এ ধরনের পোশাকের প্রচলন ছিল। ঘাঘরী রাজপুতনার রমণীদের পোশাক। 'ঘাঘরীর রোলে' কথাটা থেকে বোঝা যায়, নৃত্যকালে এই পোশাক থেকে কিঙ্কিণীর ধ্বনি উত্থিত হত। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে অনদ্ধ শ্রেণীর বাদ্য মাদল ব্যবহৃত হত। বাংলাদেশের আদিবাসী সমাজে এখনও এই বাদ্যের প্রচলন রয়েছে। *গোরক্ষবিজয়ে* মাদলের বোল পৌনঃপুনিক 'কায়সাধ' নিনাদিত হওয়ার কথা রয়েছে। অতএব, মাদলের সঙ্গে নাথপন্থীদের কায়া-সাধনার সম্পর্ক প্রমাণিত হয়। মীননাথ মাদলের 'গুরু' নাদে বিস্ময়াবিষ্ট :

মাদলের তাল শুনি ভোলে মীন রায়ে।
মাদলের রাএ কেন গুরু মোরে কহে ॥
নাট কর নাটুয়া তাল বাহ ছলে।
তোহ্মার মাদলে কেন গুরু গুরু বোলে ॥
এক শিষ্য আছে তোর যদি গোরখাই।
আর শিষ্য আছে মোর গাভুর সিদ্ধাই ॥
দুই শিষ্য আছে মোর আহ্মি জানি ভালে।[১৩০]

অভিনয়ের জন্য গোরক্ষনাথ ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন। সেজন্য 'নাট কর' অর্থাৎ নাটক কর কথাটা বলা হচ্ছে। অন্যদিকে সেকালে অভিনয় যদি বৃত্তি হিসেবে চালু না থাকত তবে 'নাটুয়া' এ বৃত্তি বা পেশামূলক কথাটা বলা হত না। নাথ-নাট্যরীতির এই ধারা বাংলাদেশ থেকে এখনও বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। রাজশাহী, নাটোর, জয়পুরহাট ও নওগাঁ জেলার প্রত্যন্ত গ্রামে 'যোগীর গান', 'যোগী পর্ব' বা 'যুগী পর্ব' নামে নাথ-নাট্যরীতি প্রচলিত রয়েছে। বিশেষ ধরনের নৃত্যভঙ্গিতে এই নাট্য অভিনীত হয়ে থাকে, যাতে বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই মাদলের পরিবর্তে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে মৃদঙ্গ বা খোল, মন্দিরা বা করতাল ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

নয়

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যরীতি শুধু বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, সনাতন, ইসলামপন্থীদের সামগ্রী নয়। খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষ পাদে ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টানদের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী নাট্যরীতি অভিনবত্ব সংযোজিত হয়। মূলত বিভিন্ন কারণে যে সকল ব্যক্তি হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন তাদের মধ্যে নবদীক্ষিত খ্রিষ্টান আন্তইন দা রোজারিও অন্যতম। কথিত আছে তিনি খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হবার পূর্বে জনৈক্য হিন্দু রাজার পুত্র ছিলেন। কিন্তু খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণের পর ১৬৭০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে তিনি হিন্দুদের মধ্যে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে খ্রিষ্টধর্মীয় বিভিন্ন বাণী ও আখ্যানকে আশ্রয় করে গান, কথোপকথন ও তর্কবির্তকের মিশ্রণে এক ধরনের পরিবেশনরীতির প্রচলন করেন। যা ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। এখনও তাঁর রচিত *সাধু আন্তনি*-র পালাসহ অন্যান্য পালা ও গানের আসর ভাওয়াল অঞ্চলের কাথলিকদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়।[১৩১] খ্রিষ্টানদের নাট্য পরিবেশনের এই ঐতিহ্য পরবর্তী শতকগুলোতে এদেশে প্রচলিত অন্যান্য ধর্মীয় অ্যাখ্যান ও তার পরিবেশনরীতির সমন্বয়ে বরিশাল, চট্টগ্রাম, মেহেরপুর ইত্যাদি অঞ্চলে সমৃদ্ধ হয়েছে বলে জানা যায়।

বাংলাদেশের খ্রিষ্টীয় ধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত বরিশাল জেলার পাদ্রিশিবপুর ধর্মপল্লিতে 'রামুর পালা' নামে এক ধরনের খ্রিষ্টীয় পদাবলি কীর্তন প্রচলিত আছে। হিন্দু, মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা পরিবেশনের সঙ্গে যেমন গ্রামীণ মানুষের নানাবিধ সংস্কার, বিশ্বাস ইত্যাদি জড়িত রয়েছে তেমনি খ্রিষ্টানদের নাট্যধারার সঙ্গে সংস্কার-বিশ্বাস জড়িত আছে।

বরিশাল অঞ্চলের জনপ্রিয় পরিবেশন 'রামুর পালা'র পথিকৃৎ শিল্পী ও পালাকার রামুয়েল গোমেজের আত্মজ সিস্টার লিলিয়ান এমন একটা ঘটনার কথা জানিয়ে বলেন–তাঁর বাবা পালাকীর্তন করতে বাড়ি থেকে দূরদূরান্তে চলে যেতেন। এ সময় তার মা ছোট সন্তানদের নিয়ে খুবই অসহায় বোধ করতেন। কেননা, তখন যোগাযোগ ব্যবস্থার খারাপ অবস্থার জন্য দীর্ঘদিন তিনি স্বামীর কোনো খোঁজখবর পেতেন না। সিস্টার লিলিয়ানের বাবা তেমনি একবার পালাকীর্তন করতে গেলে তার এক ভাই খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু বাড়িতে কোনো পুরুষ মানুষ না থাকায় তাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। কিছু দিনের মধ্যে বাবা ফিরে এসে সন্তানের মুমূর্ষু অবস্থা দেখে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং চিকিৎসা করে তাকে সে যাত্রায় সুস্থ করে তোলেন। ছেলে সুস্থ হবার পর বাবা রামু সন্তানদের কথা ভেবে কীর্তন ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেন এবং কীর্তন করা বন্ধ করে দিয়ে গৃহের কাজে মন দেন। কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই আকস্মিকভাবে সিস্টার লিলিয়ানের ভাই ডানিয়েল-এর মৃত্যু হয়। সন্তানের মৃত্যুতে বাবা রামু ভীষণ আহত হন এবং সে সময় একদিন তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, এভাবে কীর্তন না করে বাড়ি বসে থাকলে একে একে তার সব সন্তান মারা যাবে। এই স্বপ্নের পর তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন এবং পুনরায় কীর্তন গাইতে শুরু করেন। আমৃত্যু তিনি আর কীর্তন ছাড়েননি।[১৩২]

'রামুর পালা' খ্রিষ্টীয়দের নাট্যপালা হলেও এর রচয়িতা হলেন হিন্দু পুরোহিত কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী। বর্তমান ঝালকাঠি জেলা (তৎকালীন বাকেরগঞ্জ) শহরের উত্তর পূর্বে অবস্থিত সুতালড়ী গ্রামে তাঁর বাড়ি

Dhaka University Institutional Repository

ছিল। কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী কলিকাতায় পড়াশুনা করেছিলেন। তিনি বহু বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। তিনি নিজে কীর্তন রচনা করতেন, সুরারোপ করতেন এবং গাইতেন। জানা যায়, তিনি বহু ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। পাদ্রিশিবপুরের শ্রীমন্ত নদীর পূর্ব পার্শ্বের গ্রাম কৃষ্ণকাঠির হাওলাদার বাড়ির সাথে তাঁর আত্মীয়তা ছিল। হাওলাদার বাড়ি এ অঞ্চলে পাটনিবাড়ি নামেও অনেকের কাছে পরিচিত। এ বাড়িতে তিনি মাঝে মাঝে গানের আসর বসাতেন ও পূজা অর্চনা পরিচালনা করতেন।

তৎকালে কোন পূজা-আরাধনায় উপস্থিত থাকতে খ্রিষ্টানদের তেমন উৎসাহ দেয়া হত না। কিন্তু দিঘির পাড়ের পোস্টমাস্টার বাড়ির স্বর্গীয় ফিলিপ ডি কস্তা; যিনি এ অঞ্চলে পোস্টমাস্টার নামে সুপরিচিত ছিলেন, তাঁকে তাঁর চাকরির জন্য এ অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় থাকতে হত এবং এ সমস্ত পূজা পার্বণে তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করার জন্য তাদের বাড়িতে যেতেন। তখনকার দিনে পূজা-পার্বণ উৎসবে গ্রাম বাংলায় এ ধরনের কীর্তন প্রায় সবখানেই অনুষ্ঠিত হত। ফিলিপ ডি কস্তা এরকম অনেক কীর্তন আসরে যোগদান করতেন। এ সমস্ত দেখতে দেখতে তাঁর মনে একদিন চিন্তা আসে বাংলার সংস্কৃতির এক অন্যতম আকর্ষণ-পদাবলি ও পালাকীর্তনে খ্রিষ্টীয় রূপায়ণ সম্ভব কি-না। এ চিন্তা নিয়ে তিনি একদিন কৃষ্ণকাঠির হাওলাদার বাড়িতে যান। হাওলাদার বাড়িতে তখন কোন এক পূজা উপলক্ষে কীর্তন চলছিল এবং কালীপ্রসন্ন স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে সবাই 'ঠাকুর' বলে ডাকতেন। ফিলিপ ডি কস্তা হাওলাদার বাড়ির উমেশচন্দ্র ও তার ভাইদের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করেন। উমেশচন্দ্র ও তার ভাইয়েরা ছিলেন অত্যন্ত সংস্কৃতিমনা। তাঁরা এ অঞ্চলে কীর্তন, যাত্রা, থিয়েটার ইত্যাদি করে বেড়াতেন। তাঁদের সাথে আলোচনার পর পোস্টমাস্টার ফিলিপ ডি কস্তা কালীপ্রসন্নের কাছে এ ব্যাপারে প্রস্তাব দেন এবং এ নিয়ে আলোচনা করেন। কালীপ্রসন্ন তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান। তিনি খ্রিষ্ট পালা রচনার আগে ভালোভাবে খ্রিষ্টধর্ম তথা যিশুর জীবনী আয়ত্তে আনার জন্যে সর্বপ্রথমে 'স্বর্গদ্বার' নামে একটি ধর্ম পুস্তক সংগ্রহ করেন। পুস্তকখানি তৎকালে ক্যাথলিক ধর্ম শিক্ষার অন্যতম প্রধান পুস্তক রূপে পরিচিত ছিল। তিনি পুস্তকটি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করতে থাকেন। এরমধ্যে ফিলিপ ডি কস্তা পাদ্রিশিবপুরের পশ্চিম গ্রামের শিকদার বাড়ির রবার্ট শিকদারের কাছে বাংলা ভাষার একমাত্র বাইবেল সংগ্রহ করে বাবু কালীপ্রসন্নের হাতে দেন। তিনি (কালীপ্রসন্ন) বাইবেল এবং স্বর্গদ্বার থেকে যিশুর জীবনী আলাদাভাবে নিজস্ব ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন ও গান রচনা করেন। এরপর তিনি দক্ষিণ পাদ্রিশিবপুরের (দক্ষিণপাড়া) পণ্ডিত বাড়ির জার্মান পণ্ডিত জার্মান ডি রোজারিও-এর সাথে আলাপ করেন। জার্মান পণ্ডিত শিক্ষকতা করতেন, তাই তাঁকে 'পণ্ডিত' ডাকা হত। তিনিও সেকালে একজন সংগীত ও কীর্তন রচয়িতা ছিলেন। তিনিও কালীপ্রসন্নকে এ কীর্তনখানা রচনা করতে সহযোগিতা দান করেন। এভাবে 'রামুর পালা' রচিত হয়। এ সমস্ত কাজ ঠিক কোন সময়ে হয়েছে তা এখন সঠিকভাবে কেউ বলতে পারেন না। তবে অনুমান করা হয় যে, ১৯২০ থেকে ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে এসব হয়েছে।

এ সময় র‍্যামুয়েল ফ্রান্সিস গোমেজ (রামু) ছিলেন যুবক। তিনি ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে আঠার বছর বয়সে বিবাহ করেন। তার প্রথমা স্ত্রী কোন সন্তানাদি না রেখে মারা গেলে তিনি দ্বিতীয় বার ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে বিবাহ

Dhaka University Institutional Repository

বন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন থেকে তিনি এই গান গাওয়া শুরু করেন। এক্ষেত্রে অনুমান করা যায়, সম্ভবত ১৯২৫–১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে কীর্তনখানি রচিত হয় এবং গাওয়া শুরু হয়। র‍্যামুয়েল গোমেজ ব্যবসা করতেন। তিনি খুব সংগীত পিপাসু লোক ছিলেন। যেহেতু তখন গির্জায় ল্যাটিন ভাষায় গান গাওয়া হত, তাই তিনি গির্জায় গান পরিবেশন করতে পারতেন না। কিন্তু গ্রাম বাংলার গান তিনি রীতিমত চর্চা করতেন এবং গাইতেন। যার ফলে তিনি হারমোনিয়াম বাজানোর কৌশল আয়ত্ত করে ফেলেন। এ কারণেও আত্মীয়তার টানে ফিলিপ ডি কস্তা র‍্যামুয়েলকে কালীপ্রসন্নের কাছ থেকে এ কীর্তন শিখতে বলেন এবং যুবক রামু এতে সম্মত হয়ে যান। এরপর থেকে তিনি কীর্তন নিয়ে মত্ত হয়ে পড়েন। এ কীর্তন শিক্ষার আসর তাঁর দোকানে বসত এবং এর জন্য যাবতীয় খরচ র‍্যামুয়েল ও ফিলিপ ডি কস্তা বহন করতেন। এ কীর্তন নিয়ে রামুয়েল এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে, তার ব্যবসায় যথেষ্ট ক্ষতি হত। তাই তাঁর বাবা রেগে গিয়ে একবার তার হারমোনিয়ামটি দোকানের পার্শ্ববর্তী কাছারি পুকুরে ফেলে দেন (এখন যেখানে প্রাইমারি স্কুল) চার দিন পর যুবক রামুর কাছারি পুকুরে নিমজ্জিত হারমোনিয়ামটি পুনরুদ্ধার করে। জানা যায়, পিটার ও পল, (যাদের পিউত্তা ও পৌউল্লা বলে ডাকা হত) যুবক দু'ভাই শীতের রাত্রে প্রচুর পরিশ্রম করে উহা পুকুর থেকে উত্তোলন করেছিল।

র‍্যামুয়েল গোমেজ (রামু) একজন দক্ষ ও সুনিপুণ কীর্তনীয়া হওয়ার জন্য প্রথম থেকে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। তিনি কালীপ্রসন্নের পরামর্শে রাত্রে কাছারি পুকুরের গলা-পানিতে নেমে তাঁর কণ্ঠ সাধনা করতেন। রাত্রি বেলা এভাবে কণ্ঠ সাধনার কারণও ছিল। তা হল, দিনের বেলায় কণ্ঠ সাধনা করলে স্থানীয় পল্লিবাসীর টিটকারি ও উপহাস তাঁকে হজম করতে হত। সংগীতে অজ্ঞ সরল পল্লিবাসী এতে পুলকিত হয়ে, না বুঝে কেউ কেউ তাঁকে পাগল বলতেও দ্বিধা করত না। কিন্তু তখন তারা বুঝত না যে, এ ধরনের একাগ্রতা না থাকলে কোন কাজেই সফলতা আসে না। যেহেতু র‍্যামুয়েল গোমেজ ব্যবসায়ী ছিলেন, তাই তাঁকে মাঝে মাঝে এ অঞ্চলের বাবু কালীপ্রসন্নের বাড়িতে যেতে ও গান সাধনা করতে হত। সমস্ত কীর্তনটি শিখতে তাঁর প্রায় এক বছর সময় লেগেছিল।

সর্বপ্রথম যুবক রামু ফিলিপ ডি কস্তার বাড়িতে কীর্তন পরিবেশন করেন। সেখানেই ফিলিপ ডি কস্তা এ কীর্তনখানি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। এরপর থেকে বিভিন্ন সময়ে র‍্যামুয়েল ও কালীপ্রসন্ন কীর্তন পরিবেশন করতেন। বিভিন্ন বাড়ি থেকে তাঁদের নিমন্ত্রণ আসত এবং গ্রামের প্রায় সবাই এ কীর্তন শোনার জন্য উদগ্রীব থাকত। এমনকি স্থানীয় হিন্দু-মুসলমানগণ খ্রিষ্টানদের মধ্যে এ ধরনের গান দেখতে পেয়ে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে যেতেন এবং তারাও কোথাও গানের আসর হলে সেখানে উপস্থিত হতেন।

ফাঃ এফ ফীনো সি এস সি-এর সময় সর্বপ্রথম গির্জা বাড়িতে পরিবেশন করা হয়। (১৯৩০–১৯৩৫ সনের মধ্যবর্তী যে কোন সময়)। কালাদা নামক পাড়ায় পাদ্রিশিবপুরের বাইরে সর্বপ্রথম গান পরিবেশন করা হয়। সেখানকার জর্জি (প্রকৃত নাম জর্জ গোমেজ) রামুর দলকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। তখন এ গান অত্যন্ত জমজমাট হত। একবার স্বর্গীয় বিশপ লারোজ সি,এস,সি পাদ্রিশিবপুর এসে দূর থেকে শুনতে পান, কোন এক বাড়িতে কীর্তন চলছে। গির্জা বাড়িতে না গিয়ে তিনি সেখানে সরাসরি গান শুনতে চলে যান এবং

Dhaka University Institutional Repository

কিছুক্ষণ গান শুনে ফাদার বাড়ি আসেন। ফাঃ রড্রিক্সের সময়কালে এ কীর্তন কম-বেশি গাওয়া হত (১৯৪৫ সনের পরবর্তী কয়েক বছর) তৎকালীন দু'চারজন লোকের সাথে আলাপ করে দেখা যায়, এ গানের ফলে তারা যিশুর জীবনী অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করতে পারতেন এবং তা জীবন বাস্তবতায় ব্যবহার করতেন। অথচ তারা কেউ কেউ একেবারেই অশিক্ষিত। তাই এ থেকে আমরা এ ধরনের গানের আসরকে তৎকালীন খ্রিষ্টীয় সমাজের মৌলিক আসর বলতে পারি।[১৩৩]

বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে কিংবা প্রায়শ্চিত্তকাল উপলক্ষ্যে এখনও 'রামুর পালা'র আসর বসে থাকে। উল্লেখ্য প্রতি বছর সুনির্দিষ্ট একটা সময়ে বাংলাদেশের খ্রিষ্টানরা চল্লিশ দিন উপবাস বা রোজা পালন করে প্রায়শ্চিত্ত পালন করে থাকে। এ সময় দক্ষিণবঙ্গের বরিশাল অঞ্চলের খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠী যিশুকে স্মরণকে রামুর পালার আসর করে থাকে। এছাড়া, স্টার ও বড়দিন উদ্‌যাপনেও রামুর পালা পরিবেশিত হয়ে থাকে। বরিশাল অঞ্চলে প্রচলিত রামুর পালার প্রধান শিল্পী স্বর্গীয় র‍্যামুয়েল গোমেজের সহযোগীদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিটি ছিলেন দক্ষিণ পাদ্রিশিবপুরের কালু ঠাকুর। তিনি রামুর দোকানের মুহুরী ছিলেন এবং প্রথম থেকেই এ গানের 'সরকার'-এর দায়িত্ব পালন করতেন। তারপরের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিটি হলেন উমেশচন্দ্র হাওলাদার। তিনি করতাল বাজাতেন। তার ভাই যোগেস হাওলাদার বাজাতেন মৃদঙ্গ, আরেক ভাই যামিনী হাওলাদার বেহালা বাজাতেন, এরা কৃষ্ণকাঠির হাওলাদার বাড়ি বা পাটনি বাড়ির লোক। দক্ষিণ পাদ্রিশিবপুরের শিকদার বাড়ির পিটার শিকার (গোমেজ), তার ভাই পল শিকার (গোমেজ) আরেক ভাই পিও শিকদার (গোমেজ) প্রায় প্রথম অবস্থা থেকে সাথে ছিলেন। তারাও হারমোনিয়াম, মৃদঙ্গ, করতাল ইত্যাদি বাজাতেন। পশ্চিম পাদ্রিশিবপুরের মিস্ত্রী বাড়ির মারকুস গোমেজ মার্কু হারমোনিয়াম ও বেহালা বাজাতেন। বার্থলেমেয় গোমেজ বার্থ, গানের আসরে থাকতেন জান্টেরের বাড়ির মিলাট গোমেজ পাংখাওয়ালা বাড়ির পিটার গোমেজ, যোসেফ ডি রোজারিও প্রমুখ এসে মাঝে মাঝে গান গাইতেন।

পশ্চিমে ধোপা বাড়ির অশ্বিনী কুমার দাস ও শশীভূষণ দাস প্রথম অবস্থা থেকে রামুর সাথে ছিলেন। দিঘির পাড়ের পিটার গোমেজ মাঝে মাঝে আসতেন তাঁকে চুলওয়ালা পিটার বলে ডাকা হত। গেছপার্ট ডি রোজারীও (আড়াইবেকী) ও আরো অনেকেই রামুর সাথে গান গাইতেন, যাদের নাম এখন সঠিকভাবে কেউ বলতে পারে না।

এদের মধ্যে একমাত্র জীবিত ব্যক্তি কৃষ্ণকাঠির উমেশচন্দ্র হাওলাদার এবং জন ডি কস্তা (পবরী কাউল্লা)-এর কাছ থেকে ফাদার যোসেফ জীবন উপর্যুক্ত তথ্য সংগ্রহ করেন। উমেসচন্দ্র কীর্তন রচনায় প্রথম দিন থেকেই এর সাথে জড়িত থেকে রামুর ডানহাত স্বরূপ কাজ করেছেন। আর জন ডি কস্তা কীর্তন রচনাকাল থেকে রামুর প্রায় মৃত্যু পর্যন্ত মিশনের একজন কর্মচারী এবং তার একনিষ্ঠ সঙ্গী ছিলেন।

র‍্যামুয়েল গোমেজের আমলে পাদ্রিশিবপুরে আরো কয়েকজন গান রচয়িতা ও গায়ক ছিলেন। তাদের নিজস্ব দল ছিল। তাদের গানগুলো এখন বিলুপ্ত প্রায়। কিছু কিছু গান অবশ্য এখনও লোকমুখে প্রচলিত আছে। তাদের কয়েকজন হলেন–১. জার্মান ডি রোজারিও (পণ্ডিত); দিঘির পাড়ের পণ্ডিত বাড়ি, তিনি সাধু

Dhaka University Institutional Repository

আন্তনির পালা, যাকোবের যাত্রাগান ও অনেক প্রার্থনা সঙ্গীত রচনা করেন। রামুর পালা রচনায়ও তিনি সাহায্য করেন; ২. জার্মান গোমেজ (বয়াতী), দক্ষিণ পাদ্রিশিবপুর চরের বাড়ি, তিনি সাধু আন্তনির গান ও প্রার্থনা সঙ্গীত রচনা করতেন ও গাইতেন; ৩. জার্মান ডি রোজারিও, আড়াইবেকিতে বাড়ি, তিনি জারি গাইতেন ও পুঁথি পাঠ করতেন; ৪. কানাই মৃধা (গোমেজ), দেশান্তর কাঠি গ্রামের লোক, তিনি কবি, সারি, টপ্পা ইত্যাদি রচনা করতেন ও গাইতেন; ৫. স্যামুয়েল হাওলাদার (গোমেজ), মাটিভাঙ্গা গ্রামের লোক, তিনি কবি, সারি, টপ্পা ইত্যাদি রচনা করতেন ও গাইতেন। এছাড়াও জন ডি রোজারিও (ডিমু), মোনা ডি কস্তা, ফ্রান্সিস গোমেজ (ফরাইচ্ছা) প্রমুখ ব্যক্তি গান গাইতেন।

স্বর্গীয় র‍্যামুয়েল ফ্রান্সিস গোমেজ রামু ১১ই আগস্ট ১৯৮২ সালে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর যারা কীর্তন পরিবেশনে যারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন তারা হলেন–ডনিমিক গোমেজ, আলবারিচ গোমেজ, এন্টুনি গোমেজ বাবলু, নরবাট গোমেজ মৃধা, আলবার্ট গোমেজ (এরা ছিলেন কীর্তনীয়া); এছাড়াও, ফাদার যোসেফ জীবন, স্বর্গীয় পিও গোমেজ (শিকার), মেলকাম ডি কস্তা, মিডিন ডি রোজারিও, গিলবার্ট গোমেজ প্রমুখ বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। সাম্প্রতিক বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় বসবাসরত পাদ্রিশিবপুরের খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী লোকেরা বিভিন্ন খ্রিষ্টধর্মী কৃত্যাচার স্টার, প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি উপলক্ষে বছরের অন্তত দু'একবার 'রামুর পালা'র আসর করে থাকেন।[১৩৪]

গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ অঞ্চলে খ্রিষ্টীয় নাট্যপালার নানা রীতি প্রচলিত রয়েছে, এর মধ্যে 'সাধু আন্তনির পালা' অত্যন্ত জনপ্রিয় এক প্রকার নাট্যরীতি। বর্তমানে জীবিত শিল্পীর মধ্যে প্রধান জন হচ্ছেন–অরুণ কোড়াইয়া। তাঁর নামেই দলের পরিচয়–অরুণের দল বা পাদুয়া সাধু আন্তনির দল। অরুণ কোড়াইয়া সুদীর্ঘ ২৮ বছর ধরে এই গান পরিবেশন করে আসছেন। তাঁর গুরু প্রয়াত জর্জ গমেজ। এই গান সম্পূর্ণরূপে গুরুপরম্পরার বিদ্যা। শিষ্যের শিক্ষা সমাপান্তে গুরু শিষ্যকে মন্দিরা প্রদান করে গান পরিবেশনের জন্য আশীর্বাদ করেন। এরপর শিষ্য ভিন্নভাবে দল করে এই গান পরিবেশন করে থাকেন। এ ধরনের পালা পরিবেশনের জন্য মূলগায়েনকে ব্যক্তিগত জীবনে আত্মসুদ্ধির চেষ্টার মধ্যে থাকতে হয়। খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকতে হয়। কালীগঞ্জের রাঙামাটিয়াতে ৪টি, নাগরিতে ৩টি, বরিপাড়াতে ১টি এবং তুমিলিয়াতে ৩টি সাধু আন্তনির পালাগানের দল রয়েছে। এছাড়া, রাজশাহী, নাটোর, পাবনা ও ঢাকার সাভার এলাকাতেও বেশ কয়েকটি সাধু আন্তনির পালাগানের দল রয়েছে।[১৩৫]

গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ থানায় বসবাসরত খ্রিষ্টান সমাজে 'বৈঠকী গান' নামে আরেক ধরনের প্রশ্ন-উত্তরমূলক নাট্যমূলক সঙ্গীত ধারার প্রচলন রয়েছে। উক্ত অঞ্চলে এই গানের ঐতিহ্য প্রায় একশত বছরের। খিস্টধর্মাবলম্বী জনসাধারণ রোগমুক্তি, বিপদ থেকে উদ্ধার, সন্তান কামনা ইত্যাদি উপলক্ষে মানতের ভিত্তিতে এই গানের আয়োজন করে থাকেন। বৈঠকী গানের মূলগায়েনকে সরকার এবং সহযোগী গায়েনদেরকে দোহার বলা হয়। এ ধরনের আসরে সরকারগণ সাধারণত বাইবেল, মঙ্গলসমাচার, কৃপাশাস্ত্র ইত্যাদি খ্রিষ্টধর্মীয় গ্রন্থ এবং নিজের গানের খাতা ব্যবহার করে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের বসবাসরত খ্রিষ্টানদের অপর প্রধান অঞ্চল হচ্ছে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা জেলা। এর মধ্যে মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলায় ভবেরপাড়া ও বল্লভপুর গ্রামে দুটি খ্রিষ্টান পল্লি রয়েছে। এই দুটি পল্লির বসতিরা নানা পেশার সঙ্গে জড়িত থাকলেও তারা খ্রিষ্টান ধর্মীয় পালা এবং খ্রিষ্টীয় কীর্তন পরিবেশন করে থাকেন। ভবেরপাড়া গ্রামে বসবাসরত ২৫০-৩০০ ঘর ক্যাথলিক এবং ৬-৭ ঘর প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টানদের বেশির ভাগই পেশাগত জীবনে শ্রমিক এবং কৃষক। সাংস্কৃতিক পরিচয়ে তাদের অনেকেই কম-বেশি গান-বাজনার সঙ্গে যুক্ত। এই অঞ্চলের অন্তত পাঁচটি গানের দল নিয়মিতভাবে খ্রিষ্টীয় কীর্তন ও পালা পরিবেশন করে থাকে। দলগুলো হল–১. বাবুল মণ্ডল কীর্তন দল, এই দলের মূলগায়েন রাজকুমার; ২. গোপাল বিশ্বাস কীর্তন দল, মূলগায়েন সুকেশ মণ্ডল; ৩. শেরাফিন কীর্তন দল; ৪. বাবলু খান কীর্তন দল, মূলগায়েন ঝোটা; ৫. পিটার খান কীর্তন দল, মূলগায়েন সুকচাঁদ দফাদার।

এদের মধ্যে বাবলু খান কীর্তন দলের হারমোনিয়াম বাদক দমু মণ্ডল জানান–তারা সাধারণত মিশনে খ্রিষ্টীয় কীর্তন পরিবেশন করে। কীর্তনের আসরে এই দলটি মানুষের উপকারের জন্য শাস্ত্রপাঠ ও উপদেশ প্রদান করে থাকে। ২ থেকে ৩ ঘণ্টাব্যাপী এই দল শাস্ত্রপাঠ ও উপদেশ সহযোগে কীর্তন পরিবেশন করে। দলের প্রধান বা সরকার এই দলের ধর্মীয় পরিচালক। মূলত তিনিই বয়ান বা উপদেশ প্রদান করেন। চারদিকে বসে ভক্ত-শ্রোতা ও দর্শকগণ সেই উপদেশ শোনেন এবং সব শেষে গায়েনদের পরিবেশিত খ্রিষ্টীয় কীর্তন উপভোগ করেন।

অন্যদিকে মুজিবনগর থানার বল্লভপুর গ্রামে প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ ঘর চার্চ অব বাংলাদেশ সদস্য, ২০০ ঘর ক্যাথলিক এবং ১০ ঘর এজি চার্চ গোত্রের খ্রিষ্টান সদস্য বাস করেন। এদের মধ্যে প্রচলিত খ্রিষ্টীয় কীর্তনের ধারা ভাষা, সুর ও পরিবেশনরীতির বৈশিষ্ট্যে পার্শ্ববর্তী গ্রাম ভবেরপাড়া গ্রাম থেকে সমৃদ্ধ। বল্লভপুর খ্রিষ্টান পল্লির প্রাজ্ঞ গায়েনের নাম সুজিত মণ্ডল (৫৮)। এলাকায় তিনি বিশা নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি জানান, তাঁর গ্রাম বল্লভপুরে খ্রিষ্টীয় পালা ও খ্রিষ্টীয় কীর্তন পরিবেশনের দু'টি দল আছে। একটি তাঁর নিজের সংকীর্তন দল; অন্যটি ঘাটপাড়া কীর্তন দল, যার মূলগায়েন হলেন বাদল মণ্ডল। সুজিত মণ্ডল (বিশা) বংশ ও গুরু পরম্পরার ভিত্তিতে খ্রিষ্টীয় পালা এবং খ্রিষ্টীয় কীর্তন পরিবেশন করে আসছেন। তাঁর গানের গুরু রতিলাল মল্লিক। গুরু ছাড়াও তিনি বাবা শিশির কুমার মণ্ডলের কাছ থেকে গানের শিক্ষা নিয়েছেন। তাঁর বাবা ছিলেন গানের দলের খোলবাদক। ছোটবেলা মূলত বাবার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েই সুজিত মণ্ডল বিশা গানের দলে যোগদান করেন। মাত্র ১০ বছর বয়স থেকে তিনি যাত্রাপালায় অভিনয় করতেন। পরবর্তী সময়ে খ্রিষ্টীয় কীর্তন এবং পালাগান পরিবেশন শুরু করেন। খ্রিষ্টীয় কীর্তন ও পালার গুরু পরম্পরার শিক্ষার কথা উল্লেখ করেন। এক্ষেত্রে তিনি তাঁর গুরুপরম্পরার সিঁড়ি হিসেবে দাদা গুরু মতিলাল মল্লিক পাদ্রি-র নাম পর্যন্ত বলতে পারেন। তবে, এই দাদা গুরুর আগেই থেকেই এই অঞ্চলে খ্রিষ্টীয় কীর্তনের প্রচলন ছিল।

গুরু পরম্পরার ভিত্তিতে খ্রিষ্টীয় কীর্তন পরিবেশন করে থাকলেও সুজিত মণ্ডল নিজেও কিছু পালা রচনা করেছেন। বর্তমানে আসরে তিনি গুরু পরম্পরায় প্রাপ্ত পালার সঙ্গে নিজের রচিত পালও পরিবেশন করে

Dhaka University Institutional Repository

থাকেন। উল্লেখ্য, খ্রিষ্টীয় কীর্তন ও পালা যেহেতু ধর্মীয় গান সেহেতু তিনি ও তার দল এ ধরনের পরিবেশনের জন্য কোনো টাকা-পয়সা সম্মানী দাবি করেন না। তবে, কোনো ভক্ত খুশি হয়ে কিছু দিলে তা নিয়েই তারা সন্তুষ্ট থাকেন। সুজিত মণ্ডল বংশ ও গুরু পরম্পরার ভিত্তিতে সাধারণত ৬টি পালায় খ্রিষ্টীয় কীর্তন পরিবেশন করে থাকেন, পালাগুলি হল–'যিশুর জন্ম পালা', 'লাসারকে মৃত্যু থেকে জীবিত করার পালা', 'সমরীও পালা', 'জীবনী পালা', 'অপব্যয় পুত্র পালা' ও 'মৃত্যু পালা'। এ সকল খ্রিষ্টীয় পালা পরিবেশনের সময় আসরের সামনে যিশুর মূর্তি স্থাপন করা হয়। এরপর ধুপ জ্বেলে তার ধোঁয়া দিয়ে পরিবেশন স্থান পবিত্র করে নেওয়া হয়। পরিবেশনের শুরুতে সম্মিলিত বাদ্য বদন করা হয়। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে এ ধরনের খ্রিষ্টীয় পালা বা কীর্তনের আসরে খোল, হারমোনিয়াম, করতাল ও বাঁশি ব্যবহৃত হয়। আর এর শিল্পী-কুশীলবগণ সাধারণত ধুতি, পাঞ্জাবী বা গেঞ্জি পরিধান করে পালা পরিবেশন করে থাকেন। পালা পরিবেশনে সাধারণত বর্ণনাত্মক কীর্তন পরিবেশনের আঙ্গিক অনুসৃত হয়। মূলগায়েন কথক হয়ে কখনো কাহিনি বর্ণনা আবার নিজেই গান ধরেন।

বল্লভপুরে প্রচলিত খ্রিষ্টীয় কীর্তন ও পালার বিখ্যাত দল সুজিত মণ্ডলের সংকীর্তন দলে দোহারকি করে থাকেন–সুজিত মল্লিক, বিভু মল্লিক, ভৌয়ন্ত মল্লিক, ফকির মণ্ডল, মথুর মল্লিক, মহানন্দ চৌধুরী, ক্যাপ্টেন মল্লিক, হোলি মল্কি, সুকচাঁদ সরকার, নিরু মণ্ডল, রৈতস চৌধুরী প্রমুখ। এছাড়া, বাদ্যযন্ত্রীদের মধ্যে ফকির মণ্ডল ও ভেয়ন্ত মল্লিক খোল এবং সুজিত মল্লিক হারমোনিয়াম বাজিয়ে থাকেন। খ্রিষ্টীয় পালা কীর্তন পরিবেশনের সুর সম্পর্কে সুজিত মণ্ডল বিশা জানান–তিনি একতারা, দোঠুকী, ডাসপাহাড়ীসহ আরো কয়েকটি রাগে খ্রিষ্টীয় পালাসমূহ পরিবেশন করেন।

স্বাধীনতাপূর্ব কাল থেকে মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরের ভবেরপাড়া ও বল্লভপুরে গ্রামে এ ধরনের খ্রিষ্টীয় কীর্তন পালা গান প্রচলিত। বর্তমানে সেই ধারাবাহিকতা একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। বরং বেশ ভালো ভাবেই তার ঐতিহ্য প্রবহমাণ।[১৩৬] পাশাপাশি চুয়াডাঙ্গা জেলার কোথাও কোথাও খ্রিষ্টীয় কীর্তনের বেশ কিছু গায়ক রয়েছেন বলে জানা যায়।

দশ

খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতকের বাংলায় কৃত্যমূলক লীলানাট্যের আঙ্গিকে কৃষ্ণযাত্রা প্রচলিত ছিল। এ ধরনের পরিবেশনে কুশীলবগণ নৃত্য-গীত সহযোগে সংলাপ উচ্চারণে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গিতে অভিনয়ে অংশ নিতেন এবং অভিনয়-শিল্পীদের নৃত্য-গীতে কতিপয় বাদ্যযন্ত্রী ও দোহার সহযোগিতা করতেন। বাদ্যযন্ত্রী ও দোহারগণ পরিচালিত হতেন একজন অধিকারীর নির্দেশে। এ অধিকারীই বাদ্যযন্ত্রী ও দোহার দলের মধ্যে বা পাশে অবস্থান নিয়ে প্রয়োজন অনুসারে পরিবেশিত আখ্যানের বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করতেন, তার বর্ণনা অনুযায়ী অভিনেতাগণ অভিনয়ে অংশ নিতেন এবং দোহার-বাদ্যকরগণ গান গেয়ে, ধুয়া টেনে, বাদ্য বাজিয়ে তাদেরকে সহযোগিতা করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

এ ধরনের লীলানাট্য কৃষ্ণযাত্রা'র যে সকল অভিনয় উপাদান শনাক্ত করা যায়, তা হল–প্রথমত তাৎক্ষণিকভাবে রচিত গদ্যসংলাপ ও পূর্ব রচিত গানের ব্যবহার; দ্বিতীয়ত কেবল পুরুষ অভিনেতারাই নর-নারী উভয় লিঙ্গের চরিত্রে রূপদান। এছাড়া, পরিবেশনে হাস্যরসের উপস্থিতি ছিল লক্ষ করার মতো; পাশাপাশি পরিবেশনে–কৃষ্ণবিষয়ক কাহিনি, ধ্রুপদী রাগভিত্তিক সংগীত এবং অঙ্গসজ্জা ও পোশাকের বিশিষ্ট ব্যবহার প্রত্যক্ষ করা যেতো; এমনকি প্রলম্বিত অনুষ্ঠান-প্রদর্শনী চলতো, দর্শক ও কলাকুশলীদের মধ্যে সংলাপ বিনিময় হত। কোনো উঁচু মঞ্চ ও পর্দার প্রয়োজন ছিল না, এ ধরনের লীলানাট্য সাধারণত চারদিকে দর্শক পরিবেষ্টিত উন্মুক্ত স্থানে পরিবেশিত হত।[১৩৭]

আসলে, লীলানাট্যরীতি কৃষ্ণযাত্রা নির্দিষ্টভাবে নিজস্ব নাট্যকাঠামো থেকে নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত পরিহার করে 'শৃঙ্গার রসে'র মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং ভক্তিমূলক প্রেমকেই অধিক গুরুত্ব প্রদান করে। মধ্যযুগে প্রচলিত মঙ্গলকাব্যের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় কৃষ্ণযাত্রা মূলত পরমাত্মা, তথা কৃষ্ণের সঙ্গে ব্যক্তি-মানুষের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রেমের বিচিত্র প্রকাশরূপকে ফুটিয়ে তুলতেই আগ্রহী ছিল।[১৩৮] এ আগ্রহ থেকেই মূলত জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রেম সম্পর্ক নিয়ে এক ভক্তিবাদী নাট্য অভিযাত্রা হিসেবে কৃষ্ণযাত্রা মধ্যযুগে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে, ফলে পরিত্যক্ত হয় জাগতিক আবেগ-অভিজ্ঞতা।

অবশ্য খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকের বাংলায় কৃষ্ণযাত্রা'র গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা অর্জন এবং তৎকালের অন্যতম প্রধান নাট্যরীতিতে পরিণত হওয়ার অন্য কারণও আছে, যথা–প্রথমত চৈতন্যদেবের শাস্ত্রীয় শিষ্য ও বঙ্গীয় নন্দনতত্ত্বের প্রবক্তা রূপগোস্বামী ও তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য নাট্যকারদের দ্বারা সৃষ্ট সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষায় রচিত বিপুল পরিমাণ নাটলিপি এবং দ্বিতীয়ত বৈষ্ণব মতবাদের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা। বৈষ্ণব ধর্মমতানুসারীদের অনেকে কৃষ্ণযাত্রা'র বেশ কিছু পালা রচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে অদ্বৈতাচার্যের শিষ্য চন্দ্রশেখর দাস ছিলেন অন্যতম। তাঁর রচিত কয়েকটি নাটলিপির মাঝে প্রথমটির নাম *হরিবিলাস*। কৃষ্ণযাত্রা'র আখ্যান হিসেবে আদিতে শ্রীকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গ গৃহীত হলেও পরবর্তীকালে বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তক চৈতন্যদেব অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করায় এবং তাঁর চরিত্রে দেবত্ব আরোপিত হওয়ায় স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেবকে ঘিরেই কৃষ্ণযাত্রা'র একটি নব নাট্যরীতি গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরিবর্তে চৈতন্যদেব নিজেই আবির্ভূত হন এবং কেন্দ্রীয় চরিত্ররূপে প্রতিষ্ঠা পান।[১৩৯]

এভাবেই বিচিত্র ধারায় লীলানাট্য ক্রমপর্যায় অতিক্রম করে। এর মধ্যে আধুনিকযুগ শুরু হবার বিভিন্ন সম্ভাবনার পথ ক্রমশ উজ্জ্বল হয়। এই যুগসন্ধিক্ষণে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকে বেশ কিছু ধর্মসম্প্রদায় তাদের কৃত্যমূলক নাট্যের বর্ণনামূলক রীতি থেকে যাত্রারীতির বিকাশ সাধন করে। যেমন, শাক্ত ধর্মমতানুসারীরা শক্তিযাত্রা'র উদ্ভব ঘটান, নাথসম্প্রদায়ের যোগাচারীরা নাথযাত্রা এবং পাল রাজাদের জনপ্রিয় কাহিনি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে রচিত হয় পালযাত্রা। এ সকল নতুন নাট্যরীতি উদ্ভাবনের পরও ঐতিহ্যগতভাবে কৃষ্ণযাত্রা বা চৈতন্যযাত্রাই অন্য সকল যাত্রানুষ্ঠানের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়।[১৪০]

Dhaka University Institutional Repository

খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে যাত্রা'র কাঠামোকে নতুন রূপে বিন্যাসের কালে নারদ ও ব্যাসদেব-এর মতো কিছু হাস্যরসাত্মক চরিত্রের সংযোজন ঘটেছিল। কিন্তু ধর্মীয় চরিত্রের প্রভাব ও উপস্থিতি থেকে নাট্যরীতি হিসেবে যাত্রা অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ক্রমশ ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এই পরিবর্তনের স্পষ্ট সাক্ষ্য রয়েছে *বিদ্যাসুন্দর* যাত্রা, যার কাহিনি মূলত কবি ভারতচন্দ্র রচিত *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের একটি পালা থেকে গৃহীত হয়েছিল। যাত্রানুষ্ঠানের এই অভূতপূর্ব পরিবর্তনে পরবর্তীতে বাংলায় পেশাদার ভ্রাম্যমাণ যাত্রাদল উদ্ভূত হয়।[১৪১]

নাট্যরীতি হিসেবে যাত্রা প্রথম দিকে সচরাচর উন্মুক্ত স্থানে প্রদর্শিত হত। সাধারণত কোনো মন্দির প্রাঙ্গণ, নাটমণ্ডপ বা নাটমন্দির, উৎসব-ময়দান এবং ধনী ব্যক্তিদের বাড়ির উঠোনে যাত্রা পরিবেশিত হত। *চৈতন্যভাগবতে* প্রাপ্ত বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা বিচার করলে প্রত্যক্ষ করা যায়, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে যাত্রা প্রদর্শনের জন্য কোনো উঁচু মঞ্চের প্রয়োজন হত না। তবে, অষ্টাদশ শতকে নাট্যরীতি হিসেবে যাত্রা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে, যাত্রার ক্রমবর্ধমান সেই জনপ্রিয়তায় আসরে বিপুল সংখ্যক দর্শক সমাগম ঘটতে থাকে। দর্শক-শ্রোতাগণ যাত্রার অভিনয় স্থানের চতুর্দিকে অবস্থান গ্রহণ করতে থাকেন। দর্শক-শ্রোতার সংখ্যা বৃদ্ধিতেই প্রয়োজন পড়ে উঁচু মঞ্চের। প্রথম দিকে মূলত অভিনেতা-কলাকুশলীদের অভিনয় যেন দর্শকগণ সহজে দেখতে পারেন সে জন্য অনুষ্ঠান স্থানে মাটির উঁচু ভিত্তি স্থাপন করা হয়। সেসময় রাত্রিকালে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা সহজসাধ্য ছিল না বলে দিনের বেলাতেই যাত্রা অনুষ্ঠান প্রদর্শিত হত। এ কথাও সম্ভবত ঠিক যে, তখন লীলানাট্যের পরিবর্তীত রূপ হিসেবে যাত্রা'র আসরে নাচ ও গানের একচ্ছত্র আধিপত্য আগের মতোই বিদ্যমান ছিল। কিছু জনপ্রিয় গীতের সাথে ধ্রুপদী সঙ্গীতের চর্চাকে মানসম্মত ধরা হত আর এতে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে 'খোল' বা 'মৃদঙ্গ' অপরিহার্য ছিল। অন্যান্য সঙ্গীতযন্ত্রের মধ্যে ছিল মন্দিরা, করতাল, বাঁশি ও ঢোল। যাত্রার অধিকারী প্রথাসম্মতভাবে প্রতিটি গানের শেষে গানের ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য প্রদান করতেন।[১৪২]

খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্থ পর্যন্ত কালপর্বে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের প্রায় সকল শাখাতেই সে সময়ের সামাজিক অধোগতির চিত্র প্রতিফলিত হতে থাকে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত জনতা যাত্রাকে অনেকটা অবজ্ঞার চোখে দেখতে শুরু করেন, তারা মূলত যাত্রার আসরে পরিবেশিত নাচ ও গানের মধ্যে অশ্লীলতা প্রয়োগের অভিযোগ তুলে এই অবজ্ঞা প্রয়োগ করেন। কিন্তু দেশের বৃহত্তর অংশ, তথা সাধারণ জনতার কাছে যাত্রার আবেদন আগের মতোই অক্ষুণ্ন ছিল। এ সময়ে যাত্রানুষ্ঠানের মধ্যে কৃষ্ণযাত্রা (*কালীয়দমন যাত্রা*), চৈতন্যযাত্রা, বিদ্যাসুন্দর যাত্রা, চণ্ডীযাত্রা, রামযাত্রা ও ভাসানযাত্রা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। উল্লেখ্য, এদের মধ্যে রামযাত্রা এসেছে *রামায়ণ* থেকে, চণ্ডীযাত্রা এসেছে *চণ্ডীমঙ্গল* থেকে এবং ভাসানযাত্রা এসেছে *মনসামঙ্গল* কাব্য থেকে।[১৪৩]

Dhaka University Institutional Repository

ঊনবিংশ শতকের পেশাদার যাত্রা প্রযোজক ও ব্যবস্থাপক মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় বাংলার যাত্রাভিনয়ের প্রচলিতরীতিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনে উদ্যোগী হন। সেসময়ে তাঁর যাত্রার সংস্কারমূলক পদক্ষেপ ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে এবং ক্রমে তা সর্বত্র আদর্শ নমুনা হিসেবে গৃহীত হয়। শুধু তাই নয়, তাঁর সংস্কারের ফলে যাত্রার নাটলিপি বা পাণ্ডুলিপির সাহিত্যিক মূল্য বৃদ্ধি পায়, যেমন করে এর আগে গুরুত্ব লাভ করেছিল গদ্যভাষায় সংলাপ রচনার বিষয়টি। তাঁর যাত্রাদলের গদ্যরচনার কৌশলকেও বাংলাদেশের যাত্রা চর্চায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। উপরন্তু এ সময় হতেই যাত্রা'র পাণ্ডুলিপিতে ইউরোপীয় দ্বন্দ্বভিত্তিক নাট্যনির্মাণ কৌশল অনুপ্রবেশ করে। সেসময় বিভিন্ন যুগের নাট্যচরিত্র ও নাটলিপির ঐতিহাসিক পটভূমির সাথে সঙ্গতি রেখে সমসাময়িককালের পরিধেয় সামগ্রীর মিশ্রণ ও সাযুজ্যবিধানের বিষয়টি প্রায় উপেক্ষিত ছিল। মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সংস্কারের ফলে এই ত্রুটি দূর করে পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকতা বজায় রাখার প্রয়োজন অনুভূত হয়। যাত্রানুষ্ঠানে গীত প্রতিটি গানের সময়সীমা কমিয়ে আনা হয়। তবে, গান সংখ্যা আগের চেয়ে বেড়ে যায়। তাছাড়া, ধ্রুপদী রাগ-রাগিনীর ব্যবহারের প্রবণতা কমে গিয়ে জনপ্রিয় সুরের প্রয়োগ ঘটে। পূর্বকার যাত্রাভিনয়ে নৃত্য অপরিহার্য ছিল বিধায় সকল চরিত্র নৃত্য পরিবেশন করতেন। সংস্কারের ফলে স্বল্প সময়ের জন্য কেবল কয়েকজন নির্দিষ্ট চরিত্রাভিনেতাকেই নৃত্য প্রদর্শনের সুযোগ দেয়া হয়। নারী চরিত্রগুলো আগের মতো পুরুষ দ্বারা অভিনীত হতে থাকে। গানের উৎকর্ষসাধনের জন্য জুড়ি প্রথার প্রবর্তন করা হয়। এই প্রথা অনুযায়ী যে সকল অভিনেতা ভাল গান গাইতে পারতেন না তাঁদের পৃথক জুড়ি (গায়ক)-এর ব্যবস্থা করা হয়। পুরুষ চরিত্রের জন্য বয়োবৃদ্ধ জুড়ি এবং স্ত্রী চরিত্রের জন্য বালক জুড়ি। এই রীতিতে কখনো কখনো দোহারগণ গানের পুনরাবৃত্তি করতেন। সাম্প্রতিককালে বৃহত্তর সিলেট জেলায় প্রচলিত ঢপযাত্রার আসরে জুড়িগণ আখ্যান বর্ণনাকারীর ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন।[১৪৪]

খ্রিষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যাত্রা পরিবেশনের অর্কেস্ট্রার সাথে বেশ কিছু পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্র, যেমন—বেহালা, হারমোনিয়াম, ক্লারিওনেট ইত্যাদি সংযুক্ত হয় এবং যাত্রার আসরে নতুনতর সুরের ধারার প্রবর্তন হয় এবং বিগত শতাব্দীর বিদায়লগ্নে ইউরোপীয় নাট্যাদর্শের প্রভাবে যাত্রানুষ্ঠানের প্রারম্ভে কিছুক্ষণ অর্কেস্ট্রা বাদন পর্বের প্রচলন ঘটে। একই সময়ে যাত্রা অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী নিয়ম হিসেবে বাদ্যযন্ত্রীদের প্রশংসাসূচক ব্যঙ্গোক্তির প্রক্ষেপণ পরিত্যক্ত হয়। অন্যদিকে পরিত্যক্ত হয় যাত্রানুষ্ঠান চলাকালীন দর্শকদের কাছ থেকে দান সংগ্রহের রেওয়াজ বা প্যালা তোলার প্রচলন। পরবর্তী সময়ে এই প্রথা যাত্রা থেকে লুপ্ত হলেও অদ্যাবধি এদেশের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী নাট্যানুষ্ঠানে প্যালা প্রথা প্রচলিত রয়েছে। এরপর খ্রিষ্টীয় ঊনবিংশ শতকে যাত্রার অনুষ্ঠানে আরো দু'টি বড় সংযোজন ঘটে, তা হল—সঙ এবং বিবেক। লৌকিক হাস্যরস উপস্থাপনের জন্য সঙের প্রচলন ঘটে এবং আসরে সংঘটিত বা অভিনীত ঘটনার উপর মন্তব্য প্রকাশের জন্য বিবেকের আগমন ঘটে।[১৪৫] বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যরীতি যাত্রার কাঠামোর মধ্যে এই দুটি চরিত্রের অভিনয় এখনও প্রচলিত রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এগারো

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ইতিহাস প্রত্যক্ষ করে বলা যায় যে—এরই মধ্যে কিছু কিছু নাট্যরীতি হয়তোবা মহাকালের বন্ধুর অভিযাত্রায় লুপ্ত হয়েছে, অথবা বিবর্তনের পথরেখায় কিছুটা স্বরূপ বদলে নিয়ে নতুনরূপে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে; কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক টানাপোড়েনে সম্পূর্ণ নতুন নাট্যঐতিহ্য সৃজিত হয়েছে, যেমন—খ্রিষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে নানাবিধ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কারণে যখন বাংলাদেশের মানুষ যাত্রার অভিনয় করতে সক্ষম হয়নি, তখন এদেশের অনেক অঞ্চলে সাধারণ কৃষক-শ্রমিকরা নিজেদের সৃজনশীল চিন্তা ও ঐতিহ্যপ্রেমের নিবিষ্টতায় ঐতিহ্যবাহী নাট্যপালার জনপ্রিয় আখ্যান *রূপবান* ও *কমলার বনবাস পালার* আখ্যানের সমন্বয়ে 'নছিমন' নামে বিশেষ এক ধরনের নাট্যরীতির উদ্ভব করেন, যাকে নিশ্চিতভাবেই বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের নব রূপায়ণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

বর্তমান অধ্যায়ে প্রধানত বাংলাদেশে বসবাসরত বাঙালি সনাতন ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের নাট্যচর্চার পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে নাথসম্প্রদায়, বৈষ্ণবসম্প্রদায়, খ্রিষ্টীয় মণ্ডলীদের নাট্যচর্চার ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। এরসঙ্গে অবাঙালি চাকমা, মারমা, খাসিয়া, ত্রিপুরা, রাখাইন, গারো, মান্দি, হাজং, মণিপুরী, সাঁওতাল, ওরাওঁ, রাজবংশী প্রভৃতি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে নানা ধরনের কৃত্যমূলক নাট্যচর্চার কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। কেননা, এদেশে বসবাসরত চাকমা নৃগোষ্ঠী বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে গেংখুলী গীত, রাধামন ধনপুদি, চাদিগাঙ ছারা, লক্ষ্মীর পালা, সাদেংগিরি উপাখ্যান, গোজেনের লামা, সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ, রাজা অশোক, অঙ্গুলিমান ইত্যাদি গীতধর্মী নাট্যপালা; মারমা নৃগোষ্ঠী নিজস্ব নাট্যরীতি জ্যা-এর আসরে আলংনাবাহ, মা চ ক্যান ও সাবায়াহ্ পালা; এছাড়া কাইপ্যা, পাংখুং, চাগায়াং, সাগ্রাং, সাইংগ্যাই, লুংদি ইত্যাদি গীতধর্মী নাট্যপালা; গারো নৃগোষ্ঠী প্রাচীনকাল থেকে নিজস্ব নাট্যরীতিতে দিগ্বিবান্দি, ওয়ালজেন, শেরেন্‌জিং, চিরিং, ফদিনি, কান্দোদোলং ইত্যাদি নৃত্য, গীত, সংলাপ ও অভিনয়নির্ভর পালা; হাজং নৃগোষ্ঠী নিজস্ব নাট্যরীতিতে মহিষাসুরবধ, দেবাসুরবধ প্রভৃতি পালা এবং মণিপুরী নৃগোষ্ঠী রাসলীলাসহ নটপালা, মহাভারত, রামায়ণ ইত্যাদি নানা ধরনের কৃত্যমূলক উৎসব ও অনুষ্ঠানে নাট্য, নৃত্য, কীর্তন বা অভিনয়াকারে পরিবেশন করে থাকে।[১৪৬] অতএব, বাংলাদেশে ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ইতিহাস শুধু বাঙালির নাট্যপরিচয়ের ইতিহাস নয়, তা একইসঙ্গে এদেশে বসবাসরত সকল ভাষাভাষী, ধর্ম-সম্প্রদায় ও মতানুসারী নৃগোষ্ঠীর নাট্যচর্চার একটি সামগ্রিক ইতিহাস। আর এই নাট্যচর্চার সামগ্রিক ও ঐতিহ্যিক ইতিহাসের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের জাতিসত্তার সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় পরিচয় প্রত্যক্ষ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

[১] "ঋক্ বেদের সূক্তেগুলির অভ্যন্তরে নাটকের বীজ লুকিয়ে রয়েছে। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর প্রথমে এই মত প্রচার করেন। বৌদ্ধশাস্ত্রের পণ্ডিত অধ্যাপক লেভি এটি সমর্থন করেন।"

সুরেশচন্দ্র মৈত্র, *বাংলা নাটকের বিবর্তন*, (কলিকাতা : ক্যালকাটা বুক হাউজ, ১৯৭৩), পৃ. ২১

[২] দুলাল ভৌমিক, *সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৪), পৃ. ৭ ও ৯

[৩] ম্যাক্সমুলার, অধ্যাপক লেভি, অধ্যাপক পিশেল, অধ্যাপক হার্টেল ঋগ্বেদের সূক্ত বিশ্লেষণ করে পূর্বভারত তথা বঙ্গভূমির প্রাচীন নাটকের স্বরূপ অন্বেষণ করেছেন। তাঁদের বিশ্লেষণকে অধ্যাপক স্টেন কনো তাঁর গ্রন্থে সহজ সমীকরণে ব্যাখ্যা করে বলেছেন–

> The songs of the dialoguic nature are dialogues, arranged dramatically, and consequently there are dramatic elements, with which a work like the Gitagovinda can be set in comparison.
> Sten Konow, *A History of Sanskrit Drama,* Translated by S. L. Ghosal, 1969, p.59.

উদ্ধৃতি ও সামগ্রিক তথ্য : সুরেশচন্দ্র মৈত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২

[৪] মহম্মদ আয়ুব হোসেন, "গ্রামীণ লোকনাটক : লেটো", শ্রীসনৎকুমার মিত্র (সম্পাদিত), *বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক*, (কলিকাতা : পুস্তক বিপণি, ডিসেম্বর ২০০০), পৃ. ৮২

[৫] অমূল্যচন্দ্র সেন, *অশোকলিপি*, (কলিকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সি, পুনর্মুদ্রণ ২০০১), পৃ. ৬৮

লিপিটির ব্যাখ্যাকার জানিয়েছেন–'অন্য রাজারদের বিহারযাত্রা অপেক্ষা ধর্মযাত্রায় তাঁহার অধিকতর আনন্দ হত।'

অমূল্যচন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

[৬] উদ্ধৃতি, মহম্মদ আয়ুব হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

শিলালিপিটির বাংলা পাঠ হচ্ছে–"লোককে বিমানদর্শন দ্বারা ও হস্তীদর্শন দ্বারা এবং অগ্নিস্কন্ধ ও অন্যান্য দিব্যরূপাবলী দর্শন করাইয়া যেরূপ পূর্বে বহু বর্ষশত (ধরিয়া) হয় নাই, সেরূপ এখন দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার ধর্মানুশাস্তি দ্বারা প্রাণগণের অহত্যা, ভূতগণের অবিহিংসা, জ্ঞাতিগণের প্রতি উচিত ব্যবহার, ব্রাহ্মণ-শ্রমণগণের প্রতি উচিত ব্যবহার, মাতা পিতার প্রতি শুশ্রূষা ও স্থবিরদের প্রতি শুশ্রূষা বর্ধিত হইয়াছে। এই সকল ও অন্য বহুবিধ ধর্মচরণ বর্ধিত হইয়াছে।"

অমূল্যচন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

উপর্যুক্ত শিলিলিপির ব্যাখ্যায় জানা যায়–অশোকই বিমানদর্শনাদির প্রবর্তন দ্বারা প্রাণী-অহত্যাদির বৃদ্ধি করেছেন। এখানে বিমান অর্থ দেবতাদের স্বর্গীয় আবাস, হস্তী অর্থ ইন্দ্রাদি দেবতার বাহন। অগ্নিস্কন্ধ অর্থ গ্রহ-নক্ষত্র অগ্নিবিদ্যুতাদির তেজোময় রূপ। সে যুগে সম্ভবত নানাবিধ স্বর্গীয় দৃশ্যাবলীর চিত্র দেখিয়ে ও শোভাযাত্রা করে লোককে ধর্ম বা দেবোপাসনা প্রবন করার চেষ্টা করা হত। আর এ ধরনের আয়োজন সম্ভবত নাট্য পরিবেশনমূলক হয়ে থাকবে।'

অমূল্যচন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

[৭] মহম্মদ আয়ুব হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

[৮] সুকুমার সেন, *নট নাট্য নাটক*, (কলিকাতা : মিত্র এন্ড ঘোষ পাবলিশার্স, ভাদ্র '৯১), পৃ. ৯

[৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

[১০] গ্রাগুক্ত

[১১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

[১২] সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৬), পৃ. ১

[১৩] সৈয়দ জামিল আহমেদ, *হাজার বছর : বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা*, (ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, জুন ১৯৯৫), পৃ. ২

[১৪] সেলিম আল দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

[১৫] প্রাগুক্ত

[১৬] সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *ভরত নাট্যশাস্ত্র*, প্রথম খণ্ড, (কলিকাতা : ১৯৮০), পৃ. ১২

[১৭] সুরেশচন্দ্র মৈত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

[১৮] Muhammad Shahidullah, *Buddhist Mystic Songs,* (Dhaka : 1966), p. 53

[১৯] নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, (কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং, জুলাই ১৯৯৭), পৃ. ১০২

Dhaka University Institutional Repository

[২০] শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতিকা*, (কলিকাতা : ১৩৭১), ১২০
উদ্ধৃতি : সুরেশচন্দ্র মৈত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

[২১] সুরেশচন্দ্র মৈত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৭

[২২] আমেরিকার দি ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো-র সংগীত বিভাগের এথনোমিউজিকোলজি কোর্সের জন্য ক্লাস লেকচারে ২০১২ খ্রিষ্টাব্দের ৩ মে তারিখে ক্ষেত্রসমীক্ষার আলোকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞা থেকে চর্যাপদে উদ্ধৃত 'বুদ্ধ নাটক' এবং বাংলাদেশের চাকমা নৃগোষ্ঠীতে প্রচলিত 'বুদ্ধ কীর্তন' বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছি। পরবর্তী সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর বুদ্ধিষ্ট হেরিটেজ অ্যান্ড কালচার আয়োজিত ৩ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত "বৌদ্ধ দর্শন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সেমিনার-২০১৪"-এ "চর্যা-সংস্কৃতির আলোকে বাংলাদেশের বুদ্ধ নাটকের ঐতিহ্য অন্বেষণ" শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেছি। এ সকল বক্তৃতা ও আলোচনার ভেতর দিয়ে সাম্প্রতিক বাংলাদেশের বুদ্ধ নাটক, বুদ্ধ কীর্তন ইত্যাদি পরিবেশনাশিল্পের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে, যার মাধ্যমে চর্যা-সংস্কৃতির পরম্পরার ইতিহাস নির্মাণ করার নব প্রয়াস প্রত্যক্ষ করা যায়।

[২৩] অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ*, (কলকাতা : নয়াপ্রকাশ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৩৯

[২৪] সাইমন জাকারিয়া, *প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, জুন ২০০৭), পৃ. ৭০

[২৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

[২৬] সেলিম আল দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *বাংলা সাহিত্যের নবযুগ*, (কলিকাতা : মাঘ ১৩৮৩), পৃ. ১৬৬

[২৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

[২৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

[২৯] সৈয়দ আলী আহসান, *চর্যাগীতিকা*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪), পৃ. ১০৪

[৩০] শশিভূষণ দাশগুপ্ত-এর উদ্ধৃতি, অতীন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

[৩১] সেলিম আল দীন, "বাঙলা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্বের পূর্বাপর", *থিয়েটার স্টাডিজ*, (ঢাকা : নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, জুন ১৯৯৫) পৃ. ১৪

[৩২] অতীন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

[৩৩] সাইমন জাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-৩১

[৩৪] সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আদিপর্ব*, (ঢাকা : শিল্পতরু প্রকাশনী, এপ্রিল ১৯৯৪), পৃ. ৪৬

[৩৫] সাইমন জাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২১

[৩৬] অলকা চট্টোপাধ্যায়, *চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী*, (কলিকাতা : অনুষ্টুপ, জানুয়ারি ১৯৯৮), পৃ. ৪২

[৩৭] সাইমন জাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

[৩৮] নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, (কলিকাতা : অগ্রহায়ণ ১৩৮২), পৃ. ৪০৪

[৩৯] সাইমন জাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

[৪০] Syed Jamil Ahmed, "Buddihist Theatre in Ancient Bengal", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh,* (Dhaka : June 1995), P. 36-37

[৪১] সাইমন জাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

[৪২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

[৪৩] প্রাগুক্ত

[৪৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

[৪৫] প্রাগুক্ত

[৪৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

[৪৭] অলকা চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

[৪৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

[৪৯] সাইমন জাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

[৫০] সুকুমার সেন, "বাংলার সংস্কৃতিতে মুসলমান প্রভাব ও মুসলমানী কেচ্ছা", দেশ : সাহিত্য সংখ্যা, (কলিকাতা : ১৩৭২)-এর উদ্ধৃতি, মহম্মদ আয়ুব হোসেন, "গ্রামীণ লোকনাটক : লেটো", প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩-৮৪

Dhaka University Institutional Repository

[৫১] সুরেশচন্দ্র মৈত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
[৫২] উদ্ধৃতি : সুরেশচন্দ্র মৈত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
[৫৩] প্রাগুক্ত
[৫৪] প্রাগুক্ত
[৫৫] সুরেশচন্দ্র মৈত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
[৫৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮
[৫৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
[৫৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
[৫৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
[৬০] সেলিম আল দীন, *বাঙলা নাট্যকোষ*, (ঢাকা : শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, এপ্রিল ১৯৯৮), পৃ. ১১৮
[৬১] বিজিতকুমার দত্ত, *প্রাচীন বাঙ্গালা-মৈথিলী নাটক*, (বর্ধমান : জুলাই ১৯৮০), পৃ. তেতাল্লিশ
[৬২] সুরেশচন্দ্র মৈত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
[৬৩] প্রাগুক্ত
[৬৪] প্রাগুক্ত
[৬৫] প্রাগুক্ত
[৬৬] সুকুমার সেন, "বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ", পৃ. ৭৪-৮২। উদ্ধৃতি, বিজিতকুমার দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. চুয়াত্তর
[৬৭] সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
[৬৮] প্রাগুক্ত
[৬৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
[৭০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯
[৭১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯-৬০
[৭২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
[৭৩] সুরেশচন্দ্র মৈত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০
[৭৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১
[৭৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭২
[৭৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২
[৭৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২-৭৩
[৭৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
[৭৯] সুকুমার সেন, *নট নাট্য নাটক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৬১
[৮০] সুরেশচন্দ্র মৈত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩
[৮১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪
[৮২] প্রাগুক্ত
[৮৩] প্রাগুক্ত
[৮৪] প্রাগুক্ত
[৮৫] বিজিতকুমার দত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. পঞ্চাশ থেকে একান্ন
[৮৬] প্রাগুক্ত, পৃ. চুয়ান্ন
[৮৭] প্রাগুক্ত, পৃ. পঞ্চান্ন
[৮৮] উদ্ধৃতি মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, ১ম খণ্ড, (ঢাকা : ১৯৫৩), পৃ. ২১
[৮৯] বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মণিপুরী সম্প্রদায়ের গোষ্ঠলীলা ও রাসলীলায় গীতি ও নৃত্য ছাড়া কোনো সংলাপ ব্যবহৃত হয় না।
দ্রষ্টব্য : সাইমন জাকারিয়া, *প্রণমহি বঙ্গমাতা*, (চতুর্থ পর্ব, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৮), পৃ. ৩১-৮৬
[৯০] সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, (কলিকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, মাঘ ১৪০০) পৃ. ১১০

Dhaka University Institutional Repository

[৯১] সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ২১

[৯২] চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *শূন্যপুরাণ*, (কলিকাতা : ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৭৫

[৯৩] সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

[৯৪] চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

[৯৫] সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ২২

[৯৬] শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদিত), *শূন্যপুরাণ*, (কলিকাতা : ১৩১৪), পৃ. ৮৩-৮৫

[৯৭] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য–শ্রীসুকুমার সেন, *নট নাট্য নাটক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২-৬৯

[৯৮] শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

[৯৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

[১০০] নাজমুল হক, *উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্যের নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৭), পৃ. ১৫২

[১০১] সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

[১০২] সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড , প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬-১১৭

[১০৩] শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৪

[১০৪] সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

[১০৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

[১০৬] শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস*, (কলিকাতা : ১৯৭৫), পৃ. ৬৫৩

[১০৭] সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩৪

[১০৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

[১০৯] সুকুমার সেন, *নট নাট্য নাটক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

[১১০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

[১১১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

[১১২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪ ও ৫৬

[১১৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

[১১৪] সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭

[১১৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

[১১৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

[১১৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৩

[১১৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

[১১৯] সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮

[১২০] সাইমন জাকারিয়া, *বাংলাদেশের লোকনাটক : বিষয় ও আঙ্গিক-বৈচিত্র্য*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৮), পৃ. ১৮২

[১২১] সুনামগঞ্জের দিরাই বাজারে অবস্থিত জগন্নাথ জিউর মন্দিরে প্রতিদিন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কাশীদাসী মহাভারত পাঠ করা হয়। ২২ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে উক্ত মন্দিরের পুরোহিতের নিকট হতে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য।

[১২২] উদ্ধৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯

[১২৩] সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২-৯৩

[১২৪] বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানায় বসবাসরত মৈতৈ মণিপুরীরা কাশীদাসী মহাভারত পাঠ করেন এবং সুনামগঞ্জ অঞ্চলে সনাতন ধর্মীয় পূজাপার্বণে ঢপযাত্রার আঙ্গিকে মহাভারতের আখ্যানের কোনো কোনো অংশ অভিনীত হয়ে থাকে।

[১২৫] সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২

[১২৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২

[১২৭] সাইমন জাকারিয়া, *প্রণমহি বঙ্গমাতা*, ১ম থেকে ৪র্থ খণ্ড, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৪-২০০৮) দ্রষ্টব্য

[১২৮] আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (সম্পাদিত), *কবি শুকুর মাহমুদ বিরচিত গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, জানুয়ারি ১৯৭৪), পৃ. আট

Dhaka University Institutional Repository

[১২৯] আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১-১৬২

[১৩০] মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, প্রথম খণ্ড, (ঢাকা : রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, আশ্বিন ১৩৮২), পৃ. ৩৩

[১৩১] যেরোম ডি'কস্তা, *বাংলাদেশের কাথলিক মণ্ডলী*, প্রথম খণ্ড, (ঢাকা : প্রতিবেশী প্রকাশনী, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা, আগস্ট ১৯৮৮), পৃ. ১৬

[১৩২] ঢাকার ফার্মগেট এলাকার জাগরনীতে বসবাসরত সিস্টার লিলিয়ন-এর নিকট থেকে ১৫ জানুয়ারি ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে এক সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য।

[১৩৩] ফাদার যোফেস ম. গোমেজ (জীবন), "রামুর পালার ইতিবৃত্ত", *মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিষ্ট*, যোসেফ ডি' রোজারিও (সম্পাদিত), (ঢাকা : পাদ্রীশিবপুর খ্রিষ্টান ডেভলপমেন্ট কমিটি, ডিসেম্বর ১৯৯৩) পৃ. উল্লেখ নেই

[১৩৪] প্রাগুক্ত

[১৩৫] গাজীপুরের মিরের বাজার-উলুখোলার পার্শ্ববর্তী গ্রাম কুচিলাবাড়ি-মঠবাড়ির নবজ্যোতি নিকেতন যীশুসংঘ গঠনকেন্দ্রে ৭-১০ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সাধু আন্তনির পালাগান (ঠাকুরের গীত)-এর প্রথম জাতীয় উৎসবে সাভারের মানিক গোমেজ, ডমিনিক গোমেজ, বিজয় গোমেজ, আদম গোমেজ; গাজীপুর-রাঙামাটিয়ার রবি গায়েন, ডগু গায়েন, সিলু গায়েন, মিলন গায়েন; কালীগঞ্জ-তুমিলিয়ার অরুণ কোড়াইয়া, সমিল গায়েন; কালীগঞ্জ-নাগরির সমর গায়েন, আন্তনী গায়েন, নিকোলাস গায়েন এবং নাটোর বনপাড়ার সুব্রত গায়েন ও আলেকজাণ্ডার গায়েন প্রমুখের সাধু আন্তনির পালাগান পরিবেশন প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা থেকে তথ্য প্রদত্ত হয়েছে।

[১৩৬] সাইমন জাকারিয়া, *বাংলাদেশের লোকনাটক : বিষয় ও আঙ্গিক-বৈচিত্র্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২০

[১৩৭] গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা*, (কলিকাতা : অক্টোবর ১৯৭২) পৃ. ১৫৮-৫৯

[১৩৮] সৈয়দ জামিল আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০

[১৩৯] সৈয়দ জামিল আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

[১৪০] প্রাগুক্ত

[১৪১] প্রাগুক্ত

[১৪২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

[১৪৩] প্রাগুক্ত

[১৪৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২

[১৪৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

[১৪৬] আফসার আহমদ, *বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠী নাট্য*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৮), পৃ. ২৩-২৭

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের বিষয়-বৈচিত্র্য

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ইতিহাসের আলোচনাতে বিষয়-বৈচিত্র্যের নানাবিধ আভাস গ্রথিত হয়েছে। আসলে, নানা কালে নানা ধরনের জাতি ও ধর্মের সংকরে বাংলার মানুষ একদিকে যেমন বহুমাত্রিক জ্ঞানচর্চায় নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি সেই জ্ঞানচর্চার সঙ্গে উদ্ভাবন করেছেন নানা ধরনের সংগীত, নাট্য ও পরিবেশনরীতি। উল্লেখ করতে দ্বিধা নেই—বাংলাদেশের মানুষের তাঁদের স্বউদ্ভাবিত বিচিত্র ধরনের নাট্যরীতি কখনো ব্যবহার করেছেন ধর্মকথা প্রচারের নিমিত্তে, কখনোবা গুরুপরম্পরায় প্রাপ্ত জ্ঞানের ধারাবাহিকতা রক্ষার কাজে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধর্মীয় কৃত্য পালনে ও চিত্তবিনোদনের তাগিদে বাংলার মানুষ বিভিন্ন প্রকার নাট্যক্রিয়া বা নাট্যমূলক অভিনয়, তথা নাট্যচর্চা করেছেন। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, পরিবেশনশিল্প হিসেবে বাংলার নাট্যরীতির বিচিত্রতা অর্জনের পেছনে কাজ করেছে মূলত সময়ের প্রবহমানতা এবং বিভিন্ন এলাকায় বসবাসরত জনজীবনের বৈচিত্র্য। প্রধানত জনমানুষের ধর্ম, আচার, ব্যবহার, রুচি, পেশা, ভাষা ও জীবনধারার বৈচিত্র্যের কারণেই নাট্যে বিষয়-বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক-বৈচিত্র্য সংঘটিত হয়।

বাংলার নাট্যঐতিহ্যের বিষয়-বৈচিত্র্যের আলোচনা করতে গেলে এদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের কয়েকটি সত্যকে বিবেচনায় রাখতে হয়—১. আর্য ভাষাভাষী মানুষের শাসনের কারণে এদেশীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে আর্য সংস্কৃতির চর্চার কিছু রূপ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, ২. স্বভূমির নিজস্ব সংস্কৃতিচর্চার ধারাবাহিকতা এদেশের মাটি ও মানুষ থেকে কোনোদিন অবলুপ্ত হতে পারেনি, এবং ৩. দ্বাদশ শতকে মুসলমানদের আগমনে বাংলার সংস্কৃতিতে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়; এক্ষেত্রে দেশের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির সঙ্গে মুসলমান সংস্কৃতির কিছু ইতিহাস, পুরাণ, কাল্পনিক ঘটনা, চরিত্রের মিশ্রণ ঘটে।

অতীতে যে দেশে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাজাদের শাসন ছিল সেখানে যখন পর্যায়ক্রমে সেন শাসন বা মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা হল, তখন কিন্তু সাধারণ মানুষের রক্তস্রোতের সঙ্গে বাহিত হাজার বছরের নাচ-গান বা নাট্য পরিবেশনের ঐতিহ্য একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়নি। বরং তা রয়ে গেল এদেশের সংকরজাত মানুষের সর্বগ্রাসী ও সংশ্লেষণী স্বভাবে জারিত হয়ে নবরূপে উদ্ভাসিত ও চর্চিত হওয়া শুরু করলো।

এভাবেই নানা জাতি ও ধর্মের শাসনে-শোষণে এদেশের সাধারণ মানুষের জীবন-যাপনে যেমন বৈচিত্র্য এসেছে, তেমন করে এদেশীয় মানুষের ধর্ম, বিশ্বাস, দর্শন, শিল্পকলা, সাহিত্য এবং সর্বোপরি সংস্কৃতিতে সেই বৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের বিষয়-বৈচিত্র্য তারই ফসল।

Dhaka University Institutional Repository

আশুতোষ ভট্টাচার্য *বাংলার লোকসংস্কৃতি* শীর্ষক গ্রন্থে "লোকনাট্য" তথা ঐতিহ্যবাহী বাংলানাট্যকে পরিবেশনরীতির দিক দিয়ে শ্রেণিকরণের মাধ্যমে আলোচনা করেছেন; এক্ষেত্রে তিনি নাট্যরীতি হিসেবে 'খন বা খনের গান', 'পালাটিয়া', 'রঙ পাঁচাল', 'গম্ভীরার গান', 'আলকাপ', 'কৃষ্ণযাত্রা', 'নূতন যাত্রা', 'রাম যাত্রা', 'কুশানে', 'চণ্ডীযাত্রা', 'ভাসানযাত্রা', 'বিষহরা', 'স্বদেশী যাত্রা', 'থিয়েটারী যাত্রা', 'রয়ানী' উপশিরোনামে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করেছেন।[১] অন্যদিকে সৈয়দ জামিল আহমেদ *হাজার বছর : বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা* শীর্ষক গ্রন্থে 'রূপ-পদ্ধতি-কাঠামোর মধ্য দিয়ে' বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যের বৈচিত্র্যকে শনাক্ত করেছেন, যথা—১. সংস্কৃত নাট্য প্রভাবজাত রীতি, ২. কথানাট্য, ৩. নাটগীত, ৪. লৌকিক হাস্যরসাত্মক নাট্য, ৫. মিশ্রনাট্য, এবং ৬. পুতুলনাচ।[২] উল্লেখ্য, এ ধরনের আঙ্গিকগত শ্রেণিকরণের মধ্যে বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যের বিষয়-বৈচিত্র্যের আলোচনা দুর্লভ নয়।

সেলিম আল দীন *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য* শীর্ষক গ্রন্থে পরিবেশনের আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যের বিষয়-বৈচিত্র্যের সমতা বিধানে তৎপর হয়েছেন। তাঁর গ্রন্থের ১০টি অধ্যায়ে স্পষ্টত বাংলানাট্যের বিষয়-বৈচিত্র্য স্বীকৃত।[৩] সেলিম আল দীনকৃত বিষয় ও আঙ্গিক-বৈচিত্র্যের আলোচনার শুরুতে প্রাচীন বাংলার নাট্যসংক্রান্ত নির্দশন ও বিভিন্ন উপস্থাপনমূলক কাব্য ও তা পরিবেশনরীতি সম্পর্কে জানা যায়; এরপর বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যের বিষয় ও আঙ্গিকগত পরম্পরা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া। যাকে নিম্নরূপে বিন্যস্ত করা যেতে পারে, যথা :

১. চর্যাপদে প্রাপ্ত তথ্যমতে প্রাচীন বাংলার 'বুদ্ধ নাটক'-এর স্বরূপ ও প্রকৃতি বিচার
২. সংস্কৃতি কাব্য 'গীতগোবিন্দ'-এর পরিবেশনরীতি
৩. 'সেখ শুভোদয়া', 'শূন্যপুরাণ'ও ধর্মপূজার নাট্যমূলক উপস্থাপন
৪. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', 'কৃষ্ণমঙ্গল' প্রভৃতি কাব্যের পরিবেশনরীতি
৫. গেয়-মঙ্গলপাঁচালি 'মনসামঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'শিবমঙ্গল' প্রভৃতি কাব্যের নাট্যমূলক উপস্থাপন
৬. প্রণয়পাঁচালি 'ইউসুফ-জোলেখা', নাটগীত 'বিদ্যাসুন্দর' প্রভৃতি কাব্যের পরিবেশনরীতি
৭. পাঁচালিনাট্যরীতিতে বাংলা রামায়ণ, মহাভারতের উপস্থাপন
৮. চৈতন্যচরিতাখ্যান 'চৈতন্যভাগবত', 'চৈতন্যমঙ্গল' প্রভৃতি কাব্যের উপস্থাপনরীতি
৯. পিরপাঁচালি সত্যনারায়ণ, সত্যপির, গাজীপির ইত্যাদির পরিবেশনপদ্ধতি
১০. গীতিকা 'মহুয়া', 'কাঞ্চনকন্যা' প্রভৃতির নাট্যমূলক উপস্থাপন
১১. যাত্রা, ঢপযাত্রা, ঢপকীর্তন প্রভৃতি উপস্থাপন
১২. বাংলাদেশের 'উপজাতীয়' (আদিবাসী/নৃগোষ্ঠী) নাট্যরীতি
১৩. বাংলাদেশ এবং সীমান্তবর্তী নেপাল, মিথিলা, উড়িষ্যা ও আসামের নাট্যরীতির সম্পর্ক বিচার।[৪]

সেলিম আল দীনকৃত এই শ্রেণিকরণে মূলত মধ্যযুগের বাংলা নাট্যের স্বরূপ অন্বেষণের প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ করা যায়। ক্ষেত্রবিশেষে এই শ্রেণিকরণে সমকালে চর্চিত বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের তুলনামূলক আলোচনা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কালের পরিবেশনশিল্প প্রত্যক্ষপূর্বক সৈয়দ জামিল আহমেদ *Acinpakhi Infinity : Indigenous Theatre of Bangladesh* শীর্ষক গ্রন্থে ঐতিহ্যবাহী নাট্যের বিষয়-বৈচিত্র্যকে ৮টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন, যথা :

১. Performances Related to Krsna and Caitanya
২. Performances Related to Ramacandra
৩. Performances Related to Siva and Kali
৪. Performances Related to Manasa
৫. Performances Related to Buddhisum and Natha Cult
৬. Performances Related to Muslim Saints and Legendray Heroes
৭. Secular Performances
৮. Hybrid Performances.[৫]

এ সকল শ্রেণিকরণে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের বিষয়-বৈচিত্র্যের সামগ্রিকতা স্পষ্ট হয়নি। আসলে, বাংলাদেশে প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী নাট্যের সমাগ্রিকতা প্রকাশের উপযোগী বিষয়গত শ্রেণিকরণ অত্যন্ত দুরূহ, তবে তা অসম্ভব নয়।

এবারে সামগ্রিক বিচারে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের বিষয়-বৈচিত্র্যের শ্রেণিকরণ নিম্নে প্রদত্ত হল :

১. ধ্রুপদী মহাকাব্য রামায়ণ ও তার চরিত্রসমূহের মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান
২. ধ্রুপদী মহাকাব্য মহাভারত ও তার ভক্তিবাদী চরিত্রের মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান
৩. বাঙালির জাতীয় মহাকাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও তার বিভিন্ন লীলা প্রকাশক আখ্যান
৪. বৈষ্ণবধর্মগুরু শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পার্ষদদের জীবন মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান
৫. লোকায়ত হিন্দু দেব-দেবী শিব-কালী ও তাদের মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান
৬. লোকায়ত নাথ-সংস্কৃতির তত্ত্ব-মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান
৭. লোকায়ত সর্পদেবী পদ্মা বা মনসা ও তার মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান
৮. লোকায়ত হিন্দুদের সংকরজাত দেবতা ত্রিনাথ ও তার মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান
৯. ইসলামের ইতিহাসের মর্মান্তিক কারবালাযুদ্ধ ও তার বেদনা প্রকাশক আখ্যান
১০. লোকায়ত মুসলমান পিরদের কাল্পনিক জীবনী ও তাদের মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান
১১. খ্রিষ্টীয় ধর্মপ্রবর্তক ও ধর্মপ্রচারকদের জীবন ইতিহাস ও তাদের মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান
১২. বৌদ্ধ ধর্মপ্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ ও অন্যান্য বৌদ্ধ ধর্মীয় চরিত্রের মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান
১৩. লোককথা, রূপকথা ও স্থানীয় ইতিহাস-আশ্রিত মানবীয় প্রেম মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান
১৪. বাংলার গ্রামীণ মানুষের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনচিত্র প্রকাশক আখ্যান
১৫. তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের আলোকে উদার জ্ঞানতত্ত্ব প্রকাশক আখ্যান।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া, বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় ভ্রাম্যমাণ পরিবেশনাশিল্পের ঐতিহ্যকে এই শ্রেণিকরণে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ভ্রাম্যমাণ পরিবেশনাসমূহ নিশ্চিতভাবেই নাট্যমূলক এবং তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থানে দর্শকদের সামনে এক বা একাধিক অভিনেতা-শিল্পী দ্বারা পরিবেশিত হয়।

উল্লেখ্য, গবেষকের প্রত্যক্ষ নাট্যদর্শন অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের উপর্যুক্ত শ্রেণিকরণ প্রস্তুতকৃত। তবে, দাবি করা চলে না যে, এই শ্রেণিকরণ অপরিবর্তনীয়। বৃহত্তর দৃষ্টিতে এই শ্রেণিকরণের সঙ্গে আরো কিছু বিষয় যুক্ত হতে পারে, যেমন—এদেশে বসবাসরত হিন্দুদের অন্যান্য দেব-দেবীর মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান পরিবেশনা; বিচিত্র নৃগোষ্ঠীর বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা, পার্বণ ও উৎসবকেন্দ্রিক কৃত্যমূলক আখ্যান পরিবেশনা; অপরাপর ক্ষুদ্র ধর্মাচারী বাঙালি ও অবাঙালিদের ধর্মাচারকেন্দ্রিক নাট্য পরিবেশনা; মাঠ ও কৃষি সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন কৃত্যাচার ইত্যাদি।

আগেই বলা হয়েছে—বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয় ও পরিবেশনাসমূহকে সুনির্দিষ্ট কোনো শ্রেণিকরণের মধ্যে আনা অত্যন্ত কঠিন ও দুরুহ। কারণ, এদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের যে কোনো একটি বিষয়ভিত্তিক আখ্যান পরিবেশনের মধ্যে অধিকাংশক্ষেত্রেই অপরাপর বিষয়ভিত্তিক আখ্যান যুক্ত হতে দেখা যায়। যেমন—রামায়ণ বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পরিবেশন এদেশের অধিকাংশ শিল্পী-কুশীলব বা পালাকারগণ আসরে উপস্থিত মুসলমান ও খ্রিষ্টান দর্শক-শ্রোতাদের জন্যে রাম চরিত্রের মাহাত্ম্যের পাশাপাশি মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হজরত মুহম্মদ (সাঃ) কিংবা খ্রিষ্টানদের ধর্মপ্রবর্তক যিশু খ্রিষ্টের জীবনী মাহাত্ম্যকে উপস্থাপন করে থাকেন। আবার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধালীলার সমান্তরালে লাইলী-মজনু কিংবা ইউসুফ-জুলেখার আখ্যানকেও যুক্ত করেন। একই চিত্র মুসলমানদের লোকায়ত পিরদের মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান পরিবেশনাতেও লক্ষ করা যায়। অধিকাংশক্ষেত্রে মুসলমান গায়কগণ তাঁদের নিজেদের পির মাহাত্ম্যের আখ্যান পরিবেশনে হিন্দু পুরাণের বিভিন্ন দেব-দেবী বা বৈষ্ণবদের ধর্মগুরু শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের জীবন ইতিহাস সম্পর্কিত আখ্যান সংযুক্ত করেন। এই সকল কারণে এদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিকরণ খুবই জটিল। এখন পর্যন্ত এদেশে যেহেতু নির্ধারিত বিষয়ভিত্তিক আখ্যান পরিবেশনের প্রচলন রয়েছে, সেহেতু উপর্যুক্ত শ্রেণিকরণে সেই প্রচলনকে বিবেচনা গ্রহণ করা হয়েছে।

১. ধ্রুপদী মহাকাব্য *রামায়ণ* ও তার চরিত্রসমূহের মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান

আদি কবি বাল্মীকি রচিত ধ্রুপদী মহাকাব্য *রামায়ণ*। তিনি আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে সংস্কৃত ভাষায় মূল গ্রন্থটি রচনা করেন। পরবর্তী সময়ে বাল্মীকি রচিত মূল *রামায়ণ*-এর সঙ্গে অনেক অংশ সংযুক্ত হয়েছে, যেমন—উত্তরকাণ্ড। রামায়ণের সর্বশেষ অধ্যায় 'উত্তরকাণ্ড' বাল্মীকি রচিত আদি *রামায়ণে* ছিল না, এটি পরবর্তীকালের সংযোজন। প্রক্ষিপ্ত বা সংযোজন যা-ই থাকুক না কেন, পরবর্তী সময়ে সবকিছু মূলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এবং সমগ্র রচনাই এখন বাল্মীকির নামে চলে।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত বাল্মীকি রামায়ণে চব্বিশ হাজারের অধিক শ্লোক আছে। কাণ্ডগুলোর নাম ও ঘটনাবলী হচ্ছে—'আদিকাণ্ড' বা 'বালকাণ্ড' : রামের বাল্যকাল। 'অযোধ্যাকাণ্ড' : অযোধ্যার ঘটনাবলী—দশরথ কর্তৃক রামের নির্বাসন। 'অরণ্যকাণ্ড' : রামের অরণ্য জীবন ও সীতা হরণ। 'কিস্কন্ধ্যাকাণ্ড' : কিস্কিন্ধ্যায় রামের বাস এবং সুগ্রীবের সহিত বন্ধুত্ব, সীতা অন্বেষণ উদ্‌যোগ। 'সুন্দরকাণ্ড' : রামের লঙ্কাযাত্রা ও লঙ্কায় উপস্থিতি। 'লঙ্কাকাণ্ড' বা 'যুদ্ধকাণ্ড' : রাবণের সহিত রামের যুদ্ধ, রাবণের পলায়ন ও মৃত্যু, সীতাকে উদ্ধার করে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন এবং রামের রাজ্যাভিষেক। 'উত্তরকাণ্ড' : অযোধ্যায় রামের রাজ্য শাসন, সীতার বনবাস, লব-কুশের জন্ম, সীতার নির্দোষিতা প্রমাণ, পুনর্মিলন ও মৃত্যু।

উপমহাদেশীয় বিভিন্ন সাহিত্যে *রামায়ণে*র অনেক ধরনের কথা ও কাহিনি পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলির আখ্যানভাগ সর্বাংশে এক রকম বা সমান নয়। মহাভারতের আদিপর্বে একটি শ্লোক আছে :

আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষতে পরে।
আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি ॥

অর্থাৎ, কয়েকজন কবি এই ইতিহাস পূর্বে বলে গেছেন, এখন অপর কবিরা বলছেন, আবার ভবিষ্যতে অন্য কবিরাও বলবেন।

উপর্যুক্ত উক্তিটি *রামায়ণ* সম্বন্ধেও খাটে। *রামায়ণে*র জনশ্রুতি অতি প্রাচীন যুগ থেকে প্রচলিত ছিল, যা অবলম্বন করে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন কবি নিজের রুচি অনুসারে আখ্যান রচনা করেছেন এবং পূর্ববর্তী রচয়িতার সাহায্য নিয়েছেন। এই কারণে *মহাভারত*-পুরাণাদিতে বর্ণিত আখ্যান বাল্মীকি-*রামায়ণে*র সঙ্গে সর্বত্র মেলে না। কৃত্তিবাস-তুলসীদাস প্রভৃতি কবিরা বাল্মীকির যথাযথ অনুসরণ করেন নি, আখ্যানের অনেক অংশ পুরাণাদি থেকে নিয়েছেন। বাল্মীকি রামকে বিষ্ণুর অবতার বললেও তাঁকে সুখদুঃখধীন মানুষ রূপেই চিত্রিত করেছেন, কিন্তু বাংলার কৃত্তিবাস ও অন্যান্য কবিগণ রামচরিত্রে প্রচুর অতি-লৌকিক বা অলৌকিক লক্ষ্মণ জুড়ে দিয়েছেন।

সমগ্র বাংলাদেশে 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'-এর আখ্যান পরিবেশনা সর্বাধিক জনপ্রিয়। একই সঙ্গে একথাও বলা যায় যে, কবি নিত্যানন্দ রচিত 'অদ্ভুত রামায়ণ'-এর আখ্যান পরিবেশনাও কম জনপ্রিয় নয়। উত্তরবঙ্গের রাজশাহী অঞ্চলে 'অদ্ভুত রামায়ণ'-এর প্রচলন রয়েছে। এছাড়া, বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে একমাত্র মহিলা কবি চন্দ্রাবতী রচিত 'রামায়ণ' এবং দক্ষিণবঙ্গের খুলনা অঞ্চলে কবিয়াল বিজয় সরকার রচিত 'রামায়ণ' আখ্যান পরিবেশিত হয়।

কাহিনি হিসেবে *রামায়ণে* মূলত সাংসারিক জীবনের চিরায়ত সম্পর্কের কথা বিবৃত হয়েছে; যার একদিকে আছে পিতৃ-মাতৃ ভক্তি, পতি প্রেম, পত্নী নিষ্ঠা এবং ভ্রাতৃ প্রেমের পরম দৃষ্টান্ত, অন্যদিকে আছে লোভ-কুটিলতার দ্বন্দ্ব, রাজ্য ও রাজত্ব নিয়ে জটিলতা আর তারই ভেতর দিয়ে সমগ্র রামায়ণে ঘটে বিয়োগান্ত পরিণাম। সাংসারিক জীবনের এই পরিণাম বাঙালির হৃদয়কে ভাবিয়ে-কাঁদিয়ে ফেরে, তাই রামায়ণের কাহিনি বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের আসরে যথেষ্ট জনপ্রিয়তার সাথে অভিনীত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে *রামকীর্তন*, *রামমঙ্গল*, *ঢপযাত্রা*, *রামযাত্রা*, *রামলীলা*, *কুশান গান* ইত্যাদি অভিনয়-আঙ্গিকে সাধারণত *রামায়ণে*র তেরোটি পালা পরিবেশিত হয়ে থাকে, পালাগুলি হচ্ছে–'রাম-সীতার জন্ম', 'রাম-সীতার বিবাহ', 'রামচন্দ্রের বনবাস ও সীতা হরণ', 'বালি বধ', 'সাগর বন্ধন', 'সীতা হরণ', 'মহীরাবণ', 'তরনীসেন বধ', 'রাবণ বধ', 'লক্ষণ শক্তিশেল', 'সীতা উদ্ধার ও অগ্নিপরীক্ষা', 'অশ্বমেধযজ্ঞ' ও 'সহস্রকাণ্ড রাবণ বধ'।[৭]

১.১ রামযাত্রা

রামায়ণের কাহিনির সংলাপাত্মক চরিত্রাভিনয়কে সাধারণত 'রামযাত্রা' বলা হয়। এ ধরনের পরিবেশনা বিশেষ করে গ্রামীণ বাড়ির উঠানে পরিবেশিত হয়ে থাকে, তাই রামযাত্রার পরিবেশনাকে উঠানযাত্রাও বলা যেতে পারে। রামযাত্রার পরিবেশনাকে কেবল গদ্যরীতিতে উপস্থাপিত সংলাপাত্মক চরিত্রাভিনয় বলার কোনো সুযোগ নেই; কারণ, সংলাপ হোক আর বর্ণনায় হোক সবক্ষেত্রেই রামযাত্রার আসরে গীতিরূপ ব্যবহৃত হয়; এক্ষেত্রে রামযাত্রাকে গীতিনাট্যরীতি বলার অবকাশ রয়েছে।

রামযাত্রার আসরের শুরুতেই থাকে বন্দনা। বন্দনায় একসঙ্গে রাম, সরস্বতী, কালীকে যেমন স্মরণ করা হয়; পাশাপাশি তেমনি নাথদের ধর্মনিরঞ্জন, মুসলমানদের পির-পয়গম্বর ও সনাতনধর্মের উপাস্য গঙ্গা মায়ের স্তুতি করা হয়। অতএব, স্পষ্টত রামযাত্রার আসরের ঐতিহ্যের সাথে হিন্দু, মুসলিম ও নাথযোগীদের সম্পর্কসূত্রকে শনাক্ত করা যায়।[৮]

বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের ঠাকুরগাঁও অঞ্চলে পরিবেশিত রামযাত্রার আসরে বন্দনার পর আছে–বাণের প্রতি দানবের সংলাপ, যার ভাষাগত গাঁথুনিতে সাধুভাষার প্রভাব থাকে এবং সংলাপের কথাগুলি সাধারণত ছন্দ বদ্ধ বলে প্রত্যক্ষ করা যায়।

*রামযাত্রা*র পরিবেশনে আরেকটি বিশেষ বিষয় লক্ষ করা যায়, তা হচ্ছে–চরিত্রের সংলাপের পরের অংশে সাধারণত কিছু বর্ণনাত্মক গীত প্রযুক্ত হয়, যা নাট্যের কাহিনি ও চরিত্রের চলন-বলনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ঠাকুরগাঁও ছাড়াও বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ, মানিকগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে রামযাত্রার প্রচলন রয়েছে। মানিকগঞ্জ অঞ্চলের লোকায়ত মুসলিম সাধক সাইদুর রহমান বয়াতীর রামযাত্রার 'সীতার বিবাহ' পালাটি মূল রামায়ণ কাহিনিকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছে। যেখানে রামের জীবনের সকল মাহাত্ম্য ও শক্তির মূল নিয়ন্ত্রক হলেন রামচন্দ্রের গুরু বিশ্বামিত্র মুণি। কৃত্তিবাসের রামায়ণে অহল্যা পাষাণীর অভিশাপ মুক্তি ঘটেছিল রামচন্দ্রের পদধূলির স্পর্শে; কিন্তু সাইদুর রহমান বয়াতীর 'সীতার বিবাহ' পালায় প্রত্যক্ষ করা যায়–রামচন্দ্রের পদধূলির এই গুণ অর্জিত হয়েছিল বিশ্বামিত্র মুণির মন্ত্রশক্তির গুণে; এমনকি সীতার বিবাহের আসরে হরধনু তোলার শক্তিও রামচন্দ্র পেয়েছিলেন বিশ্বামিত্র মুণির সেই মন্ত্রশক্তির গুণেই। এভাবেই সাইদুর রহমান বয়াতীর রামযাত্রা পালায় রামায়ণের কাহিনির নবসৃজন ঘটেছে।[৯]

Dhaka University Institutional Repository

১.২ রামকীর্তন

কীর্তনাঙ্গিকে রামায়ণ গানের পরিবেশনরীতিকে *রামকীর্তন* বলা হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের যশোর, নড়াইল, কুষ্টিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে *রামকীর্তন* অত্যন্ত জনপ্রিয়। সাধারণত বাড়ির খোলা উঠানে বা মন্দির প্রাঙ্গণে দু-চারটি পাটি বিছিয়ে, তার উপর কাঁথা মেলে *রামাকীর্তন*-এর আসর বসে। *রামকীর্তনের* মূলগায়ক সাদা পাঞ্জাবি ও লুঙ্গি পরে আসর করেন। অধিকাংশ সময় গায়ক কাঁধে সাদা রঙের উত্তরীয় ব্যবহার করেন। অপরাপর গায়ক বা দোহার, যন্ত্রীগণ দৈনন্দিন পোশাকে আসরে অংশগ্রহণ করেন। *রামকীর্তনের* আসরে বাদ্য হিসেবে মৃদঙ্গ, করতাল, হারমোনিয়াম, বাঁশি ও ঘুঙুর ব্যবহৃত হয়।

রামকীর্তনের আসরের শুরুতেই থাকে সম্মিলিত বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান। এক্ষেত্রে আসরে দাঁড়িয়ে মূলগায়েন তার পায়ে বাঁধা ঘুঙুরের ধ্বনিকে কিছু ক্ষণের জন্য মৃদঙ্গ, করতাল, হারমোনিয়াম, বাঁশির সম্মিলিত ঐক্যতানের সঙ্গে একাকার করে মিলিয়ে দেন। তারপর বসে হারমোনিয়ামটি কাছে টেনে নিয়ে ভরাট কণ্ঠে দেব-দেবী বন্দনা করেন। দেব-দেবী বন্দনার পর 'এসো রাম-সীতা' বলে রামের আগমনী গেয়ে থাকেন। এরপর একে একে তিনি গুরু স্মরণ, পিতা-মাতা স্মরণ ও দর্শকভক্তদের প্রণাম জানিয়ে মূলপালা প্রবেশ করেন।

এ পর্যন্ত সবটুকু পরিবেশনা চলে গানের সুরে সুরে। এক্ষেত্রে গীতের মধ্যে প্রতিটি চরণে চরণে বাদ্যযন্ত্রী-দোহারগণ সুরে সুরে ধুয়া গেয়ে চলেন। দোহারগণের ধুয়া গীতের আশ্রয়ে বন্দনাপর্ব শেষ করে মূলগায়েন রামকীর্তনের মূলপালাতে আখ্যানমূলক বর্ণনাত্মক গীত পরিবেশন করেন। বর্ণনাত্মক আখ্যান গীতের পর কথা বর্ণনা, সংলাপ, ব্যাখ্যা ও সেই সঙ্গে একক অভিনয় যোগে রামকীর্তনের আসর করেন। এ ধরনের আসরের সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ ভার থাকে মূলগায়কের হাতে, তাই তিনি আসরে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতা ও ভক্তদের চাহিদা অনুযায়ী পালা পরিবেশনের সময় কখনো বাড়িয়ে থাকেন, আবার কখনো কমিয়ে দেন।

সম্মিলিত বাদ্য বাদন শেষে আগমনী গান ও বন্দনা শেষ হলে মূলগায়েন রামকীর্তনের আখ্যান পরিবেশনের সূচনা করেন। যেমন :

বর্ণনাত্মক গদ্য : প্রভু রামচন্দ্রের পিতা অযোধ্যার ভূপতি একের পর এক করতে করতে নয় হাজার বছর রাজত্ব করে ইহলোক ত্যাগ করে পরলোকে গমন করেছেন। এখন তার পুত্র শ্রীরামচন্দ্র এগারো হাজার বৎসর রাজত্ব করিবেন। দশ হাজার বৎসর গত হয়ে গেছে, আর একটি হাজার বৎসর আয়ু। মৃত্যুচিন্তা তার স্মরণ হয়েছে।

রামচন্দ্রের সংলাপ : সামান্য একটি হাজার বৎসর আয়ু আমার!

বর্ণনাত্মক গদ্য : তাই অযোধ্যাতে শ্রীরামচন্দ্র আজকে প্রাতঃকালে রজনীপ্রভাতে। প্রাতঃকালে রজনী প্রভাতে অযোধ্যার ভূপতি শ্রীরামচন্দ্র ভেসে যান নয়নের জলে ॥ আজ অনুজ লক্ষ্মণ ছলছল নেত্রে গদগদ ভাবে রামচরণে প্রণাম করে বললেন—দাদা...

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্মণের গীত সংলাপ :

ও দাদা, তুমি অমন করে কেঁদো না কেঁদো না ॥
আরে কাঁদা বদন তোমার দেখতে নারি ॥
আরে তুমি কাঁদিলে আমার চোখে আসে বারি।
আরে বলো কিসের এত তোমার অভাব হল গুণমণি
বলো কিসের অভাব হল খুলে বল প্রাণ খুলে
আমি ধৈর্য ধরিতে নারি। কাঁদা বদন দেখতে নারি।
ওরে প্রাণ খুলে বলো, আমার সম্মুখে বলো। দাদা, তুমি কাঁদিলে এই জগৎ কাঁদিবে
আর কিসের এত অভাব হল বলো। কাঁদা বদন দেখতে নারি।

বর্ণনাত্মক গদ্য : আজ শ্রীরামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণকে জড়িয়ে ধরে বললেন–'ওরে, ভাই লক্ষ্মণ, আমাদের আরাধ্যদেবতা পিতা ইহলোক ত্যাগ করে পরলোকগমন করেছে বটে–অবিনশ্বর আত্মা, আত্মার মৃত্যু নেই। সেই রুহ, আজ বেহেশত বা স্বর্গের দরজায় দাঁড়িয়ে স্বপ্নযোগে-খোয়াবে আমার শিয়রে এসে বলল, 'ওরে রাম, লক্ষ্মণ-ভরত-সূত্র, চারিটি পুত্রধন পৃথিবীর বুকে থাকতে, বল তোদের পিতা হয়ে আর কতদিন আমি এমনিভাবে ব্রহ্মহত্যা পাপের বোঝা মাথায় করে বইবো। ওরে রাম, আমাকে উদ্ধার করে দে। আমার এই আত্মার উদ্দেশ্যে পারলৌকিক ক্রিয়া সমাপ্ত কর।'

গায়েনের ব্যাখ্যা : যেটা জানাজা। তবে, জানাজা শুধু সুরা জানলেই হয়তো হবে না। আত্মা সম্বন্ধে জানার বিশেষ প্রয়োজন। পাঁচ রুহ সম্বন্ধে যিনার জানা আছে, সেই ব্যক্তি দিয়ে জানাজা করলে অতি উত্তম। এটা তরিকাভুক্ত কথা। স্থূল প্রবর্ত সাধকবৃন্দের কথা।

তাই শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের কাছে যখন বললেন, তখন লক্ষ্মণ বললেন–'দাদা, আমাদের যে আছে কুল পুরোহিত, যিনি মুরশিদ গুরুদেব, তার নিকটে নিশ্চয় জানালে তিনি হয়তো সমস্ত বিধান দেবেন।'

শ্রীরামচন্দ্র বললেন–'ওরে লক্ষ্মণ, তাহলে তুমি কালবিলম্ব না করে অতিসত্বর গুরু আশ্রমে যাত্রা কর...।'

গায়েনের মুখে শ্রীরামচন্দ্রের এই কথা প্রকাশ পেতেই দোহারদের মধ্যে হঠাৎ করে সুর ওঠে :

'তবে যাও।'

আর এই সুরের মধ্যেই গায়েন গাইতে শুরু করেন লক্ষ্মণের বাক্যটিকে গানে রূপান্তরের মাধ্যমে :

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্মণের গীত সংলাপ : দাদা, তব পদধূলি দাও। চরণধূলি লয়ে শুভযাত্রা করি ॥

বর্ণনাত্মক গীত :

রামচরণে অনুজ লক্ষ্মণ অমনি প্রণামিল।
শিরে হস্তে দিয়া শ্রীরাম আমার আশীর্বাদ দিল।
লক্ষ চুম্বন দিলেন লক্ষ্মণ বদনে
আর যাত্রাকালে রামগুণ কীর্তনে লক্ষ্মণ জপে অমনি মুখে
যাত্রাকালে যেজন ভক্ত রাম নাম বলিবে মুখে
নিশ্চয় তিনি সুপথ গামী অবশ্য হইবে। তবে যাও যাও।
এমনিভাবে কীর্তন করিতে করিতে লক্ষ্মণ চলেন গুরু আশ্রমে ॥[১০]

লক্ষ্মণের গীতসংলাপের মধ্যে গায়েন বর্ণনাত্মক গীতের মাধ্যমে এভাবেই কাহিনির গতি নিয়ন্ত্রণ করেন। সেই সঙ্গে বিস্তৃত বর্ণনাকেও সম্ভব করে তোলেন।

বৃহত্তর দক্ষিণবঙ্গের বিখ্যাত কবিয়াল বিজয় সরকার ছিলেন *রামকীর্তনের* বড় মাপের একজন শিল্পী। বর্তমানে বিজয় সরকারের ধারায় সদানন্দ সরকার এবং অরুণ বিশ্বাস উক্ত অঞ্চলের *রামকীর্তনের* ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছেন। এছাড়া, কুষ্টিয়া শহর সংলগ্ন হরেকৃষ্ণপুর গ্রামে *রামকীর্তনের* বিখ্যাত শিল্পী হচ্ছেন শ্রীরামচন্দ্র মোহন্ত গোঁসাই। বর্তমানে তাঁর শিষ্য মাধব গোঁসাই নিয়মিতভাবে কুষ্টিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহে *রামকীর্তন* পরিবেশন করছেন।

১.৩ রামমঙ্গল

বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে কীর্তন ও চরিত্রাভিনয়ের মিশ্রণে পরিবেশিত রামায়ণ গানের পরিবেশনাকে *রামমঙ্গল* বলে। এই অঞ্চলে প্রচলিত রামমঙ্গলে আসরে সাধারণত ৮টি পালায় সমগ্র রামায়ণ-কাহিনি পরিবেশন করা হয়, যথা–১. দাতা হরিশ্চন্দ্র, ২. রাম-সীতার বিয়ে, ৩. লক্ষ্মণ শক্তিশেল, ৪. রাবণবধ, ৫. মস্তকস্কন্দ রাবণবধ, ৬. হনুমানের পাতাল বিজয়, ৭. সীতার বনবাস এবং ৮. লব-কুশের যুদ্ধ বা পিতা-পুত্রের পরিচয়।

আসরের শুরুতেই আসরে বসা বাদ্যযন্ত্রী ও দোহারগণ সম্মিলিত বাদন করেন। সম্মিলিত সেই বাদনের মধ্যে মূলগায়েন আসরে আসতেই বাদন থেমে যায়। এরপর বাদ্যযন্ত্রী ও দোহার দলে বসে থাকা একজন কুশীলব বেশ কয়েকটি কাঁচা ফুলের মালা হাতে উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমে একটি মালা মূলগায়েনের গলায় পরিয়ে দেন এবং একে একে আসরে অংশ নেওয়া অন্যান্য কুশীলব, বাদ্যযন্ত্রী ও দোহারদের গলাতেও তিনি মালা পরিয়ে দিয়ে আবার দোহার দলে বসে যান। এবার মূলগায়েন মূল রামায়ণ থেকে যে পালাটি *রামমঙ্গলের* আসরে পরিবেশন করেন সে সম্পর্কে ভূমিকা টানেন এবং পালা পরিবেশন শুরু করেন।

Dhaka University Institutional Repository

পালা পরিবেশনে তিনি গল্পকথনের ভঙ্গিতে বর্ণনাত্মক অভিনয় করেন। দোহারগণ মূলগায়েনের পালা পরিবেশনের মধ্যে উক্তি-প্রত্যুক্তি ও প্রশ্ন-উত্তরমূলক কথোপথনে অংশ নিয়ে আসরকে আকর্ষণীয় করে তোলেন। এছাড়া, রামমঙ্গলের আসরে চরিত্রাভিনয়ও লক্ষ করা যায়। যেমন—*অশ্বমেধযজ্ঞ বা পিতা-পুত্রের পরিচয়* পালাতে লব-কুশ চরিত্র হিসেবে দু'টি কিশোর অংশগ্রহণ করে থাকেন। এক্ষেত্রে মূলগায়েন একাধারে বর্ণনাকারী ছাড়াও একাধিক চরিত্রের ভূমিকায় অংশ নিয়ে থাকেন। *পিতা-পুত্রের পরিচয়* অংশে তিনি একই সঙ্গে রাম, শত্রুঘ্ন, লক্ষ্মণ, ভরত, বাল্মীকি ইত্যাদি চরিত্রে অভিনয় গ্রহণ করেন।

এবারে কিশোরগঞ্জ জেলার গোপালচন্দ্র মোদকের রঘুনাথ সম্প্রদায় পরিবেশিত *অশ্বমেধযজ্ঞ বা পিতা-পুত্রের পরিচয় পালার* কিছু অংশের উদ্ধৃতির ভেতর দিয়ে *রামমঙ্গলের* পরিবেশনরীতির উদাহরণ উপস্থাপন করা হচ্ছে।

গোপালচন্দ্র মোদকের রামমঙ্গলের পরিবেশনা মূলত বর্ণনাত্মক। বর্ণনার ভেতর দিয়ে তিনি যেমন আখ্যানকে এগিয়ে নিয়ে যান, তেমনি বর্ণনার ভেতর দিয়েই তিনি চরিত্রের সংলাপ ব্যক্ত করেন। এক্ষেত্রে তিনি একই সঙ্গে হয়ে ওঠেন পালার আখ্যান বর্ণনাকারী এবং পালায় বর্ণিত চরিত্রের প্রতিনিধি। এছাড়া, মূলগায়েন ও দোহার কর্তৃক প্রশ্ন উত্থাপন এবং তার উত্তর দান *রামমঙ্গল* পরিবেশনের আরেকটি বিশেষত্ব। কখনো কখনো মূলগায়েন প্রশ্ন উত্থাপন করে নিজেই সে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আখ্যানকে এগিয়ে নিয়ে যান, কখনো আবার দোহারদের একজন প্রশ্ন উত্থাপন করেন আর মূলগায়েন তার উত্তর প্রদান করে আখ্যানকে অধিকতর নাটকীয় করে তোলেন।

অশ্বমেধযজ্ঞ বা পিতা-পুত্রের পরিচয় পালা পরিবেশনে দেখা যায়—শুরুতেই মূলগায়েন গোপালচন্দ্র মোদক প্রধান চরিত্র রামচন্দ্রের দৃষ্টিকোণ থেকে আখ্যান বর্ণনা করে বলেন :

> রাম মনে মনে ভাবছেন—রাবণকে বধ করে যে আমি সীতাকে উদ্ধার করে আনলাম—সে তো ব্রাহ্মণের সন্তান। বিশ্রবামুণির পুত্র রাবণ। নিজের হাতে আমি তাকে করেছি নিধন। এই ব্রহ্ম হত্যার পাপ থেকে আমি কি কাজ করলে মুক্ত হবো।
>
> বশিষ্ঠ মুণি বলতেছে—তাহলে তুমি একটি কাজ কর প্রভু—একটা যজ্ঞ কর। একটা যজ্ঞ করলে পরে তোমার পাপটা নাশ হবে।"

এ পর্যায়ে এসে মূলগায়েন দর্শক-শ্রোতা ও দোহাদের উদ্দেশ্যে একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে নিজেই উত্তর প্রদানে আখ্যান বর্ণনা করেন:

> এই যজ্ঞটার নাম ছিল কী জানো?
>
> অশ্বমেধযজ্ঞ। এই যজ্ঞটার নাম ছিল অশ্বমেধযজ্ঞ। এই অশ্বমেধযজ্ঞের কথা শুনতে পেয়ে প্রভু রামচন্দ্র রাজা রামচন্দ্র মনে মনে ভাবলেন :
>
> আজ আমি অশ্বমেধযজ্ঞ করবো অযোদ্ধা ভুবন। তাহার সকলকে দিবো নিমন্ত্রণ।

Dhaka University Institutional Repository

এমনই বর্ণনাত্মক সংলাপের মধ্যে মূলগায়েন বর্ণনাত্মক গীত প্রয়োগ করেন। যে গীতের মধ্যে ধুয়া টেনে দোহারগণ রামমঙ্গলের পরিবেশনাকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। বর্ণনাত্মক গীতের পর মূলগায়েন আবার বর্ণনাত্মক কথার ভেতর দিয়ে পালার আখ্যান ভাগকে এগিয়ে নিয়ে যান। যেমন :

বর্ণনাত্মক গীত : ওরে দেশে দেশে করলো যত যজ্ঞের নিমন্ত্রণ ॥
আবার স্বর্গ-মর্ত্য পাতাল হইতে সর্বজন ॥

বর্ণনাত্মক গদ্য : এই রাম রাজার অযোদ্ধাতে একে একে সমস্ত দেবতাগণ আসলো—দেবীগণ আসলো—মুনিষ-ব্রাহ্মণগণ আসলো—সবাই রামচন্দ্রের যজ্ঞের আয়োজনে আজকে নিমন্ত্রণ পেয়ে সকলে আসলো। এইবার রামচন্দ্র কী কাজ করলেন—অশ্বমেধযজ্ঞ করলে পারে আমার পাপটা নাশ হবে—এই মনে করিয়া যজ্ঞের একটা ঘোড়া ছিল—যজ্ঞের একটা অশ্ব ছিল—একই কথা। এই ঘোড়াটাকে সুন্দর করে সাজন করে যজ্ঞের অশ্বের ললাটে কী লিখেছে?

দোহারদের প্রশ্ন : কী লিখেছে?

মূলগায়েনের বর্ণনা: দশরথের পুত্র রাম কমল লচন করেছে অশ্বযজ্ঞের আয়োজন। আর কী লিখেছে?

মূলগায়েনের প্রশ্নের পিঠে দোহারদের প্রশ্ন : কী লিখেছে?

মূলগায়েনের বর্ণনা : এই রামের মা সতী।

দোহাদের কথা: বাহ্! আর কী লিখেছে?

মূলগায়েনের বর্ণনা: আরও লিখেছে, এই ঘোড়াটিকে ধরিতে কারো নাহি বাধা। যে ধরে ছেড়ে দেবে

দোহারদের বাক্য পূরণ : তার বাপ হল গাধা।...

মূলগায়েনের বর্ণনা : তার বাপ হচ্ছে গাধা। সতী মায়ের পুত্র হলে ঘোড়া রাখবে ধরে।

দোহারদের বর্ণনা : অসতী মায়ের পুত্র হলে ঘোড়া দেবে ছেড়ে।

মূলগায়েনের বর্ণনা : ললাটে সেকথাটি লিখিয়া এবার শত্রুঘ্ন বীরকে পাঠালো তার রক্ষন হিসেবে—ওরে শত্রুঘ্ন ভাই আমি যে অশ্বমেধযজ্ঞের আরম্ভ করেছি—এই দিগ্বিজয় ভ্রমণ করে আসো যদি অযোদ্ধার ভুবন—আমি যজ্ঞে আহুতি দিয়ে যজ্ঞ করবো পূরণ।

এই মনে করিয়া ঘোড়াটি নিয়ে চলছেন বীর শত্রুঘ্ন। এবার শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া সেই ঘোড়াটিকে নিয়ে ভ্রমে দেশে দেশে—ছয় মাসে পর্যায় যত ফিরে অবশেষে—এই পূর্ব, উত্তর, পশ্চিম এই তিনটা দিক জয় করলেন।

বর্ণনাত্মক গীত : এবার তিন দিকও জয়ও করেছে গমনও ॥

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষিণ দিকে এসে ঘোড়া তখন দিল দর্শন ॥

বর্ণনাত্মক গদ্য : এই রামচন্দ্রের যজ্ঞের অশ্ব যখন দক্ষিণ দিকেতে গেল—সেই দিকে কোন জন ছিল? বরুণের পুত্র সেই বাল্মীকি তপোধন ছিল। দক্ষিণ দিকের মালিক কে ছিলেন?

কদলী বনের ভার ছিল তার উপরে—বাল্মীকি তপোধন। যিনি রত্নাকর দস্যু ছিলো—রাম নামেতে বাল্মীকি মুণি হল। এই বাল্মীকি মুণি ধ্যান করে জানতে পেরেছে—রামচন্দ্রের একটা অশ্ব এসেছে যজ্ঞের একটা ঘোড়া এসেছে তার এই বনেতে। মনে মনে মণি গোঁসাই ভাবলো তখন এই বনেতে হবে একটা যুদ্ধের আয়োজন। এই চিন্তা করিয়া মণি-ঠাকুর কী করলো জানেন? এই সীতার দু'টি ছেলেকে ডাকতেছে।

বাল্মীকি চরিত্রে মূলগায়েন উচ্চস্বরে ডাকতে থাকেন লব-কুশকে—'দাদু ভাই। ওরে দাদু ভাই।'

এ সময়ে খালি গায়ে ধুতি পরিহিত দু'টি কম বয়েসী বালক অভিনেতা 'আসছি' বলে আসরে আসে। তারা লব-কুশ বেশে আসরে আসতেই বাল্মীকি চরিত্রে মূলগায়েন বলেন—'শুনো শুনো।' শুধু তাই নয়, তিনি (মূলগায়েন) আসরে উপস্থিত বালক অভিনেতাদ্বয়কে ইঙ্গিত করে বর্ণনাত্মক গদ্যে আখ্যানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন :

সীতার এই সন্তান লব-কুশী। লব আর কুশ সীতার সন্তান মুণির কাছে পৌঁছে গেলেন। ওই যে হল লব আর সে হল কুশী। এই লব-কুশকে তখন কী কাজ করলেন? যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে মণি-ঠাকুরে ডেকে ডেকে বলছে :

বাল্মীকি : দাদু ভাই শুনছো?

লব/কুশী : বলেন।

বাল্মীকি : আমার এই কদলীবন দেখতে পাচ্ছো।

লব/কুশী : হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি।

বাল্মীকি : তোমরা এই কদলীবন ভ্রমণ করবে। আমি কিন্তু চিত্রকূট পর্বতে চলে যাবো তপস্যা করার জন্যে—যতদিন পর্যন্ত না আসিবো এই কদলীবনে তোমরা রক্ষা করবে দুইজনে—পারবে তো?

লব/কুশী : পারবো।...

বাল্মীকি : বেশতো। আমি তোমাদের কিছু ধনুর্বাণ দিয়ে যাচ্ছি। সংলাপের মধ্যে দোহারদলের ভেতর থেকে ধনুর্বাণ সংগ্রহ করে লব-কুশীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে এবার বলেন—ধরো দেখি। এই ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে সর্বত্র করিবে ভ্রমণ—পশু-পাখি তাড়াবে—কেমন! কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদ করবে না।

Dhaka University Institutional Repository

বাল্মীকির ভূমিকায় মূলগায়েনের এমন কথার মধ্যে দোহারদের একজন হঠাৎ লব-কুশীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে মূলগায়েনকে বলেন—'না কিচ্ছু করবে না। ওরা বালক ভালা আছে।'[১১]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে বর্ণনাত্মক কীর্তনাঙ্গিকের প্রভাব বেশি। তবে, তার সঙ্গে সংলাপাত্মক চরিত্রাভিনয় ও বর্ণনাত্মক গীতাভিনয়ের মিশ্রণে এই পরিবেশনরীতিটি হয়ে ওঠে চরিত্রাভিনয়মূলক নাট্যের মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ ও আকর্ষণীয়। এ ধরনের আসরে, চরিত্রাভিনয়ের সময় মূলগায়কই প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকেন। চরিত্রাভিনয়ের প্রয়োজনে মূলগায়েন তাঁর বর্ণনাত্মক অভিনয়ের মধ্যে বাদ্যযন্ত্রী ও দোহার দলে রাখা অভিনয় উপকরণ সংগ্রহের মধ্য দিয়ে পালায় বর্ণিত কোনো একটি চরিত্র ধারণ করেন। তারপর তিনি উক্ত চরিত্রের সংলাপের মাধ্যমে কৌশলে অন্যান্য চরিত্রদেরকে মঞ্চে স্বাগত জানান, সাথে সাথে নেপথ্য থেকে তার সে সংলাপের উত্তর শোনা যায় এবং পরমুহূর্তে ঘটনায় বর্ণিত চরিত্র বা চরিত্রগণ তাদের অভিনয় উপকরণসহ মঞ্চে প্রবেশ করেন। এবার তাদের সঙ্গে মূলগায়েনের সংলাপাত্মক চরিত্রাভিনয় শুরু হয়। সংলাপাত্মক সেই অভিনয়ের মধ্যে এক পর্যায়ে আঙ্গিক অভিনয়ের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তখন তারা আঙ্গিক অভিনয় করে কোনো একটি ঘটনাকে বাস্তব সম্মত করে তোলেন এবং তার ভেতর দিয়ে নতুন একটি ঘটনার বীজ রোপিত হয়। মূলগায়েন তাই চরিত্রাভিনয়ের ভেতর থেকে বর্ণনাত্মক অভিনয়ের সূত্রপাত করে চরিত্রাভিনয়ে অংশ নেওয়া কুশীলবদেরকে প্রস্থানের সুযোগ করে দেন। তারা প্রস্থান করতেই মূলগায়েন বর্ণনাত্মক গদ্য ও গীতাভিনয়ের মাধ্যমে পালার আখ্যানভাগকে কিছু দূর এগিয়ে নিয়ে নতুন আরেকটি ঘটনার অবতারণা করেন এবং পুনরায় চরিত্রাভিনয়ের একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। এরপর একই ভাবে শুরু ও শেষ হয় চরিত্রাভিনয়। আর এভাবেই বারবার বর্ণনাত্মক অভিনয়ের সঙ্গে চরিত্রাভিনয়ের মিশ্রণে *রামমঙ্গলের* এক একটি পালা পরিবেশন করা হয়।

বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে *রামমঙ্গলের* বেশ কয়েকটি দল রয়েছে। গোপালচন্দ্র মোদকের রঘুনাথ সম্প্রদায় ছাড়াও ক্ষেত্রপাল, রুহিদাস, হেমচন্দ্র প্রমুখের *রামমঙ্গলের* দল প্রায় নিয়মিতভাবে বিভিন্ন পূজা-পার্বণ, শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে এবং অন্যান্য কিছু মানতে আসর করেন। এছাড়া, নওগাঁ জেলাতেও *রামমঙ্গলের* পরিবেশনা প্রচলিত আছে বলে জানা যায়, এই জেলার বিখ্যাত গায়ক হলেন অজিত ঘোষ। তিনি সাধারণত *রামমঙ্গলের* আসরে *সীতা বিয়ে* ও *অশ্বমেধযজ্ঞ পালা* পরিবেশন করেন।

১.৪ রামলীলা

বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট অঞ্চলে কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ অবলম্বনে কীর্তনাঙ্গিকের পরিবেশনের নাম *রামলীলা*। মূলত পদাবলি কীর্তনের ধারায় *রামলীলা* অভিনীত হয়। অধিকাংশক্ষেত্রে মন্দিরে সামনেই *রামলীলার* আসর করা হয়। আসরের জন্যে ১২ থেকে ১৫ ফুট বর্গাকার স্থানে ভূমি সমতল থেকে এক-দেড় ফুট উঁচু মাটির বেদি প্রস্তুত করে *রামলীলার* মঞ্চ নির্মিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

*রামলীলা*র মূলগায়ক এবং বাদ্যকর-দোহারগণ তেমন কোনো সাজসজ্জা গ্রহণ করেন না। তবে, আসরে পবিত্রতা রক্ষার স্বার্থে তারা দৈনন্দিন জীবনের পোশাকের পরিবর্তে মঞ্চে ওঠার আগে পরিষ্কার পোশাক পরিধান করে থাকেন। *রামলীলা* পরিবেশনের জন্য মূলগায়ক সাধারণত সাদা রঙের ধুতি ও হাফহাতা গেঞ্জি পরিধান করে থাকেন। এছাড়া, কাঁধে তিনি গেরুয়া রঙের একটি হরি নামের উত্তরী ঝুলিয়ে–তার উপর হালকা গোলাপি রঙের একটুকরা বস্ত্র দিয়ে চাদর বা ওড়নার মতো দেহের উপরের অংশ আবৃত রাখেন আর কোমরবন্ধনী হিসেবে কমলা রঙের একটুকরা লম্বা বস্ত্র ব্যবহার করেন।

আসরের অন্য কুশীলরদের মধ্যে খোল, হারমোনিয়াম, করতাল, বেহালা, বাঁশি, দোতরা বাদক এবং দোহারগণ সাদা রঙের ধুতির সঙ্গে একই রঙের পাঞ্জাবি, গেঞ্জি বা জামা পরিধান করে থাকেন।

অভিনয় উপকরণ হিসেবে মূলগায়েন তার হাতের চামরকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে থাকেন। রাম ও রাবণের যুদ্ধের বর্ণনাত্মকগীতের অভিনয়ে গায়ক চামরকে এক বাহুর সাহায্যে ধনুকের তীরের মতো সামনে এগিয়ে ধরে অন্য বাহুটি বুকের কাছে নিয়ে তীর ছেড়ে দেবার আগমুহূর্তের টান টান উত্তেজনা প্রকাশে যখন দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে নেচে নেচে চারদিকে মুখ করে ঘুরতে থাকেন তখন চামরটি যেন সত্যি সত্যি একটি তীর হিসেবেই দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়। তবে, *রামলীলা*র পরিবেশনাতে রাম-রাবণের যুদ্ধের চেয়ে সীতার দুঃখকথাই অধিক গুরুত্ব পেয়ে থাকে বলে মূলগায়ককে অধিকাংশক্ষেত্রে সীতার ভূমিকায় গায়ে আবৃত হালকা গোলাপি রঙের বস্ত্রকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করতে দেখা যায়।

*রামলীলা*র আসরে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে সাধারণত খোল, হারমোনিয়াম ও করতাল ব্যবহার করা হয়। এছাড়া, কিছু কিছু আসরে বেহালা, বাঁশি, দোতরা, এমনকি কর্নেটও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

এ ধরনের পরিবেশনা মূলত কীর্তন আঙ্গিকের এবং তা একক গায়ক নির্ভর। তবে, বিভিন্ন চরিত্রের আবেগময় অভিনয়ের সময় এই গায়ককে কখনো কখনো আসরে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য কুশীলবদের মধ্যে দোহার ও বাদ্যকরদের মধ্যে খোল বাদকদের কাউকে কাউকে জড়িয়ে ধরতে ও আলিঙ্গন করতে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, কখনো আবার আসরে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের কেউ অভিনয়ের ভক্তিভাবে মুগ্ধ হয়ে মঞ্চে উঠে এলে গায়ক তাদেরকেও জড়িয়ে ধরে অভিনয় উপস্থাপন করেন।

এ ধরনের পরিবেশনের শুরুতে মূলগায়েন আসরে আসার আগেই বাদ্যযন্ত্রীগণ এসে আসন গ্রহণ করেন। তারপর মূলগায়েন আসরে এসে *রামলীলা* পরিবেশনের জন্যে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নেন এবং মূলপালা পরিবেশনের আগে বাদ্যযন্ত্রীদের মৃদঙ্গ, করতাল, হারমোনিয়াম, বাঁশি ও বেহালা বাদনের মধ্যে 'হরি বোল' ধ্বনি তুলে প্রার্থনামূলক একটি কীর্তনগান পরিবেশন করেন।

এরপর বাদ্যযন্ত্রীগণ দীর্ঘক্ষণ ধরে একটি সম্মিলিত বাদ্য বাদনের মধ্য দিয়ে রামলীলার মূলপর্ব শুরু করার ক্ষেত্র রচনা করেন। সম্মিলিত সেই বাদ্য বাদনের পর শুরু হয় বন্দনাগীত। এক্ষেত্রে বাদ্যযন্ত্রীদের সঙ্গে বসে বসেই মূলগায়েন বন্দনাগীত পরিবেশন করেন। বন্দনা শেষে মূলগায়েন চারদিক ঘুরে ঘুরে দর্শকদেরকে সষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে ঘুরে রামলীলা পরিবেশনা প্রসঙ্গে কিছু কথা বলেন।

Dhaka University Institutional Repository

মূলগায়েন সচারাচার একাই বর্ণনাত্মকরীতিতে *রামলীলার* আখ্যান বর্ণনা, ব্যাখ্যা, সংলাপ, নৃত্য, গীত ও অভিনয় পরিবেশন করেন। তবে, গীত ও নৃত্য অংশে বাদ্যযন্ত্রীগণ বাদ্য বাজিয়ে এবং দোহারগণ দোহারকি করে তাকে সহযোগিতা করেন।

এ ধরনের রামলীলার আখ্যান পরিবেশনের সবচেয়ে বড় যে আকর্ষণ থাকে মূলগায়েনের বিভিন্ন ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ। যেমন–সীতা রাবণকর্তৃক অপহৃত হবার পর লঙ্কায় অশোক কাননে বন্দি ছিল। এক্ষেত্রে গায়েন অশোক কানন সম্পর্কে বলেন–'যেখানে বাস করলে কোনো শোক নেই তাই অশোক কানন।'

এছাড়া, অন্যান্য বহু প্রসঙ্গের মধ্যে নারী সম্পর্কে এক ব্যাখ্যায় বলেন–'নারীর এক নাম গৃহলক্ষী। আরেক নাম গৃহরক্ষী।' এ ধরনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে গায়েন রামলীলার আখ্যান এবং সাধারণ মানুষের চলমান জীবনকে একসঙ্গে মিলিয়ে দেখান। এতে করেন রামলীলার আখ্যান মুহূর্তের মধ্যে হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষের জীবনকথা।

মূলগায়েন অভিনয় উপকরণ হিসেবে উত্তরীয়কে ব্যবহার করে কখনো হয়ে ওঠেন নারী সীতা, কখনো হয়ে ওঠেন ওঝা। তবে, রামলীলায় বাচিক অভিনয় মুখ্য ভূমিকায় থাকলেও কখনো কখনো আঙ্গিক অভিনয় করতে দেখা যায়।[১২]

এক সময় কুড়িগ্রাম-লালমনিরহাট অঞ্চলে রামলীলার অনেক গায়ক শিল্পী ছিলো। এখন এর শিল্পীদের সংখ্যা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে উক্ত অঞ্চলে রামলীলার জনপ্রিয় ও প্রধান গায়কদের মধ্যে কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট থানার চতুরা গ্রামের কৃপাসিন্ধু রায় সরকার, উলিপুর থানার কদমতলার সুকচরণ রায় প্রমুখ প্রসিদ্ধ।

১.৫ ভোজপুরী রামায়ণ

রামায়ণের জনপ্রিয় রচয়িতা তুলসী দাস খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথম পর্বে ভারতের উত্তর প্রদেশে জন্ম নেন। তিনি ব্রজভাষা ও অবধীভাষাকে সুন্দর ও সার্থকভাবে *রামায়ণ*-কাব্যের বাহন করে তুলেছেন। তুলসীদাসের *রামায়ণের* ভাষাকে ভোজপুরী-হিন্দি ভাষা বলা হয়। বাংলাদেশের মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল থানার ভুড়ভুড়িয়া, কাকিয়াছরা চা-বাগানের ভোজপুরী জনগোষ্ঠীর কিছু শ্রমিক নিয়মিত আসর আকারে তুলসীদাসী *রামায়ণকে* গান আকারে পরিবেশন করেন।[৫]

তুলসীদাসের রামায়ণের মূল নাম 'রামচরিতমানস'। বাংলা গদ্যে ও পদ্যে এই *রামচরিতমানসের* অন্তত তেরো-চৌদ্দটি অনুবাদ হয়েছে। পঞ্চদশ শতকের শেষপাদে রচিত তুলসীদাসের *রামায়ণ* রবীন্দ্রনাথকেও বিশেষভাবে আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধাশীল করেছিল। সে কথা তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করেছেন :

> তুলসীদাস তাঁর রামচরিতের উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন বাল্মীকি রচনা থেকে; কিন্তু সেই উপকরণকে তিনি সম্পূর্ণ নিজের ভক্তিতে রসসমৃদ্ধ করে নতুন করে দান করেছন। সেইটেই তার নিজস্ব দান–পুরাতনের আবৃত্তি নয়, তাতে তাঁর যথার্থ প্রতিভার প্রকাশ পেয়েছে। তিনি নতুন দৃষ্টি

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে সেই পুরাতন উপকরণকে নতুন রূপ দান করে পরিবেশন করেছেন সমস্ত দেশকে। ভক্তি দ্বারা যে ব্যাখ্যায় তিনি রামায়ণকে নতুন পরিণতি দিয়েছেন সেটা সাহিত্যে অসাধারণ দান।[১৩]

পঞ্চদশ শতকের শেষপাদে রচিত এই *রামায়ণ* বর্তমান বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট জেলার শ্রীমঙ্গল, হবিগঞ্জ, জাফলং ইত্যাদি অঞ্চলের বিভিন্ন চা-বাগানে বসবাসরত ভোজপুরী জনগোষ্ঠীর শ্রমজীবী মানুষ পাঠ্যগীত আকারে পরিবেশন করে থাকেন। এ ধরনের *রামায়ণ* পরিবেশনকারী দলের প্রধান বা দলমালিককে *রামায়ণ* গানের চকিদার বলে অভিহিত করা হয়। শ্রীমঙ্গলের ভুড়ুভুড়িয়া চা-বাগানের *ভোজপুরী রামায়ণ গানের* চকিদার হচ্ছেন কানাই রিকিয়াশন। আসলে, কেউ এই রামায়ণ গানের আয়োজন করতে চাইলে তাকে এই চকিদারের মাধ্যমেই দাওয়াত দিতে হয়।

সারা বছরের অধিকাংশ রাতেই ভোজপুরীরা এ ধরনের *রামায়ণ গান* গেয়ে থাকেন। পরিবেশনের কোনো সুনির্দিষ্ট সময় সীমা থাকে না, কখনো ঘণ্টাখানেক ধরে এই 'রামায়ণ গান' পরিবেশিত হয় আবার কখনো-বা সারা রাত ধরে। চা-বাগানের শ্রমিকদের ভেতর এই গান প্রচলিত বলে সাধারণত তা রাতের বেলাতেই গাওয়া হয়ে থাকে। এই রামায়ণ বিভিন্ন মানতে ভোজপুরী ভক্তদের বাড়িতে পরিবেশিত হয়।

সাধারণত ঘরের মেঝেতে কয়েকটি পাটি বিছিয়ে *ভোজপুরী রামায়ণ* গানের আসর করা হয়। আসরের একদিকে থাকে রাম-সীতা ও হনুমানজীর প্রতিকৃতি। আর আসরের মাঝখানে ধূপকাঠি বা আগরবাতি জ্বালিয়ে রাখা হয়। ঘরে বা মন্দির প্রাঙ্গণে যেখানেই এ ধরনের রামায়ণের আসর হোক না কেন সেখানে তেমন কোনো আলোর ব্যবস্থা থাকে না। সাধারণত একটিমাত্র কেরোসিন প্রদীপের আলোতে এ ধরনের আসর বসে। জ্বলন্ত প্রদীপটিকে কাঠের পাত্র (রেহেল)-এর সামনের দিকে উঁচু একটি কাঠের বেলকো বা পাটাতনের উপর স্থাপন করা হয়। আর সে আলোতে তুলসীদাসী রামায়ণের মুদ্রিত পৃষ্ঠা যতটুকু আলোকিত হয় তাতেই আসর চলে। রামায়ণের এ ধরনের পাঠ্যগীতি মূলত ঢোল, হারমোনিয়াম, করতাল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে হাতে তালি দিয়ে পরিবেশিত হয়।

চা-বাগানের ভোজপুরী জনগোষ্ঠী তাদের আরাধ্য দেবতা বিষ্ণুদেবের মন্দিরের সামনে অথবা বাড়ির উঠানে রামচন্দ্র বা বিষ্ণুদেবের ছবি বা মাটির মূর্তি নিয়ে গায়েন, দোহার ও বাদ্যকরগণ গোল হয়ে বসে এ ধরনের রামায়ণ গানের আসর করে থাকেন। কখনো কখনো বসতবাড়ির কোনো একটি ফাঁকা ঘরের মধ্যেও এ ধরনের আসর বসে থাকে।

ভোজপুরী রামায়ণের পরিবেশনরীতি দেখা যায়, একজন গায়ক কাঠের পাত্রের (রেহেলের) উপর তুলসীদাসী রামায়ণের মুদ্রিত পুঁথি খুলে তা দেখে দেখে সঙ্গীতের তালে-সুরে গাইতে থাকেন। এ সময় তার রামায়ণ গানের সঙ্গে সহযোগী গায়ক হিসেবে আরেকজন গায়ক হারমোনিয়ামে সুরে ধুয়া গীত শুরু করেন। তার সেই ধুয়া গীতের সঙ্গে সমস্বরে কণ্ঠ মেলান আসরে উপস্থিত অন্যান্য দোহার-বাদ্যকারগণ। পুরো পরিবেশনাতে কমপক্ষে চারজন দোহার এবং দুইজন বাদ্যকার ঢোলক ও করতাল বাদন করেন। আসলে ঢোলক ও করতালের তালের বিভিন্ন লয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গায়ক-দোহারগণ হাতে তালি দিয়ে আকুল কণ্ঠে রামায়ণ গান পরিবেশন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

এ ধরনের পরিবেশনে সাধারণত তাল ধীর লয় থেকে ক্রমাগত দ্রুত লয়ে প্রবেশ করে থাকে। তাই পাঠ্যগীতিমূলক পরিবেশনা হলেও এর তীব্রতা ক্রমাগত বেড়ে চলে এবং দর্শক-শ্রোতাদের কাছে তা অনেকটাই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এর গানের ভাষা ভোজপুরী। আর আসরে তুলসীদাসী রামায়ণের উত্তরকাণ্ড-এর পরিবেশনে বেশি করা হয়। যার কাহিনিতে থাকে—শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বধ করে বিভীষণকে রাজ্য দিয়ে লঙ্কা থেকে সুগ্রীব, হনুমান, অঙ্গদ ইত্যাদি সৈন্য সামন্ত নিয়ে অযোধ্যায় প্রবেশ করছেন।

ভোজপুরী রামায়ণ পরিবেশনের জনপ্রিয় অন্তরা হচ্ছে :

রাতা ছাড়ি রঘু নন্দনও আওয়াতু হে।
কআলামউ থাকি দর্শনও করি আও।
এই রঘু নন্দনও আওয়াতু হে।
এই জয়ও জয়ও জয়ও ভারতি জয়ও।
এই রামচন্দ্র কি জয়।
চন্দ্রবংশী কি—জয় ॥
ধর্ম রাজা বলি কি—জয়।
শঙ্কর ভগবান কি—জয়।
মহাদেবী কালী কি—জয়।
হরি বোল—বোল ॥[১৪]

শ্রীমঙ্গল অঞ্চলের ভোজপুরী *রামায়ণে*র প্রধান দুইজন শিল্পী হলেন—ভুড়ভুড়িয়া চা-বাগানের মুরারী নোনীয়া ও কাকিয়াছরা চা-বাগানের হরিপ্রসাদ বীণ। এ দু'টি চা-বাগানের অন্যান্য গায়ক হলেন—রামপ্রসাদ পাশী শ্যামল রিকিয়াশন, গোপেশ রিকিয়াশন, মোহন পাশী, অনুপ পাশী, বাসুদেব পাশী, গুরুপ্রসাদ রজক, দশরথ রবি দাস।

এছাড়া, হবিগঞ্জের রশিদপুর চা-বাগান, সিলেট জাফলং চা-বাগানেও রামায়ণ পাঠ ও তার গীত অভিনয় হয়ে থাকে। চা-বাগান ছাড়াও বাংলাদেশের শহরাঞ্চলেও তুলসীদাসী *রামায়ণ* পরিবেশিত হয়ে থাকে। বিশেষ করে ঢাকা, কুষ্টিয়া ইত্যাদি শহরে বসবাসরত হরিজনরা নিয়মিতভাবে এই *রামায়ণ* পরিবেশন করেন।

২. ধ্রুপদী মহাকাব্য মহাভারত ও তার ভক্তিবাদী চরিত্রের মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান

কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস রচিত ধ্রুপদী মহাকাব্য মহাভারতের কাহিনি সর্বভারতীয় অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। যদিও এই মহাকাব্যের একক রচয়িতার নাম পাওয়া যায়। কিন্তু একথা মনে রাখা প্রয়োজন সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই মহাকাব্য রচনার পেছনে তাঁর পূর্ববর্তী আরও বহু কবির ঋণ স্বীকৃত। সংস্কৃত ভাষার এই কাব্যটির প্রসিদ্ধি বাংলাদেশেও কম নয়। কিন্তু তা সংস্কৃত ভাষার গুণে নয়, বাংলা ভাষাতেও মহাভারতের কাহিনি রচিত হয়েছে। কাশীরাম দাস সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় মহাভারত রচনা করেন। তিনি সংস্কৃত ভাষার সমগ্র মহাভারতের আখ্যানকে মাত্র চারটি পর্বে (আদি, সভা, বন ও বিরাট) বিভক্ত করে বাংলায় রচনা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

কাশীরাম দাসের হাতে মহাভারতের বিরাট পর্বের রচনাকাল ১৬০৪ খ্রিষ্টাব্দ বা ১৬০৫ খ্রিষ্টাব্দ। তাঁর মৃত্যুর পর ভ্রাতুষ্পুত্র 'নন্দরাম' এবং অন্য কয়েকজন কবি সমগ্র কাব্যকে সম্পূর্ণতা দান করেন। এর ফলে তা 'মহাভারত সংহিতা'র রূপ লাভ করে।

মহাভারত প্রধানত পাঠ্য কাব্য, দর্শক-শ্রোতাবেষ্টিত আসরের সামগ্রী। প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাজসভায় পুরাণ-পাঠের অংশ হিসেবে মহাভারত পাঠ করা হত। এই পাঠ থেকে 'পাঠক' কথাটা ক্রমে 'পদবী' হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে একই অর্থে 'কথক' কথাটাও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কথকঠাকুর—যিনি মহাভারত বা পুরাণাদি পাঠ করেন। এ ধরনের পাঠকে 'কথকতা'ও বলা হয়ে থাকে। 'কথকতা' সকল কালেই একটি বিশিষ্ট শিল্পরীতি হিসেবে স্বীকৃত। আধুনিক কালে পাঠ-অভিনয় নাট্য পরিবেশনের একটি স্বীকৃত পন্থা।[১৫]

অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত মহাভারত কথকতার ধারাতেই বিকশিত হয়েছে, কিন্তু পাঁচালির ধারায় এর নানা উপাখ্যানের রূপান্তর দেখা যায় উনিশ শতকে। দাশরথি 'মহাভারতে'র বিভিন্ন প্রসঙ্গ তাঁর পাঁচালি-রীতিতে পরিবেশন করেছিলেন। এ ধরনের পাঁচালির মধ্যে আছে 'রুক্মিণীহরণ', 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' ইত্যাদি।[১৬] এর মধ্যে 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' পালাটি বর্তমানে সুনামগঞ্জ জেলায় ঢপযাত্রার আঙ্গিকে পরিবেশিত হয়ে থাকে। মাঠ সমীক্ষণে দেখা যায়, রামায়ণের আখ্যান পরিবেশনের মতো মহাভারতের আখ্যান পরিবেশনা তেমনটা জনপ্রিয় না হলেও এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এর আখ্যাননির্ভর কিছু কিছু নাট্য-ঐতিহ্য প্রচলিত।

বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট জেলার সুনামগঞ্জের বাঙালি হিন্দু ও মৌলভীবাজারের অবাঙালি মৈতৈ মণিপুরী সম্প্রদায়ের মহাভারতের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের অস্তিত্ব রয়েছে। বাঙালি হিন্দুরা কাশীরাম দাসের মহাভারতের আখ্যান অবলম্বনে পাণ্ডুলিপি রচনা করেছেন এবং তা ঢপযাত্রার আঙ্গিকে আসরে পরিবেশন করেন। ঢপযাত্রার আঙ্গিকে পরিবেশিত মহাভারতের সর্বাধিক জনপ্রিয় পালা হচ্ছে—'দাতাকর্ণ'। পাশাপাশি 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' পালাটিও কম জনপ্রিয় নয়।[১৭] উল্লেখ্য, মহাভারতের আখ্যান উপস্থাপনে মহাভারতে উল্লিখিত কেন্দ্রীয় চরিত্রসমূহের জাতিভেদ প্রথা এবং অপরাপর কিছু চরিত্রের আদর্শগত পরিচয় ঢপযাত্রার আসরে উপস্থাপন করা হয়, যার ভেতর দিয়ে ধ্রুপদী মহাকাব্য মহাভারতের সামগ্রিক আখ্যান ও চরিত্র সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত লভ্য।[১৮] তাই আসরে একটি নাটকীয় ঘটনা সংঘটিত হয়, আর তা হল—গায়ক-অভিনেতাদের সামান্য ইঙ্গিতে আসরের দর্শক-শ্রোতাগণ পূর্বাভিজ্ঞতা বা বংশপরম্পরায় শ্রুত আখ্যানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠেন এবং নিজেদের সৃজনশীল অভিজ্ঞতায় পুরো মহাভারতের আখ্যান অন্তরচোখে অবলোকন করতে সক্ষম হন।

২.১ ঢপযাত্রার আঙ্গিকে মহাভারত

বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ অঞ্চলে সাম্প্রতিক কালে ঢপযাত্রার আঙ্গিকে মহাভারতের কিছু হৃদয়স্পর্শী ঘটনাকে পরিবেশিত হয়ে থাকে। তবে, ঢপযাত্রার আঙ্গিকে মহাভারতের আখ্যান পরিবেশনের প্রাচীনত্ব সম্ভবত খুব বেশি দিনের পুরানো নয়। কেননা, কৃষ্ণকীর্তনের আখ্যাননির্ভর ঢপকীর্তন থেকে ঢপযাত্রার উদ্ভব হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য, যশোরের মধুসূদন কানের অবদানে ঢপকীর্তন প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। আর প্রসিদ্ধ পালাকার ও গায়ক রূপচাঁদ চাটুয্যে (১৭২২-১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দ) মনোহরসাহী কীর্তনাঙ্গের গান থেকে বিশেষ ধরনের চটুল গান হিসেবে 'ঢপ' বা 'ঢপগান'-এর উদ্ভব ঘটান, যা পরবর্তী সময়ে ঢপকীর্তন নামে আখ্যাত হয়।[১৯] আদিতে এই ঢপকীর্তনের আসরে কৃষ্ণকাহিনি পরিবেশিত হলেও ঢপকীর্তন থেকে উদ্ভূত ঢপযাত্রা'র আসরে কৃষ্ণকাহিনি ছাড়াও বাংলার জনপ্রিয় আখ্যানকাব্য *মহাভারত*, *রামায়ণ*, *মনসামঙ্গল*, এমনকি স্থানীয় কিছু লোকপুরাণের কাহিনি মঞ্চস্থ হতে শুরু করে।

ঢপযাত্রার আসরে সাধারণত সংলাপাত্মক অভিনয়ের আধিক্য দেখা গেলেও তাতে গান ও নাচের ব্যবহার দেখা যায়। সাধারণ যাত্রার আসরের মতো ঢপযাত্রার আসরেও লিখিত পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে অভিনয় মুহূর্তে যাত্রার আসরের মতোই মঞ্চের এক পাশে বসে একজন প্রম্পটারকে লিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে প্রোম্পট করতে দেখা যায়।

আসরের শুরুতেই নির্ধারিত পালার কেন্দ্রীয় চরিত্র মঞ্চে আগমন করেন এবং নিজ চরিত্রের পরিচয় জ্ঞাপনকারী একটি আত্মবিবরণমূলক বর্ণনাত্মক দিয়ে তিনি মঞ্চ থেকে প্রস্থান করেন। এরপর পালা পরিবেশনের বন্দনা বা প্রার্থনা পর্ব উপস্থাপন করা হয়। এ পর্বে একজন অভিনেতার প্রার্থনাবাণীর মধ্যে দশভূজা মা-দুর্গার আবির্ভাব ঘটে, তার সঙ্গে একে একে মঞ্চে এসে জোটে অসূর, বাঘ, গনেশ ইত্যাদি চরিত্র। তারা মঞ্চে এসে শারদীয়া দুর্গাপূজার রূপ ধারণ করে। এই দুর্গামূর্তি চারদিক অবস্থান নেওয়া দর্শকের দিকে ঘুরে ঘুরে তার রূপ দর্শন করাতে থাকে। এরপর সদল-বলে দুর্গামূর্তি প্রস্থান করলে মূল পালা শুরু হয়। তবে, ঢপযাত্রার আসরে মহাভারতের আখ্যান পরিবেশনে সংলাপাত্মক অভিনয়ের রীতিই অধিক প্রচলিত।

এবারে সুনামগঞ্জের শাল্লা থানার ডুমরা গ্রামের দেবী সোমেশ্বরী সম্প্রদায় পরিবেশিত ঢপযাত্রার মহাভারতের আখ্যাননির্ভর জনপ্রিয় একটি পালা *দাতা কর্ণ*-এর একটি দৃশ্যের উদ্ধৃতি :

"*বর্ণনাত্মক সংলাপ*—কর্ণ :

> আমি হীন সুতপুত্র বলে কেউ আমাকে সম্মান দিতে চায় না। তবে এমন কাজ আমি করে যাব যাহাকে আমার দাতা নাম, চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে বিখ্যাত সংসারে। আমি দানের অপচয় করব না। যে যাহা চায় অকাতরে অম্লান বদনে আমি তা দান করে যাব। কোনরূপ দ্বিধাবোধ করব না। তাই আমি দেখতে চাই দানের কি মহিমা।

প্রার্থনা : (হাত জোড় করে—)

> ওগো দয়াল গুরু কৃপাসিন্ধু, আমি হীনকুলে জন্মেছি বলে সবাই আমাকে ঘৃণা করে। ওগো সৃষ্টিকর্তা আমাকে সেই শক্তি দাও যাহাতে জগৎ পূজ্য হতে পারি।
> যা দেবী সর্ব ভূতে শক্তি রূপেন সংস্তিতা
> নমোস্তস্যঃ নমোস্তস্যঃ। নমোঃ নমোঃ

Dhaka University Institutional Repository

ব্রাহ্মণ বেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ : হরে মুরারে মধু কৈঠ বারে
গোপাল গোবিন্দ মুকন্দ স্বরে
জয় জগদিস্বর হরে।
মহারাজ কর্ণের জয় হোক।

কর্ণ : কে আপনি ব্রাহ্মণ? কি হেতু আগমন আপনার এই অধীনের আলয়ে।

শ্রীকৃষ্ণ : মহারাজ কর্ণ। আমি কাল একাদশী করে আজ পারণার তরে তব ভবনে আগমন করেছি। তুমি কি আমাকে পারণা দিতে পারবে।

কর্ণ : এতো আমার পরম সৌভাগ্য। আপনার মত পরম পবিত্র সুখী ব্রাহ্মণ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। বলুন কি চাই আপনার?

শ্রীকৃষ্ণ : মহারাজ, আমি যে দ্রব্য দ্বারা পারণ করতে চাই, তুমি কি তাহা দিতে পারবে?

কর্ণ : দয়া করে বলুন ব্রাহ্মণ, দ্রব্যগুলো কি কি?

শ্রীকৃষ্ণ : তবে শুন মহারাজ কর্ণ। সেই দ্রব্যগুলো বলে দিচ্ছি।

গান/গীত সংলাপ/বর্ণনাত্মক গীত :

শুন শুন মহারাজ করি নিবেদন। মাংস বিনে না হইবে আমারও ভোজন। মাংস বিনে হবে না ভোজন। মনের আশা কর পূরণ।

কর্ণ : মাংস–তার জন্য কোনো চিন্তা নেই ব্রাহ্মণ, ছাগ, হংস, মেষ–যে মাংস আপনার রুচিসম্মত, আমি সেই মাংস এনে দিব আপনাকে।

শ্রীকৃষ্ণ : তবে শুন মহারাজ যে মাংস আমার প্রয়োজন।

গান/গীত সংলাপ/বর্ণনাত্মক গীত :

আমাকে পারণা দিতে যদি থাকে মনে। তোমাদেরও প্রিয় মাংস দিবায় যতনে। মনানন্দে করব ভোজন। হবে আমার বাঞ্ছা পূরণ।

কর্ণ : বলুন ব্রাহ্মণ কি মাংস দিয়ে আপনি পারণা করবেন। সেই মাংসই এনে দিব।

শ্রীকৃষ্ণ : মহারাজ কর্ণ অনেক স্থান ভ্রমণ করেও আমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারলাম না। তাই তোমার ভবনে আসতে বাধ্য হয়েছি। যে মাংস আমার প্রয়োজন সে মাংস তোমার কাছে আছে কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে।

কর্ণ : কোন সন্দেহ নেই ব্রাহ্মণ।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীকৃষ্ণ : তবুও আমার মনে হয়—যদি সত্য কর।

কর্ণ : সত্য করতে হবে—তাই না? অতিথি ব্রাহ্মণ, হীন সুতপুত্র হলেও মনটা আমার এত ছোট নয়। দিন দিন ব্রাহ্মণ, আপনার হাতের কমণ্ডলের জল আর তুলসীদল হাতে নিয়ে সত্য সত্য ত্রিসত্য করলুম কখনও আপনাকে বিমুখ করে ফিরিয়ে দিব না।

শ্রীকৃষ্ণ : তবে শুন মহারাজ কর্ণ। আমার যে মাংস প্রয়োজন তা এখন বলে দিচ্ছি।

গান/গীত সংলাপ:

জীবজন্তুর মাংস আমার নাহি প্রয়োজন। নর মাংস খাইতে আমার মনে আকিঞ্চন।

কর্ণ : নর হয়ে নরের মাংস ভক্ষণ। এ হয় না অতিথি ঠাকুর। এ হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ : তুমি যদি না দিতে পার তাহলে আমি চলে যাব। নর মাংস ছাড়া ভোজন করা হবে না।

কর্ণ : না অতিথি ঠাকুর আপনি যাবেন না। আপনি দয়া করে বসুন। আমার মাংস আমি দিব আপনি ভোজন করবেন ঠাকুর।

শ্রীকৃষ্ণ : কি বলছ রাজন আমিও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তুমিও বৃদ্ধ রাজন। বৃদ্ধের মাংস আমার রুচিসম্মত নহে। কচি মাংস ছাড়া ভোজন করা হবে না।

কর্ণ : ও ভগবান, নর হয়ে নরমাংস ভক্ষণ। এ মানুষ—না দেবতা, যক্ষ না পিশাচ, দৈত্য না দানব। হায় ভগবান—আমি কার শিশু পুত্রকে এনে টুকরো টুকরো করে দিব ঠাকুর, আমায় বলে দাও।

শ্রীকৃষ্ণ : তুমি কেন চিন্তা করছ কর্ণ। তোমার শিশু পুত্রকে স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে করাত টেনে পদ্মাবতী স্বহস্তে রন্ধন করে আমাকে ভোজন দিলে আমার পারণা করা হবে।

কর্ণ : (স্বগত) ও কি নিষ্ঠুর বাণী শ্রবণ করিলাম কর্ণে। আমি যে আর ধৈর্য্য ধরতে পারছি না। সেকি ব্রাহ্মণ না মায়াধারী কোনো দেবতা, না মায়াধারী কোনো রাক্ষস সেজে আমার একমাত্র পুত্রের কচি মাংস খেতে চায়। এখন কি করি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলে পুত্রকে হারাতে হবে, আর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে নরকে যেতে হবে। উঃ ভগবান আমি এখন কি করি, কোন পথে যাই। আমি যে কিছুই ভাবতে পারছি না।

শ্রীকৃষ্ণ : মহারাজ কর্ণ—তুমি কি ভাবছ? পারবে পারণা দিতে? না বিমুখ হয়ে অন্যত্র চলে যাব।

কর্ণ : ওগো অতিথি ব্রাহ্মণ আমাকে একটু ভাবতে দিন।

শ্রীকৃষ্ণ : একাদশীর উপবাস দ্বাদশীতেই পারণা করতে হয়। নতুবা দ্বাদশী পার হয়ে গেলে রৌরব নরক ভোগ করতে হবে। ভাবতে ভাবতে যদি দ্বাদশী পার হয়ে যায় তখন সেই নরক

Dhaka University Institutional Repository

ভোগ করবে কে? তোমার নরকের ভয় না থাকলেও আমার কিন্তু আছে। তাই আসি অন্যত্র চলে যাব।

কর্ণ : নরক—নরক—নরক ঠিকই তো। না না না আপনি যাবেন না ঠাকুর। আর কিছু সময় ধৈর্য্য ধরুন। আমার স্ত্রী অন্দর মহলে, তার কাছে জিজ্ঞেস করে দেখি কারণ বৃষকেতু শুধু আমার একার নয়, পদ্মাবতীরও অধিকার আছে। তাই তাহার সঙ্গে পরামর্শ করে আপনার পারণার ব্যবস্থা করি।

শ্রীকৃষ্ণ : মহারাজ কর্ণ, ভাবতে ভাবতে দ্বাদশী অতিক্রম হলে আমি কিন্তু আর বিলম্ব করব না। অতি সত্বর ব্যবস্থা কর।

কর্ণ : তাই যাচ্ছি ব্রাহ্মণ। আপনি ধৈর্য্য সহকারে বসুন। আমি অতিসত্বর ফিরে আসছি।

এমন কথা বলে কর্ণ প্রস্থান করতেই শ্রীকৃষ্ণ স্বগোক্তির ভঙ্গিমায় বলেন :

শ্রীকৃষ্ণ : কর্ণ কি পারবে তাহার প্রাণাধিক পুত্রকে করাত টেনে টুকরো টুকরো করে সহস্তে রন্ধন করে পারণার ব্যবস্থা করতে! দেখ কর্ণ দানের কি মহিমা! এইবার হবে তোমার দানের পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই তুমি দাতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে এই ভারত ইতিহাসে। দাতা—তুমিই হবে শ্রেষ্ঠ দাতা।"[২০]

সাধারণত বর্ণনাত্মক সংলাপ, গীত সংলাপ, বর্ণনাত্মক গীত, স্বগোক্তি এবং গদ্য ও পদ্য বা ছন্দবদ্ধ সংলাপাত্মক অভিনয়ের আশ্রয়ে ঢপযাত্রার আঙ্গিকে মহাভারতের আখ্যান পরিবেশিত হয়।

বর্তমানে সুনামগঞ্জের শাল্লা-দিরাই অঞ্চলের মুক্তারপুরের হেমেন্দ্রকুমার তালুকাদার, বরগাঁওয়ের নলিনী চক্রবর্তী, ডুমরা'র ঝন্টুকুমার দাস, অসিতরঞ্জন তালুকদার এবং বিষ্ণুপুরের খাগারুয়া'র মনোরঞ্জন ও রাকেশের ব্যবস্থাপনায় ঢপযাত্রার আলাদা আলাদা দল রয়েছে, যে সকল দলের অধীন অসংখ্য শিল্পী-কুশীলব প্রায় নিয়মিতভাবে ঢপযাত্রার আসরে মহাভারতের বিভিন্ন পালার অভিনয় উপস্থাপন করে থাকেন।

২.২ মৈতৈ মণিপুরী জাতিগোষ্ঠীর কাশীদাসী মহাভারত

রাজসভায় পুরাণ-পাঠ ছিল বাংলার প্রাচীনরীতি। এক্ষেত্রে পুরাণ বলতে প্রধানত *মহাভারত* পাঠ করা হত। পালবংশের অন্যতম শেষ রাজা মদনপাল বৌদ্ধ হলেও তাঁর 'মহিষী চিত্রমাতিকা নিয়মপূর্বক *মহাভারত* পাঠ' শুনতেন।[২১] *মহাভারত* পাঠের প্রায় একই রকম রীতির প্রচলন রয়েছে বাংলাদেশের মৈতৈ মণিপুরী সমাজে। জাতিগতভাবে তারা সাধারণত বৈষ্ণবপন্থী হলেও তারা 'নিয়মসেবা' নামক এক পর্বে পুরো এক মাসব্যাপী বাংলাভাষায় রচিত কাশীরাম দাসের *মহাভারত* পাঠ করেন।

সাধারণত বাংলা মাসের হিসেবে কার্তিক পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যা থেকে 'নিয়মসেবা'র সূচনা হয়। এরপর টানা এক মাস জুড়ে অর্থাৎ কার্তিক পূর্ণিমা থেকে অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা বা রাসপূর্ণিমার দিন সকাল পর্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository

নিয়মসেবা চলে। এই পর্বের অবশ্য পালনীয় বা কৃত্যাচার হিসেবে প্রতিদিন সকাল অথবা সন্ধ্যায় মৈতৈ মণিপুরীরা জগন্নাথ মন্দির সংলগ্ন নাটমণ্ডপে বসে কাশীদাসী *মহাভারত*-এর পাঠ ও বিশ্লেষণ উপভোগ করেন।

এ ধরনের পরিবেশনে পাঠক পণ্ডিত পোশাক হিসেবে সাধারণত সাদা ধুতি ও পাঞ্জাবি পরিধান করে থাকেন। এছাড়া, তিনি অন্য কোনো ধরনের সাজসজ্জা গ্রহণ করেন না। এমনকি কাশীদাসী *মহাভারত*ের এরকম পাঠাভিনয় শেষে মনশিক্ষার গান পরিবেশনের সময় যে সকল গায়ক, বাদ্যকর, দোহারগণ অংশগ্রহণ করেন তাদেরকেও ভিন্ন ধরনের কোনো পোশাক পরিধান করতে দেখা যায় না, তারা মূলত দৈনন্দিন জীবনের পোশাক পরেই নিয়মসেবা পর্বে অংশগ্রহণ করেন।

আসরের শুরুতে জগন্নাথ মন্দিরে রাখা মহাভারতের মুদ্রিত পুঁথি এবং একটি রেহেলের মতো করে নির্মিত কাঠের পাটাতন বের করে আনা হয়। তারপর সে কাঠের পাটাতনের উপর রেহেলে বিছানো পুঁথির মতো কাশীদাসী *মহাভারত*ের মুদ্রিত পুঁথিটি খুলে মেলে রাখা হয়। সেই অবসরে সে পুঁথিকে ঘিরে নারী-পুরুষ দর্শক-ভক্ত বসে যান। এভাবে *মহাভারত* পাঠের জন্য একটি পরিবেশ তৈরি হলে মণিপুরী পণ্ডিত পুঁথি থেকে বাংলা পয়ার ছন্দে *মহাভারত* কাহিনির পাঠাভিনয় শুরু করেন।

এক্ষেত্রে তিনি বাংলা *মহাভারত*ের এক একটি ঘটনাংশের পাঠাভিনয় শেষে মৈতৈ মণিপুরী ভাষায় আখ্যানবস্তুর ভাব, রস, চরিত্র ও কাহিনির ব্যাখ্যা প্রদান করেন। আসরে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতা ভক্তগণ তার সে ব্যাখ্যার মধ্যে আখ্যান ও বর্ণিত চরিত্রদের প্রাণধর্ম ও দুঃখ-বেদনা-আনন্দ-হাসির নির্যাস অনুযায়ী বিচিত্র ধরনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে থাকেন। এক্ষেত্রে কখনো কখনো কোনো ভক্তকে অশ্রুসজল অবস্থায় আখ্যান শ্রবণ করতে দেখা যায়, কখনো-বা আবার হাসিতে ঢলে পড়তে দেখা যায়। তবে, মহাভারত পাঠের অনুষ্ঠানে হাসির থেকে কান্নার ভাগই অধিকতর থাকে।

কাশীদাসী মহাভারতের এ ধরনের পাঠাভিনয় শেষে ভগবানের নাম শরণ করা হয়। এ পর্যায়ে নাম গান করবার জন্য পণ্ডিত উঠে দাঁড়াতেই আসরে উপস্থিত সকল-শ্রোতা উঠে দাঁড়ান, একই সঙ্গে দোহার-বাদ্যকরগণও। এবার তারা সকলে মিলে বাদ্যযন্ত্রে তাল ও ধ্বনি তুলে সমস্বরে পরম আরাধ্য দেবতাদের নাম গান করতে করতে নাটমণ্ডপের ঊষর মেঝেতে বৃত্তাকারে বেশ কয়েবার প্রদক্ষিণ করেন।

সবশেষে জগন্নাথ মন্দিরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে মনশিক্ষা পর্বের দু'একটি গান পরিবেশন করেন। এ সময় সাধারণ ভক্তগণ ভক্তিতে মহাভারত পাঠক পণ্ডিত ও মন্দির পুরোহিতকে সাষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করেন। মহাভারত পাঠের এই অনুষ্ঠানের পর সেবা গ্রহণের বিধান আছে। ভক্তদের আনা পূজার প্রসাদ এক্ষেত্রে সবার মাঝে বিলিয়ে দেওয়া হয়।

মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানার মৈতৈ মণিপুরীদের মধ্যে কাশীদাসী মহাভারতের বিখ্যাত পাঠক-পণ্ডিত হলেন আদমপুর-মঙগেমাখঙ বা নয়াপত্তন গ্রামের থামবাল (৬০)। উক্ত গ্রামের জগন্নাথ মন্দির সংলগ্ন নাটমণ্ডপে প্রায় ত্রিশ বছর ধরে তিনি নিয়মসেবা পর্বে কাশীদাসী *মহাভারত*-এর পাঠাভিনয় পরিবেশনের মাধ্যমে মৈতৈ মণিপুরী দর্শক-ভক্তদের মনোরঞ্জন থাকেন।[২২]

Dhaka University Institutional Repository

৩. বাঙালির জাতীয় মহাকাব্য *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* ও তার বিভিন্ন লীলা প্রকাশক আখ্যান

পৌরাণিক চরিত্র শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করে বাংলাদেশে নানা ধরনের ঐতিহ্যবাহী নাট্য প্রচলিত রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও নানাবিধ লীলাকে আশ্রয় করে বাংলা ভাষায় *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* নামে যে প্রাচীন কাব্য রচিত হয়েছিল, নাট্যবিশেষজ্ঞগণ সে কাব্যকে শুধু কাব্য বলতে চাননি, বলেছেন—সেটি হল প্রথম সুনির্দিষ্ট নাটকের পাণ্ডুলিপি। বড়ু চণ্ডীদাস (১৩৭০-১৪৩৩ খ্রিষ্টাব্দ) *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর আদি রচয়িতা। এই গ্রন্থের মূল উপাদান তিনি *ভাগবত পুরাণ* ও *মহাভারত* থেকে গ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশে প্রচলিত শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক ঐতিহ্যবাহী নাট্যে প্রধানত বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে*র মূল পাণ্ডুলিপির আখ্যানভাগকে আশ্রয় করা হয়েছিল; কিন্তু পরবর্তী সময়ে তার সঙ্গে বহু পৌরাণিক ঘটনা এবং লোককথার মিশ্রণ ঘটেছে।

বাংলাদেশে প্রাচীন কাল থেকে পুরাণ কাহিনির পাশাপাশি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার বহু লোককথা গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত ছিল। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে*র আখ্যানে পুরাণে বর্ণিত কৃষ্ণের লীলা অপেক্ষা গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত অপৌরাণিক কাহিনির প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। তাই তো এ নাট্যকাব্যের আখ্যান বাহ্যত পৌরাণিক রাধার অনুসারী হলেও তা আসলে লোকজীবনের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বড়ু চণ্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র আখ্যানভাগ মোট তেরটি খণ্ডে বিভক্ত, যথা—জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহখণ্ড। এ সকল খণ্ডের আখ্যানে আছে—প্রথম সর্গ জন্মখণ্ডে দেবগণের প্রার্থনায় ভূভার হরণের জন্য রাধাকৃষ্ণের জন্মকাহিনির বর্ণনা। বিষ্ণু কৃষ্ণরূপে বসুদেবের পুত্র হিসেবে জন্মগ্রহণ করে এবং বৃন্দাবনে নন্দের গৃহে স্থানান্তরিত হয়। কৃষ্ণের সম্ভোগের জন্য লক্ষ্মীদেবী সাগর গোয়ালার ঘরে পদুমার গর্ভে রাধারূপে জন্ম নেয়। তাম্বুলখণ্ডে রাধার অসামান্য রূপলাবণ্যের কথা শুনে কৃষ্ণ বড়াইয়ের মাধ্যমে আয়ান ঘোষের পত্নী রাধাকে তাম্বুলাদি প্রেরণ করে, কিন্তু রাধা স্বরূপবিস্মৃত রাধাকর্তৃক তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। দানখণ্ডে কৃষ্ণ বড়াইয়ের সহায়তায় রাধার দধিদুগ্ধের পসার নষ্ট করে রাধাকে বলপূর্বক সম্ভোগ করে। নৌকাখণ্ডে কৃষ্ণ যমুনার কাণ্ডারি সেজে গোপীগণকে পার করে নৌকা ডুবিয়ে রাধার সঙ্গে জলবিহারে মগ্ন হয়। এখান থেকেই রাধার মনের প্রতিকূলতা দূর হতে থাকে। ভারখণ্ডে কৃষ্ণ ভারবাহীরূপে রাধার পসরা বহন করে। ছত্রখণ্ডে রাধাকে সূর্যতাপ থেকে রক্ষা করার জন্য কৃষ্ণের ছত্রধারণ এবং রাধাকর্তৃক রতিদানের আশ্বাস প্রদান করা হয়। বৃন্দাবনখণ্ডে গোপীগণের সঙ্গে কৃষ্ণের বনবিহার এবং রাধাকৃষ্ণের মিলন। যমুনাখণ্ডে কৃষ্ণের কালিয় নাগের দমন, গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের জলবিহার এবং কৃষ্ণকর্তৃক গোপীদের বস্ত্রহরণ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। হারখণ্ডে রাধার হার অপহরণের জন্য যশোদার কাছে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে রাধার অভিযোগ। বাণখণ্ডে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কৃষ্ণ রাধার প্রতি মদনবাণ নিক্ষেপ করে, এতে রাধা মূর্ছা যায়। ফলে কৃষ্ণের মনে অনুতাপ জাগে, বড়াই কৃষ্ণকে বন্ধন করে। পরে কৃষ্ণের অনুনয়ে বন্ধন মোচন করা হয়। কৃষ্ণ রাধার চৈতন্য সম্পাদন করে এবং উভয়ের মিলন ঘটে। বংশীখণ্ডে কৃষ্ণের বংশী ধ্বনি শুনে রাধার মনে প্রবল উৎকণ্ঠা জাগে, রাধাকৃষ্ণের বংশী অপহরণ করে এবং পরে কৃষ্ণের অনুনয়ে তা ফেরত দেয়। রাধাবিরহখণ্ডে রাধার

Dhaka University Institutional Repository

বিরহ, উভয়ের মিলন, রাধার নিদ্রা এবং সেই অবকাশে কৃষ্ণ কংসবধের জন্য মথুরার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে।[২৩৭] মূলত এ সকল ঘটনাকে আশ্রয় করেই *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* ও শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক ঐতিহ্যবাহী নাট্য পরিবেশিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এই কাহিনিকে অবলম্বন করে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের আসরে বৈষ্ণব পদাবলির রাধাকৃষ্ণকে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রতীক হিসেবে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু নাট্য পরিবেশনে দর্শকের সামনে তাঁর আসল প্রকাশ ঘটে দেবলীলায় নয়, মানবলীলায়। কোনো আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ছাড়াই এই গীতিনাট্যকাব্যের অর্থ ও রস অনুভব করা যায়। এর গল্প ও চরিত্র পাঠকের কাছে সহজেই আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম। সম্ভবত এমন কারণে বাংলাদেশের গ্রামীণ মানুষের কাছে শ্রীকৃষ্ণলীলার নাট্যপালা অত্যন্ত জনপ্রিয়।

বর্তমানে প্রচলিত বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক আখ্যানকে সাধারণত দুই ভাবে ভাগ করে নিয়ে পরিবেশিত করা হয়ে থাকে, যার এক ভাগে থাকে অষ্টকালীন লীলাকীর্তন বা নিত্যলীলা; অন্যভাগে থাকে নৈমিত্তিকলীলা। প্রথম ভাগের অষ্টকালীন লীলাকীর্তন বা নিত্যলীলায় সাধারণত আটটি পর্ব থাকে, যথা–'জাগরণ-রসোদ্গার', 'গোষ্ঠলীলা', 'সূর্যপূজা', 'উত্তরাগোষ্ঠ' বা 'ফিরাগোষ্ঠ', 'রূপানুরাগ' (এক্ষেত্রে রূপ ও অনুরাগকে আলাদা করা হয়ে থাকে), 'রাসলীলা' ও 'অলস কুঞ্জভঙ্গ' বা 'কুঞ্জভঙ্গ'। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ভাগের নৈমিত্তিকলীলাতেও আটটি পর্ব থাকে, তবে তা নিত্যলীলা থেকে ভিন্ন, যথা–'শ্রীমতি রাধার পূর্বরাগ', 'শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ-দানলীলা', 'রাধার মানভঞ্জন-কলহান্তরিতা', 'নৌকাবিলাস', 'সুবল-মিলন', 'রাধার বাসকশয্যা', 'রাধার খণ্ডিতা' ও 'মাথুরা বিরহ'।[২৪] এভাবেই সাধারণত পর্বে পর্বে বিভক্ত করে লীলাকীর্তনের আসরে বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতিতে শ্রীকৃষ্ণের আখ্যানলীলা পরিবেশন করা হয়। তবে, লীলাকীর্তনই শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যপ্রকাশক একমাত্র নাট্যরীতি নয়। আসলে, বাংলাদেশের গ্রামীণ আসরে বিচিত্র আঙ্গিকে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা পরিবেশিত হয়। যার মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত আঙ্গিকটির নাম এই 'লীলাকীর্তন' বা 'পদাবলি কীর্তন'। এছাড়া, 'অষ্টকগান' এবং 'নৌকাবিলাস' নামে আরো দু'টি আঙ্গিকের অস্তিত্ব রয়েছে। এদেশের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক পরিবেশনরীতি প্রচলিত। বিশেষত মণিপুরী সমাজে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক কয়েকটি পরিবেশন-আঙ্গিক বর্তমান রয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পরিবেশন-আঙ্গিক হচ্ছে–'নটপালা', 'গোষ্ঠলীলা', 'রাখালনৃত্য' এবং 'রাসলীলা'।

শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক আখ্যানের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আখ্যানের মিশেলে আরও কিছু পরিবেশন-আঙ্গিক প্রত্যক্ষ করা যায়, যেমন–'কৃষ্ণযাত্রা', 'কৃষ্ণলীলা' ইত্যাদি। তবে, 'কৃষ্ণযাত্রা' ও 'কৃষ্ণলীলা'র আসরে আদিতে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক আখ্যান পরিবেশিত হলেও বর্তমানে প্রধানত শ্রীচৈতন্যের জীবনকেন্দ্রিক 'নিমাই সন্ন্যাস' পালাটিই অধিক মঞ্চস্থ হয়। সে কারণে, উপর্যুক্ত পরিবেশন-আঙ্গিক দু'টিকে শ্রীচৈতন্য ও তার পার্ষদদের জীবন-কাহিনিকেন্দ্রিক পরিবেশনের অন্তর্ভুক্ত করা হল।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১ পদাবলি কীর্তন

কোনো একটি সুনির্দিষ্ট ঘটনা বা আখ্যান প্রকাশের নিমিত্তে অনেকগুলি পদ একত্রে সংকলিত করে কোনো গায়ক বা কীর্তনীয়া যখন বাদ্যকর-দোহার সহযোগে দর্শক বেষ্টিত আসরে নাটকীয় বর্ণনা, সংলাপ ও সঙ্গীতের আশ্রয়ে পরিবেশন করে থাকেন তখন তাকে 'পদাবলি কীর্তন', 'লীলাকীর্তন' বা 'পালাকীর্তন' বলা হয়। উল্লেখ্য, 'পালা' শব্দটি যাত্রা বা নাটকের ক্ষেত্রে যে অর্থে ব্যবহৃত হয় কীর্তনের ক্ষেত্রে অনেকটা সে অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বৃন্দাবনে প্রকটিত রাধা, কৃষ্ণ, সখা, সখী, গোপ, গোপী ইত্যাদি সকলের সঙ্গে বিলাসসূচক ঘটনাগুলিকেই লীলা বলে বর্ণিত করা হয়। বৈষ্ণব-ভক্তদের মতে, লীলা প্রকৃতপক্ষে ভগবত রূপের খেলা, লীলার আদি নাই, অন্ত নাই, ক্লান্তি নাই, দুঃখ নাই, আনন্দময় অবিশ্রান্ত একটি নিত্যধারা। ভগবৎস্বরূপের প্রকট অবস্থার সমস্ত কর্মই লীলা। শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের লীলাপ্রসঙ্গ নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থে। এই লীলাসূত্রকে অবলম্বন করে নানাবিধ গান রচনা করেছেন মহাজনগণ তাঁদের কাল্পনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অনুভবের গভীরতার সহায়তায়। পৃথকভাবে এ গানগুলি হল লীলাকীর্তনের আঙ্গিক—লীলা প্রকরণটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিবার জন্য। বিভিন্ন পদকর্তার ঐ লীলা সংক্রান্ত বিভিন্ন পদ সংগ্রহ করে গায়ক তাঁর আত্মিক অনুভূতি ও শৈল্পিক সৃষ্টিশীল ক্ষমতা দ্বারা একটি আস্বাদনীয় বৈশিষ্ট্য উপস্থাপনের চেষ্টা করেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে—এই লীলাকীর্তনেরই অপর নাম 'পালাকীর্তন'। বাংলাদেশে 'পালাকীর্তন' শব্দটি লীলাকীর্তনের সম্পূরক প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আসলে, বাংলায় 'পালা' বলতে যাত্রা, নাটক ইত্যাদির পালা। লীলাকীর্তনে যেহেতু নাটকীয় পদ্ধতিতে ঘটনাটি উপস্থাপিত হয় সেহেতু এর নামকরণে পালা শব্দটি সংযোজিত হয়েছে।

কীর্তন গানের জন্য উপযোগী করে প্রাচীন কালের কিছু বৈষ্ণব কবি-মহাজন কিছু কিছু গীতিকবিতা লিখেছেন। প্রত্যেকটি গীতিকবিতাই একটি করে পদ। এমন পদ কত আছে তার সীমা নাই। তবে যে-সকল পদ পদাবলি সংকলনে সংকলিত হয়েছে তার সবগুলি গান হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল কিনা তার যথার্থ প্রমাণ নাই। তবে নানাবিধ গবেষণা সূত্রে যেসব সন্ধান পাওয়া গেছে তাতে বোঝা যায় এর সিংহভাগ কবিতাই ছিল প্রসিদ্ধ গান। এর প্রতিটি পদ একটি কীর্তন। এমন এক বা একাধিক মহাজন-কৃত পদ গানকেই বলা হয় 'পদাবলি কীর্তন'। এক্ষেত্রে লীলাবিন্যাসের প্রয়োজন কম, গানটির উপস্থাপনই বড় কথা। এমনকি বিভিন্ন গানের মধ্যে প্রসঙ্গের মিল না থাকলেও ক্ষতি নাই। পদাবলি কীর্তন মূলত পালা কীর্তনের অংশবিশেষ। অনেকগুলি পদকে সংকলিত করে ঘটনার নাটকীয় বর্ণনার উপস্থাপনকল্পে করা হয়—পালাকীর্তন বা লীলাকীর্তন। পদকীর্তন হ'ল ইদানীং প্রচলিত কীর্তনের অর্থাৎ কবি জয় দেবোত্তর যুগে প্রচলিত কীর্তনের প্রাচীনতম রূপ। এরই সংস্কারপ্রাপ্ত রূপটি হল গড়ানহাটি গানের ধারা। ভিন্ন ভিন্ন গানের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। পরপর সংযোজন করলেও স্বকীয় সত্তা নষ্ট হয় না। পালাকীর্তন পর্যায় প্রকরণের সময় গানগুলি যখন সংযোজন করা হয়, প্রতিটি গানের বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে রক্ষা করতে চেষ্টা করা হয়। তাই পদাবলি কীর্তনই হল কীর্তনের প্রাচীনতম নিদর্শন। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কীর্তনীয়া লোচনদাস ছিলেন মঙ্গলগায়ক। তাছাড়া 'নাটগানে'র প্রভাবও যথেষ্ট রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পদাবলি কীর্তনের আসর দিন ও রাত মিলে সকল সময়ে করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে দিন রাতের প্রহর হিসেব করে নির্ধারিত সময়ের জন্য নির্ধারিত পালা পরিবেশন করার নিয়ম আছে। পদাবলি কীর্তন পরিবেশনের সময় বিভাজন হল—সকাল ৬টা থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত 'জাগরণ-রসোদগার', সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত 'গোষ্ঠলীলা', দুপুর ২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত 'সূর্যপূজা', সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত 'উত্তরাগোষ্ঠ' বা 'ফিরাগোষ্ঠ', রাত ১০টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত 'রূপানুরাগ' (রূপ ও অনুরাগকে আলাদা করে দুই ভাগেও করা হয়) এবং রাত ২টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত 'রাসলীলা' ও 'অলস কুঞ্জভঙ্গ' বা 'কুঞ্জভঙ্গ' পালা পরিবেশন করা হয়ে থাকে।[২৫]

এ ধরনের নাট্যাঙ্গিকটি সাধারণত রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের সামনে অবস্থিত চারদিক খোলা নাটমন্দিরে পরিবেশিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে এর আসরের চারদিকে দর্শকের অবস্থান থাকে। তবে, কখনো কখনো এর ব্যতিক্রম ঘটে—যেমন মন্দিরের সামনে চারদিক খোলা কোনো নাটমন্দির না-থাকলে তিনদিকে দর্শকদের বসার ব্যবস্থা করা হয়। এক্ষেত্রে আসরের একদিক মন্দিরে উপস্থিত রাধা-গোবিন্দের মূর্তি দর্শনের জন্য নির্ধারিত থাকে। তেমন কোনো দ্রবকে অভিনয় উপকরণ হিসেবে সাধারণত ব্যবহার করা দেখা যায় না। ক্ষেত্র বিশেষ কীর্তনীয়ারা তাঁদের কাঁধে ঝোলানো উত্তরীয়কেই সাধারণত অভিনয় উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেন। এছাড়া, বাদকদের হাত থেকে কখনো করতাল বা বাঁশি তুলে নিয়ে শ্রীরাধার দধিপাত্র বা শ্রীকৃষ্ণের হাতের বাঁশি হিসেবে প্রদর্শন করেন। পদাবলি কীর্তনে বাদ্য হিসেবে হারমোনিয়াম, খোল বা মৃদঙ্গ, করতাল, বেহালা, বাঁশি ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

পদাবলি কীর্তনের আসরে মূলগায়ক বা কীর্তনীয়া উপস্থিত হবার আগেই বাদ্যযন্ত্রীগণ আসরে আসেন। প্রথমেই আসর প্রণাম করে তারা বাদ্যযন্ত্রের প্রতি ভক্তি নিবেদন করেন। এরপর বাদ্যযন্ত্র বেহালা, মৃদঙ্গ, হারমোনিয়াম ও মন্দিরা-করতালের সুর সমন্বয়ে কিছুক্ষণ সম্মিলিত বাদন করেন। কয়েকটি ভাগে এই যন্ত্রসঙ্গত চলতে থাকে। এর মাঝে কীর্তনীয়া আসরে এসে প্রথমে আসরে রাখা কৃষ্ণমুরতির অঙ্কিত ছবিতে প্রণাম করেন এবং এরপর সকল বাদ্যযন্ত্র ছুঁয়ে ছুঁয়ে প্রণাম করে রাধাকৃষ্ণ স্মরণে গেয়ে ওঠেন :

''হা কৃষ্ণ করুণার সিন্ধু। দীনবন্ধু জগৎপতি। প্রভু কৃষ্ণ গোবিন্দ জয়। জয় রাধা মাধব। জয় জয় হে॥'

সাধারণত এমন কথা ও সুর-তালের ইন্দ্রজালের মধ্যে আসরে উপস্থিত ভক্ত নারীদের কণ্ঠে উলুধ্বনি ওঠে। আর সেই উলুধ্বনির ভেতর কীর্তনীয়া মূলপালাতে গমনের পথ খুঁজে নেন :

'ও সুরধ্বনি। সুরধ্বনির তীরে আহা মরি রে। প্রভু আমার ভিড়লো ভক্তগণ মিলে॥'

কীর্তনীয়ার এই সুর-কথার মধ্যে মৃদঙ্গবাদকদ্বয় মৃদঙ্গ বাজাতে বাজাতে আসরে উঠে দাঁড়ান। তারা তাদের মৃদঙ্গ বাদনের সঙ্গে মৃদঙ্গের বোলগুলো কণ্ঠে উচ্চারণ করে আসরের সুরের মধ্যে সম্পূর্ণ তালের একটি আবহ তৈরি করে। কিন্তু পরক্ষণেই সে তালের সঙ্গে সুর টেনে সুর-তালের অপূর্ব সমন্বয় সম্ভব করে তোলেন। যেমন :

মৃদঙ্গের বোল : 'ধা ধি ধিনা। ধিনা তেরে ধিনা তা ধিনা তা ধিনা ॥'

Dhaka University Institutional Repository

এর মাঝেই দোহারদের মধ্য থেকে সুরে টান পড়ে–'আহা মরি রে ॥'

দোহারদের সুর টানের ভেতর আবার মৃদঙ্গ বোলে ফিরে যান বাদকদ্বয়–

'ধে ধে ধি। ধে ধে ধি। ধে ধে ধা। ধেই তেরে কেটে তাক ॥
ধে তেরে ধি ধে তেরে ধি। ধে ধে ধা ধেই তেরে না ধি। ধা তেরে কেটে তাক ॥'

পুনরায় দোহারদের সুরে টান পড়ে–আহা মরি রে। মরি আহা রে॥

ফিরে আসে মৃদঙ্গ বোল–ধা ধেই না তেরে কেটে না ধি না।

ফিরে আসে সুরে টান–আহা মরি রে। মরি আহা রে। মরি রে॥[২৬]

তাল-সুর একাকার করে নিয়ে এবারে সুরে সুরে কীর্তনীয়া পদাবলি কীর্তনের নিয়ম অনুসারে গৌরলীলার কথা প্রকাশ করেন। যাকে পদাবলি কীর্তনের আসরের গৌরচন্দ্রিকা বলা হয়ে থাকে।

এরপর গৌরলীলা তথা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু চৈতন্য ও তাঁর পার্ষদদের লীলারস আস্বাদন প্রসঙ্গ উত্থাপনের ভেতর দিয়ে কীর্তনীয়া এক সময় শ্রীকৃষ্ণের আদি-লীলার কাহিনিতে প্রবেশ করেন। এক্ষেত্রে একজন কীর্তনীয়া বর্ণনাত্মক গদ্য, পদ্য ও গীতের আশ্রয়ে দোহারদের ধুয়াগীতি সহযোগে আদি-লীলার আখ্যানে বর্ণিত চরিত্রসমূহে রূপদান করে থাকেন। পরিবেশনাতে বর্ণনাত্মক সংলাপের আধিক্য প্রত্যক্ষ করা যায়। তবে, নাট্যিক সংলাপ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কীর্তনীয়াগণ কণ্ঠের যথাযথ প্রয়োগে আদি-লীলার অন্তর্ভুক্ত চরিত্রসমূহের অভিনয় দর্শক-ভক্তদের মাঝে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হন।

পদাবলি কীর্তনের আখ্যানের নিরালম্ব বর্ণনার ফাঁকে কীর্তনীয়া একাই সংলাপ, উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং গীত পরিবেশন করে থাকেন। পদাবলি কীর্তন বা লীলাকীর্তনের পরিবেশনরীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে এ ধরনের পরিবেশনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহের উল্লেখ প্রয়োজন। আসলে, এ ধরনের পরিবেশনে কীর্তনীয়াকে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলতে হয় :

১. রাধাকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ উপযোগী গৌরচন্দ্রিকা প্রথমেই গাইতে হয়;
২. পদ-সংকলনে শাস্ত্রীয় ক্রম রক্ষা করতেই হয়;
৩. ঘটনার পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে যে যে ক্ষেত্রে মহাজনপদাবলির অভাব হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তুক গান বা শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে কিছু উল্লেখ করতে হয়;
৪. আকর সংযোজন ক্ষেত্রে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এবং রসের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে হয়;
৫. শুদ্ধ কীর্তনের ধারা বজায় রেখে গান করতে হয়। প্রতিটি গানের ভনিতা গাইবার সময় পদকর্তার প্রতি সম্মান দেখাতে হয়;
৬. সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্যগুলির গুরুত্ব মানতে হয়, অর্থাৎ যে গান যে তালে এবং যে সুরে গাওয়ার কথা সেভাবেই যেন গাওয়া হয় এবং শ্রোতা ভক্তদের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই যেন গান সংযোজন করা হয়;

Dhaka University Institutional Repository

৭. লীলা কীর্তন বিশ্লেষণে কেবল নায়ক-নায়িকা, সখা-সখী ইত্যাদির প্রতি সমগ্র গুরুত্ব দিলে হয় না, পরিবেশ-বিশ্লেষণ অন্যান্য পৌরাণিক বা শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ অবতারণা করতে হয়;

৮. অনুষ্ঠানের সার্বিকতা রক্ষাকল্পে ভক্তিবাদ দেখাতে হয় এবং শ্রোতা ভক্তদের মন মতো দেববিগ্রহের ছবি, মালা, চন্দন ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়;

৯. চন্দন, মালা ইত্যাদি পরাবার সাধারণ নিয়ম–প্রথমে একটি ফুল দিয়ে বাটিতে চন্দন নিয়ে শ্রীখোল এবং করতালে দিতে হয়, পরে শ্রীখোল-করতালে মালা দিতে হয় তারপর মূলগায়েন, দোহার ও বাদকদের চন্দন এবং মালা পরিয়ে প্রণাম করতে হয়;

১০. লীলাকীর্তনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক আবশ্যকীয় হল 'মিলন'। অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন সম্পর্কিত গান, শেষ পর্যায়ে করতে হয়, আর মিলনের কথাতেই বোঝা যায় গান শেষ;

১১. লীলাকীর্তনে যে কোন সময়ে যে কোন লীলা গাওয়া চলে না। দিনের যে অংশে কীর্তন হবে সে অংশের নির্দিষ্ট লীলাপ্রসঙ্গ গাওয়াই বিধেয়। যেমন : নিশান্তে–কুঞ্জভঙ্গ; প্রাতে–বাল্যলীলা, দেবগোষ্ঠ, গমনগোষ্ঠ, খণ্ডিতা; পূর্বাহ্নে–খেলাগোষ্ঠ, কলহান্তরিতা, শ্রীকৃষ্ণ মিলন; মধ্যাহ্ন–নববোঢ়া রসোদগার, সূর্যপূজা, গোপীগোষ্ঠ, নৌকাবিলাস; অপরাহ্নে–উত্তরগোষ্ঠ, পূর্বরাগ, রসোঙ্গার, ভালোল্লাস; সায়াহ্নে–রূপানুরাগ, আক্ষেপানুরাগ শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ; প্রদোষে–রূপাভিসার, মিলন, রাসলীলা, সাক্ষাৎ আক্ষেপ, রসালস, তাছাড়া মাথুর বিরহে ভবন এবং ভাবী পর্যায়ই প্রাতকালীন পর্যায়;

১২. ঋতুভেদ উৎসবানুযায় কতগুলি লীলাপ্রকরণ আছে, সেগুলি গাইতে হয়। যেমন : দোষে–হোলিলীলা, ঝুলন লীলা, জন্মাষ্টমীর পরের দিন নন্দোৎসব; বসন্তে–বাসন্তীরাস; শরৎকালের পূর্ণিমায় শারদীয়া রাস;

১৩. লীলাকীর্তনে শ্রীখোল-সঙ্গতে অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে বাজাতে হয়। লীলার প্রসঙ্গ, ভাব ও রস অনুযায়ী ছেকা, লহর, কাটান ইত্যাদি সংযুক্ত করতে হয়। বাদককে দাঁড়াতে হয় এবং নৃত্যভঙ্গী দেখাতে হয়;

১৪. অষ্টকালীন লীলাকীর্তন হয়, সময়োচিত নির্দিষ্ট আটটি প্রসঙ্গ নিয়ে। বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন গায়ক ধরাবাহিকতা রক্ষা করে গান করে থাকেন;

১৫. লীলাকীর্তনের ক্ষেত্রে বাংলা, ব্রজবুলি এবং সংস্কৃত এই তিনপ্রকার ভাষা এবং আঞ্চলিক উপভাষা প্রয়োগ করা হয়।[২৭]

বাংলাদেশের প্রখ্যাত কীর্তনীয়াগণ সাধারণত উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো মেনেই পদাবলি কীর্তনের আসর করে থাকেন। গ্রাম ও শহর উভয় স্থানেই পদবলী কীর্তনের আসর হয়ে থাকে। এই ধরনের আসর সাধারণ বৈষ্ণবদের কৃত্যাচারকেন্দ্রিক। বাংলা পঞ্জিকা ও গ্রহ-নক্ষত্রের হিসেব অনুযায়ী সারা বছরের বিভিন্ন সময়ে শহরে ও গ্রামের রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের সামনে এর পরিবেশনা হয়ে থাকে। যেমন–প্রতি বছরের জন্মোষ্টমীতে বাংলাদেশের অধিকাংশ রাধাকৃষ্ণ মন্দির প্রাঙ্গণে অবস্থিত নাটমণ্ডপে পদাবলি কীর্তনের আসর অনুষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তিথি অনুযায়ী নৃসিংহ চতুর্দশী, রাম নবমী, অক্ষয় তৃতীয়াতেও এ ধরনের পরিবেশনা প্রচলিত আছে। এছাড়া, সন্তানের জন্ম, পরিবারের কারো মৃত্যু হলে বা বিপদগ্রস্ত হলেও কীর্তনের আসর দেওয়া হয়। পদাবলি কীর্তনের আসর আয়োজনের কথা বহুভাবে প্রচার করা হয়ে থাকে, যেমন—পোস্টার, লিফলেট ইত্যাদি ছেপে এবং পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিয়ে, শুধু তা-ই নয়, মাইকে ঘোষণা করেও পদাবলি কীর্তনের আসরের কথা প্রচার করা হয়।

বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক চল রয়েছে। বৈষ্ণবদের সঙ্গেই যেহেতু পদাবলি কীর্তনের যোগ রয়েছে, সেহেতু এদেশের পদাবলি কীর্তনের প্রচলন বেশ ভালো ভাবে আছে। পদাবলি কীর্তনের জন্য যেসকল গায়ক সারা বাংলাদেশে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন—নাটোরের মিহির ঘোষ, টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর থানার পাকুল্লা গ্রামের দুলাল চক্রবর্তী, কুষ্টিয়ার শ্রীরামচন্দ্র মোহন্ত গোঁসাই, ফরিদপুর অমল ব্যানার্জী প্রমুখ।

পদাবলি কীর্তন পুরুষ কীর্তনীয়ারাই বেশি পরিবেশন করে থাকলেও বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের খুলনা, বাগেরহাট, বরিশাল, গোপলগঞ্জ এবং উত্তরবঙ্গের কুড়িগ্রামে মহিলা কীর্তনীয়াদের কিছু দল রয়েছে। যারা সারা বছর বিভিন্ন স্থানে ঘুরে পদাবলি কীর্তনের আসর করে থাকেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহিলা কীর্তনীয়া হলেন—কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বর থানার ললিতা রানী, গোপালগঞ্জের মীরা রানী, নওগাঁর অনিতা রানী দেবনাথ প্রমুখ।

৩.২ অষ্টক গান

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার প্রণয়লীলা বিষয়ক আখ্যান ও লোকপুরাণ অবলম্বনে 'অষ্টক গান' বা 'অষ্ট গান' পরিবেশিত হয়ে থাকে। এ ধরনের পরিবেশনাতে গ্রামের ছেলেরা কৃষ্ণ, রাধা ও রাধা-সখী সেজে দুই দলে বিভক্ত হয়ে গান ও নাচ সহযোগে সাধারণত রাধা-কৃষ্ণের নৌকাবিলাস পালার অভিনয় করে থাকেন।

অষ্টক গানের নামকরণ সম্পর্কে নানামত প্রচলিত আছে। কেউ কেউ বলেন, এতে আটটি বৈষ্ণবীয় প্রসঙ্গ আছে, কেউ বলেন আটজনে মিলে রাধা-কৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক নাট্যধর্মী গীত পরিবেশন করা হয় বলে এর নাম অষ্টক গান। ভিন্ন মতে জানা যায়, এটি শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট প্রহরের লীলা সংক্রান্ত নাট্যগীতি বলে একে অষ্টক গান বলা হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত অষ্টক গানে 'বাসলী দেবী'র নাম পাওয়া যায়। উলেস্নখ্য, এই বাসলী দেবীর নাম আদি মধ্যযুগের বাংলায় রচিত বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের ভণিতায় লভ্য। সে দিক দিয়ে অষ্টক গানের ঐতিহ্যবাহী পরিচয় অনুধাবন করা যায়। অন্যদিকে এই গান সাধারণত চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবের গাজন উপলক্ষে পরিবেশিত হয়ে থাকে এবং এতে সূর্যপূজার সঙ্গে গোপীলীলা, নৌকাবিলাস প্রভৃতি কৃষ্ণ বিষয়ক আখ্যান আছে। তাছাড়া, অষ্টক গান পরিবেশনে মধ্যাহ্ন সূর্যকে নৃত্যগীতের মাধ্যমে বন্দনা করতে হয়। এ থেকে ধারণা করা যায়, আদিতে অষ্টক গান ছিল শিব ও ধর্মঠাকুরের পূজাকেন্দ্রিক নাটগীত।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামের শিশু-কিশোর-যুবক, ক্ষেত্রবিশেষে বয়স্করা চৈত্রসংক্রান্তি বা জন্মাষ্টমীর কৃত্যাচার হিসেবে অষ্টক গান পরিবেশন করে থাকে। অষ্টক গান বছরের সুনির্দিষ্ট দু'একটি সময়, অর্থাৎ চৈত্রসংক্রান্তি ও জন্মাষ্টমীতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ফরিদপুর, যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, কুষ্টিয়া, গোপালগঞ্জ অঞ্চলে এ ধরনের পরিবেশনা দিনের বেলাতে হলেও নড়াইল ও খুলনা অঞ্চলের কোথাও কোথাও এই গীতিনৃত্যাভিনয় রাতের বেলায় অনুষ্ঠিত হয়।

বাড়ির বাইরের বা ভেতরের উঠানই অষ্টক পরিবেশনের জন্য অধিক উপযোগী। অষ্টক গানের আসর করার জন্য মঞ্চের সুনির্দিষ্ট কোনো আকৃতি তৈরি করা হয় না, বাড়ির ভেতর বা বাইরের উঠানকে অভিনেতা বাদ্যকরগণ নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী ইচ্ছেমতো ব্যবহার করে থাকেন। এক্ষেত্রে অভিনেতা, বাদ্যকরগণ দাঁড়িয়ে থেকে নেচে গেয়ে অভিনয় করেন এবং দর্শকগণও উঠানে দাঁড়িয়ে বা ঘরের বারান্দায় বসে আসর উপভোগ করেন।

এই গানের কুশীলবগণ সাধারণত বর্ণিল পোশাক পরিধান করে থাকেন। এক্ষেত্রে কৃষ্ণ চরিত্র জরির কাজ করা আঁটসাঁট একটি কটি-বস্ত্র গায়ে চাপিয়ে বর্ণিল ধুতি পরে অভিনয় করেন। আর রাধা ও রাধার সখী চরিত্রে রূপদানকারী কুশীলবগণ গ্রামের মেয়েদের কাছে সংগ্রহ করা উজ্জ্বল রঙের প্রিন্ট শাড়ি পরিধান করেন। অপরাপর বাদ্যযন্ত্রী ও দোহারগণ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত পোশাকের বাইরে নিজের তুলে রাখা রঙিন পোশাক করে অষ্টক গানের আসর করে থাকেন।

অষ্টক গানের অভিনয়ে বাদ্য হিসেবে হারমোনিয়াম, খোল বা মৃদঙ্গ, করতাল, ঘুঙুর ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। অষ্টক গানে একজন প্রধান গায়েন, একজন কৃষ্ণবেশী বালক ও আরেকজন রাধাবেশী বালক থাকেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাধার ভূমিকায় মেয়ে শিশুরা অভিনয় করে থাকেন। এছাড়া, অষ্টক গানের দলে একজন প্রোমটার এবং আরও তিন বা ততোধিক পরিবেশনকারী থাকে। রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা অষ্টক গানে গীতাভিনয় আকারে পরিবেশন করা হয়। অষ্টক গানের ভ্রাম্যমাণ দল বাড়ি বাড়ি ঘুরে অভিনয় করেন।

অষ্টক গানের প্রথমেই থাকে সম্মিলিত বাদ্য বাদন। অষ্টক গান সূচনার আগে কোনো বাড়ির উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাদ্যযন্ত্রীগণ জনপ্রিয় একটি দেশাত্মবোধক গানের সুরে সম্মিলিত বাদ্য বাদন শুরু করেন। সম্মিলিত সেই বাদ্য বাদন শুরুর সঙ্গে সঙ্গে উঠানের এক পাশ থেকে কৃষ্ণ, রাধা ও তার অষ্ট সখীগণ দুই বাহু তুলে বাদ্যের তালে নাচতে নাচতে বাদ্যযন্ত্রীদের সামনের অভিনয় স্থানে এসে বৃত্তাকারে কয়েকবার প্রদক্ষিণ করেন। তার মধ্যে সম্মিলিত বাদ্য বাদন শেষ হয়। আর অমনি কৃষ্ণ এবং রাধাসহ সখীগণ দুই দল বিভক্ত হয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যান। আসে বন্দনা পর্ব। অষ্ট গানের শিল্পীদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণরূপী অভিনেতার মুখোমুখি রাধা ও রাধা-সখীগণ জোড় হাতে বসে বন্দনার সূচনা করেন।

ওরে বন্দিলাম আমি সরস্বতী। আমার অন্তরতে দাও মা শক্তি
আমি না জানি সাধন না জানি ভজন। নিজ গুণে দাও গতি
ওগো মা মা মা ॥

Dhaka University Institutional Repository

বন্দনার একটি অন্তরা শেষে রাধা ও রাধা-সখীগণ বসা অবস্থা থেকে জোড় হাতে দেহের উপরের অংশ ঘোরাতে ঘোরোতে উঠে দাঁড়ান। তারপর বন্দনার দ্বিতীয় অন্তরা শুরুর আগেই তারা আবার কৃষ্ণ চরিত্রের মুখোমুখি বসে যান এবং বন্দনার নতুন অন্তরা কণ্ঠে তুলে নেন। সরস্বতী ছাড়া পিতা-মাতা, শিক্ষাগুরুর বন্দনা করা হয় অষ্টক গানের শুরুতে।

বন্দনার পর অষ্টক গানের পালা শুরু করা হয় মূলগায়েন-এর বর্ণনা দিয়ে, যিনি একই সঙ্গে বর্ণনাকারী-গায়েন এবং কৃষ্ণ চরিত্রে অভিনয় করেন। অষ্টক গানের পরিবেশনরীতির বিশেষত্ব প্রকাশের তাগিদে নৌকাবিলাস পালার প্রথম অংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

বর্ণনাত্মক গদ্য : আজ শ্রীমতী অষ্ট-সখীকে সঙ্গে করে যমুনার দিকে আসছে। কেমন করে আসছে?

বর্ণনাত্মক গীত : তারা সারি দিয়ে আসছে
কৃষ্ণ চরণ পাবার লাগি সারি দিয়ে চলেছে
যেন হেম-কমল চলেছে। প্রেম কমল চলেছে
যেন কমলেরই মালা গো কৃষ্ণ প্রেম সূত্রে গাঁথা ॥

দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন : সখী আর কি করেছে জানো?

বর্ণনাত্মক গীত : বাম হাতে পসরাখানি
দক্ষিণে রাই ঘোমটা টানি
চলিছে যে বিনোদিনী রাই গো।

বর্ণনাত্মক গদ্য : এই ভাবে শ্রীমতি অষ্ট সখীকে সঙ্গে করে যমুনার দিকে আসছে। এদিকে প্রাণ গোবিন্দ আমার মনে মনে চিন্তা করেছে :

কৃষ্ণের উক্তি : আজি শ্রীমতি অষ্ট সখীকে সঙ্গে করে যমুনার দিকে আসছে। তাই আমাকে একখানা নামরূপ তরণী সৃজন করতে হবে।

বর্ণনাত্মক গদ্য : তাই প্রাণ গোবিন্দ আমার সেই নামরূপ তরণীখানা কেমন করে সৃজন করেছে?

বর্ণনাত্মক গীত : বিবেক আর বৈরাগ্য দিয়া গলই পাছা দিলো
ভক্তি ধৈর্য দাড়ার উপর খাঁড়া যে করিল
জীবের প্রাণে ধৈর্য থাকা চাই।
ভজরে বিনোদিনী রাই ॥
আসক্তিরও তক্তা তাহা সযতনে জুড়িল
লালসারও পাতাম দিয়া তাহাতে আটিল
জীবের লালসাতো যায় না
দেহতরি ভেঙে যায়। লালসাতো যায় না ॥

Dhaka University Institutional Repository

নববিধ ভক্তি দিয়া নয়টি গেরো দিল।
ষড় রিপুর দ্বারে পেরেকও মারিল
জীবের রিপু বস থাকা চাই
কালী ভজ আর কৃষ্ণ ভজ ॥
সরল সুসুদ্ধি দিয়া মাস্তুল গড়িল
রাধা নামের সাধা বাদাম উড়াইয়া দিল।
মন দিয়া যারে তরির বৈঠা নিরূপণ
আপনি কাণ্ডারি সেজে বসলেন নারায়ণ ॥

কৃষ্ণের উক্তি : আমি কাণ্ডারি সেজেছি অষ্ট সখী পার করিতে।

বর্ণনাত্মক গদ্য : এদিকে শ্রীমতি অষ্ট সখী সঙ্গে করে যমুনার ঘাটে এসে উপনীত হয়েছে এবং বড়াইকে লক্ষ করে বলছে :

রাধার উক্তি : ও বড়ীমাই এই তো আমরা যমুনার ঘাটে এসে গেছি। এখন কেমন করে পার হব।

বড়াইয়ের উক্তি : ও শ্রীমতি ওই চেয়ে দেখ, অদূরে একখানা তরী দেখা যাচ্ছে, তুই একবার প্রাণ খুলে ওই নাবিককে ডাক। যদি আমাদের কৃপা করে পার করে দেয়।

রাধার উক্তি : হে নাবিক। হে নাবিক। হে নাবিক। পার করে দাও। কারণ তরী দিয়া মোরা মথুরার বাজারে যাবো।[২৮]

ঝিনাইদহ অঞ্চলে প্রচলিত অষ্ট গান পরিবেশনে যে নাটলিপি ব্যবহৃত হয় উপরে তার আংশিক উদ্ধৃত করা হল। নাটলিপিটির পরিবেশনরীতির বর্ণনাত্মক গদ্য এবং উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক অংশে অভিনেতাদের বাচিক ও আঙ্গিক অভিনয় প্রত্যক্ষ করা যায়। আর বর্ণনাত্মকগীত ও উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক গীতে নৃত্য প্রযুক্ত হয়। প্রতি বছর চৈত্রসংক্রান্তিতে ঝিনাইদহ, মাগুরা ও ফরিদপুর অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে এই অষ্টক গানের প্রচলন আছে। তবে, কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ অঞ্চলে এ ধরনের পরিবেশনরীতি 'অষ্ট গান' নামেই সমধিক পরিচিত। ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা থানার বালিয়াঘাট গ্রামের সনাতন ধর্মানুসারী জনসাধারণ চৈত্র-সংক্রান্তিতে অষ্ট গান পরিবেশন করে থাকেন, ক্ষেত্রবিশেষ তাঁদের পরিবেশনে মুসলমান দু'একজন বাদ্যকার কুশীলবকে অংশ নিতে দেখা যায়। উল্লেখ্য, সম্প্রতি কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে অষ্ট গানের কিছু মুসলিম দল রয়েছে, যারা সারা বছর বিভিন্ন মানতে অষ্ট গান পরিবেশন করে থাকে।

কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর থানার কেউপুর গ্রামে নতুন প্রজন্মের একদল শিল্পী অষ্ট গানের দল গঠন করে প্রায় নিয়মিত অষ্ট গান করে আসছেন। এই দলের প্রধান ব্যক্তি হচ্ছে—হোসেন আলী। এছাড়া, নড়াইল জেলার হাতিয়ারা-এগারোখান গ্রামের নিখিল গোস্বামীর একটি বিখ্যাত অষ্টক গানের দল রয়েছে। এই দলের অষ্টক গান পরিবেশনে চরিত্র অনুযায়ী ছেলে ও মেয়েরা অভিনয় করে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩ নৌকাবিলাস

দুইটি শব্দ নৌকা এবং বিলাস একসঙ্গে যুক্ত হয়ে নৌকাবিলাস শব্দটি গঠিত হয়েছে। এই শব্দটি যে অর্থ প্রকাশ করে তা হচ্ছে—নাবিকরূপে শ্রীকৃষ্ণের করা ব্রজলীলার অংশবিশেষ। অর্থাৎ নৌকার উপর শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রেয়সী শ্রীরাধার সাথে যে লীলা করেছিলেন তা-ই নৌকাবিলাস। এখানে 'বিলাস' শব্দটির অর্থ হচ্ছে লীলা, ক্রীড়া, খেলা, কৌতুক, আমোদ, সম্ভোগ প্রভৃতি এবং তা নাট্য অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে।

মধ্যযুগের বাংলায় জলাশয়ে এক ধরনের লীলানাট্য অভিনীত হত। শ্রীচৈতন্য সমসাময়িককালে জল-নাট্য পরিবেশনের কথা জানা যায় বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে। তবে, আদিতে নৌকাবিলাস পদাবলি কীর্তনের ধারায় অভিনীত হলেও পরবর্তী সময়ে এই লীলাটি অঞ্চলভেদে বহুরীতিতে পরিবেশিত হতে শুরু করে। তারই একটি হচ্ছে পরিবেশকেন্দ্রিক লীলানাট্যের ধারায় নদী বা পুকুরে একটি নৌকা নিয়ে নৌকাবিলাসের অভিনয়। এক্ষেত্রে গ্রামের ছেলেরাই সাধারণত লীলানাট্যের অন্তর্ভুক্ত নারী-পুরুষ চরিত্রসমূহে অভিনয় করে থাকেন। রাধা ও রাধার সখীদের ভূমিকায় তাই ছেলেদেরকেই ছুকরি সেজে অভিনয় করতে দেখা যায়।

পরিবেশকেন্দ্রিক লীলানাট্যের ধারা নৌকাবিলাস অভিনীত হয়। এক্ষেত্রে পুরো লীলানাট্যটি সংঘটিত হয় গ্রামের কোনো জলাশয়—পুকুর, হাওড়, বিল বা নদীতে। টাঙ্গাইলের নগরভাদগ্রামের পুকুরে জন্মাষ্টমীতে পুকুরে এ ধরনের নৌকাবিলাস পরিবেশিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে পুকুরের চারদিক থাকে দর্শকবেষ্টিত।

নৌকাবিলাসের অভিনয় করার জন্য কৃষ্ণের পোশাকটি হয় বেশ বর্ণিল, তাতে জড়ির কাজ করা থাকে। সাধারণত যাত্রার আসরে রাজা বা সম্রাট চরিত্রগণ যে ধরনের পোশাক পরেন নৌকাবিলাসে অভিনয়ে কৃষ্ণের জন্য সে ধরনের পোশাক পরানো হয়ে থাকে। জানা যায়, এই পোশাকসহ রাধা-কৃষ্ণের মাথার মুকুট ও বাহুবন্ধন ভাড়া করে আনা হয়। এছাড়া, রাধা ও রাধাসখীদের জন্য ব্যবহৃত শাড়ি সংগ্রহ করা হয় গ্রামের নারীদের কাছ থেকে। নৌকাবিলাস আসর পরিচালনার জন্য একজন নির্ধারিত ব্যক্তি থাকেন, তাকে নৌকাবিলাসের পরিচালক বলা হয়। তিনি নৌকাবিলাসের অভিনয় করার জন্য কুশীলবদের সাজসজ্জা করিয়ে থাকেন এবং সাজসজ্জার ভেতর বলে দেন আজকের আসরে নৌকাতে উঠে শ্রীকৃষ্ণকে কী করতে হবে, আবার সখীসহ রাধা কী করবেন সে কথাও জানিয়ে দেন। এরপর সাজ-বাড়ি থেকে কুশীলবদের ভেতর থেকে প্রথমে কৃষ্ণ ও পরে সখীসহ রাধাকে সঙ্গে করে পরিচালক নৌকাবিলাসের অভিনয় করার জন্য নির্ধারিত পুকুর পাড়ে নিয়ে যান। কৃষ্ণ বাঁশি হাতে পুকুরঘাটে বাঁধা নৌকার বাঁধন খুলে তাতে উঠে পড়েন এবং লগি দিয়ে নৌকাটিকে নিয়ে যান মাঝপুকুরে। এবার কলসি কাঁখে একদল সখীসহ শ্রীরাধা আসেন সেই পুকুর পাড়ে। ইশারায় রাধা পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণকে পার করে দেবার জন্য ডাকতে থাকেন। কৃষ্ণ সে যাকে নৌকা বেয়ে শ্রীরাধার কাছে এসে বৈঠা দিয়ে পানির ছিটানী দিয়ে আবার মাঝ পুকুরে চলে যান। শ্রীরাধা ইশারায় অনেক বিনয় করে পুনরায় পাটনিরূপী শ্রীকৃষ্ণকে নদী পার করে দেবার কথা জানান। কৃষ্ণ এবার রাধাকে পুকুরের অন্য পাশে আসার ইঙ্গিত করেন, সখীসহ রাধা সে দিকে যান, কৃষ্ণ তখন তাদেরকে

Dhaka University Institutional Repository

আরো সরে আসতে বলেন এবং কখনো কখনো শ্রীরাধাকে নৌকায় তোলার জন্য হাত বাড়িয়ে দেন। রাধার হাত বাড়িয়ে দিতেই তিনি আবার বৈঠা দিয়ে পানি ছিটিয়ে মাঝ পুকুরে চলে যান। এভাবেই পরিবেশকেন্দ্রিক নৌকাবিলাসের অভিনয় চলতে থাকে কোনো প্রকার সংলাপ বা গীতি-নৃত্য ছাড়া।[২৯]

নৌকাবিলাসের আগের জৌলুস তেমনভাবে না-থাকলেও টাঙ্গাইল জেলায় এর অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আগে টাঙ্গাইলসহ আরও অনেক অঞ্চলের বহু গ্রামেই নৌকাবিলাসের অভিনয় হত। বর্তমানে খুব কম গ্রামেই নৌকাবিলাসের অভিনয় হয়ে থাকে। টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর থানার নগরভাদগ্রামে নৌকাবিলাসের বেশ কিছু শিল্পী-অভিনেতা রয়েছে। তাদের মধ্যে নৌকাবিলাসের পরিচালক হিসেবে সোনাউল্লাহর নাম সর্বাধিক প্রচারিত।

৩.৪ মণিপুরী নটপালা

'নট' শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'নর্তন' বা 'নৃত্য করা' এবং 'নর্তক', 'নটুয়া', 'সূত্রধর' ইত্যাদি। মণিপুরী নটপালার মুখ্য উপাদান হচ্ছে নৃত্য, গীত এবং তাল। লক্ষ করার বিষয় নটপালার পরিবেশনাতে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে কোনো সুর-যন্ত্র ব্যবহার করা হয় না, যা কিছু ব্যবহার করা হয় তার সবটাই তাল-যন্ত্র। আর নৃত্যের মুখ্য উপাদান হচ্ছে তাল। নটপালার এক একটি পর্বের পর থাকে 'পুঙ চলম' নামে এক বিশেষ প্রকারের নৃত্য, যে নৃত্যে মৃদঙ্গ বাদকগণ বাদ্যের তালে তালে মৃদঙ্গ সহকারে শূন্যে লাফিয়ে দেহ ঘূর্ণন করেন। আসলে নটপালার পুরো পরিবেশনে নৃত্য এবং রাধা-কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক পালা বা আখ্যান নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকে। সেদিক দিয়েই হয়তো পরিবেশনাটির নাম নটপালা হয়ে উঠেছে।

নটপালার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বাংলাদেশের মণিপুরীদের ধারণা, এটি প্রথম ভারতের মণিপুরী প্রদেশে আনুমানিক সপ্তদশ শতকে প্রচলিত হয়। পরবর্তী সময়ে সেখানে থেকে বাংলাদেশে অভিবাসিত মণিপুরীগণ অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে এদেশে নটপালার প্রচলন শুরু করেন। প্রায় দুই শতাধিক বছর ধরে বাংলাদেশের মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীগণ নটপালার প্রচলন অব্যাহত রেখেছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর আখ্যানবস্তু অবলম্বনে নটপালার বিভিন্ন পর্ব পরিবেশিত হয়ে থাকে। যেমন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর দানখণ্ডে কৃষ্ণ দানী সেজে যমুনার ঘাটে রাধার পথ রোধ করেন। দানখণ্ডে এ ঘটনার সুস্পষ্ট বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। মণিপুরী নটপালা পরিবেশনের 'পথরুদ্ধ' পর্বের সূচনাংশের সাথে যার তুলনা চলে।

সাধারণত মণিপুরী রাস উপলক্ষে মন্দিরের সম্মুখস্থ মণ্ডপে বৃত্তাকারে নৃত্য সহযোগে পুরুষ গায়েনগণ এই নটপালা পরিবেশন করে থাকেন। তবে, বিভিন্ন সামাজিক কৃত্যানুষ্ঠান–শ্রাদ্ধে বা সরাতে, লহঙ বা বিয়েতে এবং জন্ম-বিষয়ক আয়োজনে গৃহাঙ্গনে বা উঠানে নটপালার আসর বসে থাকে। খোলা স্থানের উপরে চাদোয়া টানিয়ে সমতল ভূমিতে নটপালার মঞ্চ বা আসর করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

হাতের করতাল, কাঁধে ঝোলানো উত্তরীয় এবং বাদ্যযন্ত্র মৃদঙ্গকে অভিনয় উপকরণ হিসেবে নটপালাতে ব্যবহার করতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যেমন—নটপালা পরিবেশনের এক পর্যায়ে 'যমুনা জল খেলিবারে/অঙ্গের বসন রাখো তীরে/তটের বসন আমি চুরি' ইত্যাদি সংলাপ প্রয়োগ মুহূর্তে গায়েন তার কাঁধের উত্তরীয় এক হাতে তুলে রাধা ও রাধাসখীদের বস্ত্র চুরির বর্ণনাত্মক অভিনয় করেন।

নটপালাতে সাধারণত বারোজন শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। এদের প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচয় দেওয়া হয়। যেমন—নটপালার মূলগায়েনকে 'ইশালপা', মূলগায়েনের সহযোগীকে 'দোহার', মৃদঙ্গবাদকদেরকে 'ডাখুলা' আর করতালবাদকদেরকে 'পালা' বলা হয়ে থাকে। নটপালার প্রতিটি আসরে দুই থেকে তিন জোড়া 'ডাখুলা', একজন 'ইশালপা', একজন 'দোহার' বা সহযোগী গায়ক এবং ছয় থেকে আটজন 'পালা' বা করতালবাদকের প্রয়োজন পড়ে।

নটপালা পরিবেশনে কুশীলবগণ ধুতি ভিন্ন সাধারণত তেমন কোনো পোশাক পরিধান করেন না। খালি গায়ে এক কাঁধে ঝোলানো থাকে সাদা একটি উত্তরীয়। নটপালাতে মৃদঙ্গ আর করতাল ভিন্ন অন্য কোনো বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার প্রত্যক্ষ করা যায় না। তবে, বাদ্যযন্ত্র হিসেবে নটপালার আসরে মৃদঙ্গ লাগে দুই থেকে ছয়টি পর্যন্ত আর করতাল লাগে ছয় থেকে আট জোড়া। এর পরিবেশনের প্রারম্ভেই থাকে ধীরলয়ের মৃদঙ্গ-করতাল বাদনের সাথে নৃত্য সহযোগে মূলগায়েন বা ইশালপার রাগালাপ। তারপর যথাক্রমে থাকে গৌরাঙ্গ বন্দনা বা গৌরচন্দ্র, গুরু বন্দনা, বৈষ্ণব বন্দনা এবং পরিশেষে মূলপালা পরিবেশন করা হয়।

নটপালা পরিবেশনের মূলপালায় কখনো কৃষ্ণের বাল্যলীলা থেকে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা, কখনো রাধা-কৃষ্ণের সাক্ষাৎ, প্রেম-অভিমান ও মিলন পর্ব পরিবেশিত হয়। তবে, প্রতিটি পালার মূল আখ্যান পরিবেশনের শেষে থাকে মনশিক্ষা বিষয়ক গীতি-নৃত্য এবং মৃদঙ্গ বাদন যুক্ত ফাগুখেলা।

নটপালা পরিবেশনে প্রত্যক্ষ করা যায়, বন্দনা পর্বের পর মূলগায়েন বা ইশালপা গীতল পদ্যছন্দের কাহিনি বর্ণনার ভিতর দিয়ে পালার মূল আখ্যানে প্রবেশ করেন। এর ঠিক পরেই থাকে দুটি চরিত্র রাধা-কৃষ্ণের চরিত্রমূলক উক্তি-প্রত্যুক্তি, যে উক্তি-প্রত্যুক্তিতে মূলগায়েন বা ইশালপা কৃষ্ণ চরিত্রে এবং সহ-গায়েন অর্থাৎ দোহার রাধা চরিত্রের অভিনয়ে অংশ নেন।

রাধা-কৃষ্ণের প্রথম পর্যায়ের উক্তি-প্রত্যুক্তির পর থাকে মূলগায়েনের সংক্ষিপ্ত কাহিনি বর্ণনা ও চরিত্র বর্ণনা। এই বর্ণনার শেষে এসে মূলগায়েন পুনরায় কৃষ্ণ চরিত্রে ফিরে গিয়ে কৃষ্ণের গীত-সংলাপ শুরু করেন, যার প্রত্যুত্তরে রাধা চরিত্রে সহ-গায়েনও গীত-সংলাপে অংশ নেন। তাদের এইরূপ গীত-সংলাপে মৃদু নৃত্য প্রযুক্ত হয়। এ ধরনের নৃত্যযুক্ত গীত-সংলাপের পর থেকে পুরো আখ্যান ভাগ শুদ্ধ ও গীত সংলাপাত্মক অভিনয়ের মাধ্যমেই সাধারণত পরিবেশিত হয়ে থাকে। তবে, কখনো দ্রুত আখ্যান ভাগের সমাপ্তির প্রয়োজনে মূলগায়েন বা ইশালপা পুনরায় কথা বর্ণনা ও গীত বর্ণনার আশ্রয় নিয়ে থাকেন। সংলাপাত্মক অভিনয়ে হাতে ধরা করতালের পুচ্ছভাগে ঝুলন্ত রঙিন সুতা এবং কাঁধের সাদা উত্তরীয়ের বহুবিধ ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

নাটগীত হিসেবে নটপালা পরিবেশনের মূল আখ্যানের বর্ণনায়, সংলাপে বা উক্তি-প্রত্যুক্তিতে, গীতে কোথাও ভণিতা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বর্ণনায় তো ভণিতা আছেই এমনকি উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক পদগুলির অন্তেও যে ভণিতা আছে, তা অনেক ক্ষেত্রেই সংলাপের সংগে মিশে গিয়ে শুদ্ধ সংলাপরীতির পক্ষে প্রতিবন্ধকতা রচনা করেছে। নটপালা পরিবেশনা ভণিতাহীন থাকায় সে ধরনের কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় না।

এবারে মণিপুরী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নটপালা পরিবেশনের আসর, অভিনয় স্থান, আলো, পোশাক, বাদ্যযন্ত্র ও অভিনয়-শিল্পী সম্পর্কিত প্রাথমিক তথ্যের পাশাপাশি এই নাট্যরীতির ভিন্ন ধরনের কিছু বিশেষত্ব নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

নটপালার আসরে উপস্থিত থেকে দেখা গেছে যে, এ শ্রেণির নাট্যের প্রারম্ভে গায়েন-বাদকেরা এক ধ্যানে মৃদঙ্গ-করতাল বাজাতে থাকেন। এই মৃদঙ্গ-করতালের ধ্বনি ক্রমশ ধীরলয় থেকে দ্রুতলয়ে প্রবেশ করে-তাতে যেন-বা প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টির নিরবচ্ছিন্ন এক আমেজ ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র আসরে। আসর শুরুর এই যন্ত্রসঙ্গত সম্পর্কে গায়েনদের বক্তব্য হচ্ছে যে, 'বাদ্যযন্ত্র মৃদঙ্গ-করতালের মাধ্যমে সম্পূর্ণত গৌর গুরুমূর্তি তৈরি করা হয় দেহের (মনের) ভিতরে। এই মূর্তি আমাদের মধ্যে থেকেই এই সংকীর্তন করে।'[৩০] শুধু তা-ই নয়, মূলগায়েন বা ইশালপা তার এরকম কথার ব্যাখ্যায় আরো জানান যে, 'এই আসরে চৈতন্যপ্রভু আমাদের নিজের ভিতরে চলে আসবে...এই গান গাইতে গাইতে। এই করতাল, এই মৃদঙ্গ বাজবে...তার ভিতর থেকে নিজের দেহের ভিতরে বা দেহমন্দিরে চৈতন্যপ্রভুর অবস্থান যখন আসবে, তখন সে নিজে থেকেই কথা বলা শুরু করবে...গলায় ভর করে বা জিহ্বায় ভর করে।...তাল-লয়-সুরের মাধ্যমে গৌরাঙ্গ মূর্তিকে আমাদের ভিতরে ধারণ করা হবে এবং যখন ধারণ করা হবে, তখন সে প্রকাশ করবে অভিনয়ের মাধ্যমে এবং ভক্তদেরকে গৌরাঙ্গপ্রভু আকর্ষিত করবে। যার তুলনা হবে মথুরা।'[৩১]

গায়েনদের এ সকল বক্তব্যে নটপালার আসরে বাদ্য-গীতের মাধ্যমে ভাব-রস সঞ্চারের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে ভাব-রসের আশ্রয়ে অভিনেতাগণ বৈষ্ণব-গৌরাঙ্গ রূপে অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শক-ভক্তদেরকেও ভাব-রসে আক্রান্ত বা আকর্ষিত করেন।

রাগালাপ : নটপালার আসর শুরুর ডাখুলা (মৃদঙ্গ বাদক) ও পালা (করতাল বাদক)-দের সম্মিলিত যন্ত্রসঙ্গতের প্রথম পর্যায়ের পর আসে ইশালপার রাগালাপ এবং ডাখুলা-পালাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের মিশ্রিত যন্ত্রবাদন। যে যন্ত্রবাদনের মধ্যে ইশালপা রাগালাপ করেন :

তাই রি না তা নাই রি। তিরি রি রি রি...
তাই রি না তা নাই রি। তিরি রি রি রি...
তাই রি না তা নাই রি।তিরি রি রি রি...।

Dhaka University Institutional Repository

এরকম রাগালাপের পর আসে গুরুবন্দনা, বৈষ্ণববন্দনা (উল্লেখ্য, আসরে উপস্থিত সকল ভক্তই বৈষ্ণব), গৌরচন্দ্র বা গৌরচন্দ্রিকা–'জয়ও জয়ও জয়ও গৌরাঙ্গ চরণে...', আখ্যান, মনশিক্ষা এবং ফাগুখেলা।[৩২]

গৌরচন্দ্র পর রাধার রূপ বর্ণনা এবং রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কে শাস্ত্রীয় কথন শেষে আখ্যানে প্রবেশ করেন ইশালপা (মূলগায়েন)। তার সঙ্গে উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক অভিনয়ে অংশ নেন একজন দোহার (মূলগায়েনের সহযোগী) এবং কখনো কখনো পালাদের (করতাল বাদকদের) কেউ কেউ।[৩৩] এ পর্যায়ে মণিপুরী বৈষ্ণব সম্প্রদায় পরিবেশিত নটপালার 'পথরুদ্ধ' আখ্যানের কিঞ্চিৎ উদাহরণে যাচ্ছি :

বর্ণনাত্মক পদ্য : শ্রী রাধা ব্রজের মহিমা। কীর্তিশোভাময়ী। শ্রীরাধা প্রেমের মহিমা। কীর্তিশোভা দিও...রাধাকৃষ্ণ একই আত্মা-দুই দেহ ধরি অন্যান্যে বিরাজ করে। সেই দুই দেহ এসো ভাবও কথা লয়ে করও গো এথায় বিরাজে। আজ গৌরাঙ্গ চাঁদ একা অবতারও লয়ে নিজ কাজ সাঙ্গ করি। সত্যযুগে ছিল ঋষি, ত্রেতাযুগে হইল রাম, দাপরেতে কালা ধরিল গোপী ...কলিকালে নিজ প্রিয় ভক্তগণ লইয়া উদয় হইল গৌরচাঁদ সদয়ও হইয়া।

বর্ণনাত্মক গীত : বসন্ত আগত...
মানে না মানে না মানে
মন করে উচাটন...

বর্ণনাত্মক গদ্য : মধুরসের বৃন্দাবনে রাই-কান্হু কুঞ্জতীরে দরশনও ভেল।

বর্ণনাত্মক পদ্য : কৃষ্ণ দেখি বহুবিধ ভাব উপর্জ্জিল ॥
কিল কিঞ্চিৎ ভাবও আদি কইলো আকর্ষণ।
পলকি নিহারে ভরে চকিত নয়ন ॥
লজ্জা-ভয়ে সুন্দরী পরাভদ্র করি।
কুঞ্জেরও বাহিরে চলে পদ দুইচারি ॥

বর্ণনাত্মক গদ্য : হেনকালে কৃষ্ণচন্দ্র পথরুদ্ধ করে।

কৃষ্ণের উক্তি : শুন রাধে কমলিনী দুশোভন দিয়ে।
আমায় ছাড়ি কোথা যাবে প্রাণও প্রিয়ে ॥

বর্ণনাত্মক পদ্য : রাই দেখি সুনাগরও জাগরিত হইয়া।
পথরুদ্ধ করি রহে ভুজ প্রসারিয়া।

কৃষ্ণের উক্তি : কুথা যাবে প্রাণো প্রিয়ে আমাকে ছাড়িয়া।
সঙ্গেতে বান্ধিয়া লেহ মোরে প্রেমো দরদিয়া ॥

Dhaka University Institutional Repository

রাধার প্রত্যুক্তি : ও কথা না কইও এবে পরানো মাধব।
ইষ্ট পূজারী যদি হও তবে এ কেমন স্বভাব ॥
লোকো লজ্জা নাহি তোরে পুরানো নাগরো...

বর্ণনাত্মক সংলাপ : কৃষ্ণ কহে-সখা নহে আমি নন্দেরো গোপাল।

বর্ণনাত্মক সংলাপ : রাই বলে-কত গোপাল দেখি পালে পাল ॥[৩৪]

এ রকম গীতি সংলাপের মধ্যে কখনো তারা গদ্য সংলাপ এবং বর্ণনাত্মক গদ্যে প্রবেশ করেন পরিশেষে আবার গীত সংলাপে ফিরে যান। সংলাপ বিনিময়ের এক পর্যায়ে আখ্যানে রাধা-কৃষ্ণের মিলন ঘটে। সেই মিলন বর্ণনায় আসরে উপস্থিত নারী ভক্তগণ উলু ধ্বনি দেন।

নটপালা পরিবেশনের আখ্যানাংশ এখানে শেষ হলেও পরিবেশনের ইতি ঘটে ফাগুখেলা ও মনশিক্ষা দিয়ে। নটপালার আখ্যানাংশ পরিবেশনের পর আসে ফাগুখেলা। এই পর্বে ডাখুলারা উন্মত্ত মৃদঙ্গ বাদন করেন। ডাখুলাদের এই মৃদঙ্গ বাদনের সাথে পালারাও করতাল বাজাতে থাকেন। মৃদঙ্গ-করতালের ধ্বনিতে আসরে তাই নতুন এক গতি ও আবেগ সঞ্চারিত হয়। এতে ভক্ত-দর্শক-শ্রোতাদের চোখ-কান-মন আটকে যায় আসরের কেন্দ্রবিন্দুতে। কেননা, ডাখুলাদের মৃদঙ্গ বাদনের সাথে যুক্ত হতে থাকে জাদুকরি এক নৃত্য। সে নৃত্যে একটি পর্বের পর ইশালপা ও দোহার তাদের পালা পরিবেশনের মধ্যে প্রথমবারের মতো বিশ্রাম খুঁজে পান। আর দর্শকেরাও ওই সময়টাতে ভিন্নতর একটি অভিজ্ঞতা সূত্রে আসরের সঙ্গে যুক্ত থাকেন।[৩৫]

নটপালার একটি পালার পরিবেশনা এখানেই শেষ নয়। এরপর আবারও ফিরে আসে আকর্ষণীয় ফাগুখেলা। ফাগুখেলায় ডাখুলা-পালাদের মৃদঙ্গ-করতাল বাদনের উত্তেজনাময় ধ্বনির মধ্যে আসর শেষ হয়। নটপালার আখ্যান পরিবেশনে মণিপুরী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সকল শিল্পীদের মধ্যে 'ইশালপা' ও 'দোহার' তাদের অভিনয়ে রাধাকৃষ্ণের ভাব-রসকে এতটাই দৃঢ়ভাবে ধারণ করেন যে, অভিনয়কালীন তাদেরকে রাধা বা কৃষ্ণের চরিত্রায়ণ থেকে এক মুহূর্তের জন্যও ভিন্ন মনে হয় না। এতদ্ব্যতীত, নটপালার অভিনয়ে গায়েন-শিল্পীগণ ভাব-রসকে যে বিশ্বস্ততায় অঙ্গে ধারণ করেন, তাতে করে তাদেরকে কখনোই আখ্যান বর্ণনাকারী গায়েন হিসাবে বা রাধা-কৃষ্ণের চরিত্র হিসেবে ভিন্ন কোনো সাজপোশাকেরও প্রয়োজন পড়ে না। আসরে উপস্থিত দর্শক-ভক্তগণ অভিনয়ের ভাব-রসে আপ্লুত হয়ে যেমন করে একজন সাধারণ পুরুষ গায়েনকে কৃষ্ণ মেনে নেন, তেমনি সাধারণ আরেকজন পুরুষ গায়েনকে রাধা মেনে নেন। আসলে, ভাব-রসে অভিষিক্ত হলে 'সকলই হয় আপন মনের গুণে...।'

মূলগায়ক বা ইশালপাকেই নটপালার আসরের পরিচালক ধরা হয়ে থাকে। কেননা, তার নিয়ন্ত্রণেই নটপালা অভিনীত হয়ে থাকে। এ ধরনের পরিবেশনা গীতি এবং নৃত্য প্রধান হলেও আসরের সর্বত্র নাটকীয় বর্ণনা ও উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক সংলাপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। আসর পরিচালনার সময়ে ইশালপা'র সঙ্গে উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক সংলাপে অংশ নেন কেবল দোহার।

Dhaka University Institutional Repository

নটপালার বর্তমান অবস্থা অনেকটা সঙ্কটের মুখে। কেননা, প্রবীণদের পাশাপাশি শিল্পী হিসেবে নতুনতর প্রজন্মের খুব কম সংখ্যক মণিপুরীই আগ্রহী। আধুনিক শিক্ষা তাদের নিজস্ব কৃত্যাচারকেন্দ্রিক পরিবেশনের আবশ্যিক চর্চা থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। তবু, আশার কথা কিছু আধুনিক শিক্ষিত এবং সচেতন তরুণ তাদের সংস্কৃতির প্রবহমান ধারাটিকে সজীব রাখতে নিজেকে নটপালা পরিবেশনের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত রেখেছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী জনগোষ্ঠীর মধ্যে মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানার বিভিন্ন গ্রামে নটপালার কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী-কুশীলবের বসবাস রয়েছে। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হচ্ছেন—হরিনারায়ণ সিংহ, লক্ষীণ সিংহ, কনুং সিংহ, বাবুসেনা সিংহ, গৌরমোহন সিংহ, ধীরেন্দ্র সিংহ, গোপীচান সিংহ, মঙ্গলচরণ সিংহ, রবি সিংহ, রাজকান্ত সিংহ, পূর্ণচন্দ্র সিংহ প্রমুখ।

৩.৫ মণিপুরী গোষ্ঠলীলা ও রাখালনৃত্য

গোষ্ঠ এবং লীলা শব্দ দু'টির সংযোগ 'গোষ্ঠলীলা' শব্দটি গঠিত হয়েছে। এর মধ্যে গোষ্ঠ কথাটির অর্থ হচ্ছে গো চারণ ভূমি বা গোস্থান। আর লীলা শব্দটির অর্থ 'খেলা' বা 'ক্রীড়া'। তবে, 'গোষ্ঠলীলা' শব্দটি একটি বিশেষ অর্থ বহন করে, আর তা হচ্ছে গোষ্ঠে কৃষ্ণের গো চারণলীলাপর্ব।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে বাংলাদেশের সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলায় বসতি স্থাপনকারী মণিপুরীরা আজ থেকে প্রায় দেড় শতাধিক বছর পূর্বে ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম এই দেশে তাদের ধর্ম-সংস্কৃতির প্রধান উৎসব রাসলীলার সঙ্গে গোষ্ঠলীলা ও রাখালনৃত্যের সূচনা করেন। সেই থেকে দু'একটি ব্যতিক্রম ভিন্ন মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জের আদমপুর-মাধবপুরের মণিপুরীরা প্রায় প্রতিবছর নিয়মিতভাবে রাস উৎসবের একটি আবশ্যিক অংশ হিসেবে গোষ্ঠলীলা করে আসছেন।

গোষ্ঠলীলা বিভিন্ন পর্ব বিভিন্ন স্থানে অভিনীত হয়। এক্ষেত্রে এর মঞ্চ বা আসর সম্পর্কে বলতে গেলে মন্দির সম্মুখস্থ জোড় মণ্ডপ, খোলা মাঠের গোষ্ঠ কল্পিত স্থান এবং পার্শ্ববর্তী শিবমন্দিরের কথা উল্লেখ করতে হয়। সকল ক্ষেত্রেই পরিবেশনা স্থানের চতুর্দিকে বাঁশের ঘের দেওয়া থাকে। দর্শক-ভক্ত এবং অভিনেতাদের পরিবারের লোকজন থাকে বাঁশের ঘের ঘেঁষে। আসর বা মঞ্চকে ভূমি সমতলে প্রত্যক্ষ করা যায়।

গোষ্ঠলীলার জন্য শিশু-কিশোরদেরকে মাংকোল বা ঘরের বারান্দার কৃষ্ণ বা রাখাল সাজানো হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কৃষ্ণ বা রাখাল বারান্দায় একটি টুলের উপর বসে পড়লে বাড়ির মেয়েরা এবং নিমন্ত্রণ করে আনা সাজনদার একে একে তাদের মাথায় ময়ূরের বহুবর্ণ চূড়া বেঁধে দেন। চূড়ার নিচে লাল রঙের লেট্রেং, কপনাম সংযুক্ত করেন; শুধু তাই নয়, মাথার চূড়া থেকে আরও নামিয়ে দেন জোড়াফুল, জুড়া বা চুল; গলায় ফুলদান বা মালা পরিয়ে পাঙপঙ দুই বাহুতে বেঁধে দেন; এরপর একে একে থাবেরেত, থবল, ঘুঙুর, খাড়ু, আঙটি আর পিছনদারী পরিয়ে তাদেরকে রাজকীয় রূপে সাজায়ে দেন। সকালে তাদের পায়ে এবং হাতের তালুতে আলতা দেওযা হয়। গোষ্ঠলীলার জন্য ঘরের বারান্দাতেই সাধারণত সাজসজ্জা করানো হয় বলে আলাদা কোনো সাজঘরের প্রয়োজন হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

গোষ্ঠলীলা ও রাখালনৃত্যের অভিনয়ে শিশুরা সাধারণত সুসজ্জিত বা বর্ণিল বাঁশের বাঁশরী ব্যবহার করে থাকেন। এছাড়া, গোষ্ঠবিদায় ও গোষ্ঠ শেষে কৃষ্ণ ও রাখালদের গৃহে আমন্ত্রণের আরতিতে মা যশোদা-রোহিণী কাঁসার থালায় সাজানো জ্বলন্ত মোমবাতিকে অভিনয় উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেন। গোষ্ঠলীলা ও রাখালনৃত্যের অপরাপর চরিত্র যেমন—নারদ-ঋষি, কংসের যোদ্ধা, দইওয়ালা প্রমুখ চরিত্র গোষ্ঠে তাদের ভূমিকা অনুযায়ী ঘটি, তরবারি, মাটির পাত্র ইত্যাদি অভিনয় উপকরণ ব্যবহার করেন।

গোষ্ঠলীলা ও রাখালনৃত্যে অংশগ্রহণকারী সকল রাখালকে স্বাভাবিক জীবনে ব্যবহৃত পোশাক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রকমের পোশাক পরিধান করতে হয়। সে পোশাকের ধরন হয় অনেকটা ঐতিহ্যবাহী এবং রাজকীয়। এ ধরনের রাজকীয় পোশাক ব্যবহারের কারণ হচ্ছে, মণিপুরী রাস ও গোষ্ঠলীলার প্রচলন করেন বিখ্যাত মণিপুরী রাজা ভাগ্যচন্দ্র। তবে, রাখালগণ ছাড়া গোষ্ঠে অংশগ্রহণকারী যশোদা-রোহিণী কিংবা দইওয়ালা স্বাভাবিক জীবনের পোশাক পরিধান করেন। গোষ্ঠলীলায় রাখালনৃত্য পরিবেশনে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে সাধারণত করতাল ও মৃদঙ্গ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

গোষ্ঠলীলা ও রাখালনৃত্যের কুশীলবদের সকলেই মণিপুরী জনগোষ্ঠীর গ্রামীণ শিশু-কিশোর। প্রকৃতির ভেতর তারা কেউ কেউ সাধারণ বিদ্যালয়ের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার্থী। কিন্তু নৃত্যাভিনয়ে তারা সুপটু। জন্ম থেকে দেখে আসা মণিপুরী রাসের রাখালনৃত্য তাদের রক্তের স্পন্দনের সাথে একাত্ম হয়ে যায় বলে গোষ্ঠলীলা করবার জন্য আগে থেকে কোনো অনুশীলনের প্রয়োজন হয় না। রাসের তিথি এলে অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের রাখালনৃত্যে অংশ নেবার জন্য সাজ-পোশাক হিসেবে বিভিন্ন ধরনের সাজ-পোশাক ও অভিনয় উপকরণ কখনো বাজার থেকে আবার কখনো রাস উদ্‌যাপন কমিটির কাছ থেকে সংগ্রহ করেন।

গোষ্ঠলীলার শুরুতেই থাকে বাদ্যকর-গায়কদের কৃষ্ণ-বন্দনা। এক্ষেত্রে তারা আকুল হয়ে রাগালাপ সহকারে কৃষ্ণকে ডেকে বলেন—'এসো হে কানাই এসো/বলি বারে বারে ॥'

পুরুষবাদ্যকর গায়কদের এমন রাগালাপ বন্দনার আকুতির মাঝখানে মৃদঙ্গ ও করতাল ভিন্ন একটি তাল খুঁজে নেয় বন্দনার বাকি অংশ :

নন্দেরও নন্দ কৃপা করে। আইসো যত সঙ্গী সঙ্গে
তোমায় ছাড়া কেহ নাই। কাকে ডেকে কাকে পাই
না আসিলে। তুমি বিনে কানাই মরণদশা হয়ে যায় ॥

এমন বন্দনাগীতে কোনো কোনো নারী কান্নার আবেগে আসরে ছুটে এসে শিশু কৃষ্ণদ্বয়ের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েন। আসর থেকে অন্য কেউ এসে তাকে উঠিয়ে ভক্তদের মধ্যে নিয়ে যান। কৃষ্ণ ও বলরাম রূপী দুইজন শিশু অভিনেতা জোড়মণ্ডপে গিয়ে মা যশোদা-রোহিণী পাশে বসে থাকেন। এর মাঝে কৃষ্ণের সখা রাখালগণ জোড়মণ্ডপে এসে কৃষ্ণ-বলরাম এবং তাদের মা যশোদা-রোহিনীর সামনে বসেন।

Dhaka University Institutional Repository

এবারে বন্দনাগীত শেষে বাঁশি হাতে দুই-দুইজন করে মোট চারজন সখা এসে কৃষ্ণ ও যশোদার সামনে হাঁটু গেড়ে বসেন। তারা ভাঙা ভাঙা কণ্ঠে বাদ্যের সঙ্গে বলতে থাকেন–'চলো গোষ্ঠে/চলো গো কানাই...।' তাদের কথায় কৃষ্ণদ্বয় উত্তর দেন :

আর যাবো না গোষ্ঠে। মাতার কথার বোল বলে। পিতার কথার বোল বলে।বলি
আমি গোষ্ঠে আর যাবো না।

কৃষ্ণের একথার সঙ্গে কৃষ্ণকে গোষ্ঠে নিয়ে যাওয়ার জন্য ডাকতে আসা সখাদের উদ্দেশ্যে এবারে মা যশোদাও গেয়ে ওঠেন :

তোমরা যাও হে। আর গোপাল দিবো না গোষ্ঠে
গোপাল গেলে গোষ্ঠে কানু যাবে তোদের সাথে
কানু বিনে কি করিমুরে।
তোমরা যাও হে। কানু বিনে রইমু কেমনে?

এ পর্যায়ে আসর থেকে বেশ কয়েকজন নারী এসে কৃষ্ণের পায়ের কাছে কান্নায় গড়িয়ে পড়েন। তাদের আবেগ তারা নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করে কাঁদতে কাঁদতে ভক্তদের আসনে ফিরে যান। মা যশোদা কৃষ্ণের কথায় এবং তার সখাদের দাবিতে শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণকে গোষ্ঠে যাওয়ার অনুমতি দেন, সঙ্গে সঙ্গে জোড়মণ্ডপের রাখালদের মধ্যে আনন্দনৃত্য শুরু হয়। সে নৃত্যের মধ্যে মা যশোদা রূপী দুই নারী নেচে-গেয়ে কৃষ্ণ ও তার সখাদের মুখে মিষ্টান্ন দিয়ে বিদায় দেন। জোড়মণ্ডপ থেকে কৃষ্ণ ও তার রাখালসখারা এবারে শিববাজার কদমতলার গোষ্ঠে চলে যান।

এরপর শিববাজার কদমতলাতে শুরু হয় গোষ্ঠের অসংখ্য রাখালের সম্মিলিত নাচ বা রাখালনৃত্য। পাশাপাশি তিনটি মঞ্চে নিরবচ্ছিন্নভাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই নাচ চলে। নাচের মধ্যে থাকে বিচিত্র ভঙ্গিমা।

গোষ্ঠলীলায় কৃষ্ণকে তার সখারা যেভাবে হেনস্থা করেছিল, অথবা সখাগণ সঙ্গে কৃষ্ণ যে প্রকারের লীলায় মগ্ন হয়েছিলেন পুরাণ কাহিনিতে-তা-ই আজ ঘটতে থাকে মণিপুরি সমাজে–দর্শকভক্তগণ অবাক চোখে পুরাণ এবং বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পুরাণকথার দৃশ্যরূপের রসাস্বাদন করে শিহরিত হয়ে ওঠেন।

রাখালনৃত্যের মধ্যেই কৃষ্ণের অসুর নিধন, সন্ন্যাসী ও দই বিক্রেতার সঙ্গে নাট্যাংশের অভিনয় চলে। কিন্ত সব ছাপিয়ে রাখালদের বিচিত্র ভঙ্গিমার বিরতিহীন নৃত্যের ছন্দ, নূপুরের কাঁপন আর সন্ধ্যায় মা যশোদার আরতি দর্শক মনকে আচ্ছন্ন রাখে। আরতিতেই গোষ্ঠলীলাপর্বের শেষ আয়োজন রাখালনৃত্য শেষ হয়। ঠিক সন্ধ্যায় মা যশোদা রূপী একজন নারী একটি কাঁসার থালায় প্রদীপ জ্বেলে আরতি করতে আসেন গান গাইতে গাইতে :

আরতি করে তো নন্দ রানী
ও যে ভানুকও মুখও চায়া

Dhaka University Institutional Repository

আনন্দে গোপালো মুখ হেরি
আরতি করে তো যশোদা রুহিণী।

এই গানে মা যশোদা-রোহিণীর আরতিতে কৃষ্ণ ও তার সকল সখা মায়ের ঘরে ফিরে যান নৃত্যের ভঙ্গি করতে করতে। আর সেখানেই রাখালনৃত্য সমাপ্ত হয়।[৩৬]

গোষ্ঠলীলা ও রাখালনৃত্যের চারদিকে দর্শকদের উপস্থিতি থাকে অত্যন্ত প্রাণবন্ত। দর্শকদের ব্যাপক উপস্থিতির মধ্যে আসর পরিচালনা করেন মূলত রাসধারী মৃদঙ্গ বাদক বা ইসালপা। তিনি অভিনয় স্থানের বৃত্তের বাইরে অবস্থান করে চোখের ও হাতের ইশারাতে রাখালদেরকে এক একটি পর্বের ভিন্ন ভিন্ন নৃত্যভঙ্গির ইঙ্গিত করেন। আর সে ইঙ্গিত মেনেই রাখালগণ সমগ্র গোষ্ঠলীলায় অভিনয় ও নৃত্য করে থাকেন। গোষ্ঠলীলার আগের জৌলুস তেমনভাবে আর না থাকলেও এখনও মৌলভীবাজার জেলার মৈতৈ ও বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীগণ প্রতি বছরই গোষ্ঠলীলার আয়োজন করে থাকেন। এক্ষেত্রে গোষ্ঠলীলার শিল্পী-কুশীলব হিসেবে সাধারণত গ্রামের শিশু-কিশোরেরা অংশগ্রহণ করে থাকলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে যুবক এমনকি বয়স্কদেরকেও রাখাল সেজে গোষ্ঠলীলায় অংশ নিতে দেখা যায়।

৩.৬ রাসলীলা

রস থেকেই রাস কথাটির উৎপত্তি। আর রসাস্বাদনের জন্য যে ক্রীড়া বা লীলা তা-ই রাসলীলা। রাসলীলা সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সেটি দ্বাপর যুগের ঘটনা এবং তার সংঘটন স্থান ছিল শ্রীব্রজধাম। কিন্তু বর্তমান যুগের ভারত ও বঙ্গে যে রাসলীলাকেন্দ্রিক রাস উৎসব হয়ে আসছে—তার প্রচারক হচ্ছেন প্রখ্যাত মণিপুরী রাজা ভাগ্যচন্দ্র। মণিপুরীদের মাঝে লোক-কথা আছে—কয়েক শতাব্দী পূর্বে এই মণিপুরী রাজা ভাগ্যচন্দ্র-ই স্বপ্নাদৃষ্ট হয়ে ভারতের মণিপুরীদের মাঝে নতুনভাবে রাসলীলার প্রচলন শুরু করেন। তৎপরবর্তী সময়ে মনিপুর যুদ্ধের কারণে স্বভূমি থেকে মণিপুরীরা উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন ঠিকই কিন্তু স্বভূমির ধর্ম-সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক পরিচয় থেকে তারা কখনোই নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন রাখেননি। উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থান নিয়ে মণিপুরীরা তাদের বংশ পরম্পরায় বিভিন্ন ধর্ম-সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রতিবছর রাসপূর্ণিমার তিথিতে তাদের রাস উৎসব অব্যহত রেখেছেন। উল্লেখ্য, মণিপুরী প্রবীণেরা এই উৎসবকে রাসলীলা বলতেই অধিক পছন্দ করেন।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে বাংলাদেশের সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ জেলায় বসতি স্থাপনকারী মণিপুরীরা আজ থেকে প্রায় দেড় শতাধিক বছর পূর্বে ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম এই দেশে তাদের ধর্ম-সংস্কৃতির প্রধান উৎসব রাসলীলার সূচনা করেন। সেই থেকে দু'একটি ব্যতিক্রম ভিন্ন মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জের আদমপুর-মাধবপুরের মণিপুরীরা প্রায় প্রতিবছর নিয়মিতভাবে রাস উৎসব করে আসছেন। মহারাস অনুষ্ঠিত হয় মণিপুরীদের পূজামণ্ডপের সামনের স্থায়ী এক বা একাধিক জোড়মণ্ডপে। রাসলীলার জন্য মূল অভিনয়-নৃত্য স্থান বৃত্তাকারে বাঁশের চটার ঘের দিয়ে সাদা রঙের কাগজের ফুল বা

Dhaka University Institutional Repository

ঝালটের সাহায্যে সুন্দর করে সাজানো হয়। বৃত্তাকার অভিনয়-নৃত্য স্থানকে কেন্দ্র করে চতুর্দিকে দর্শক-ভক্ত বসেন। আসরের প্রায় তিন দিক নারী ও শিশুদের জন্য বরাদ্দ থাকে, আর একদিকে পুরুষ দর্শক-ভক্ত বসেন।

রাসলীলা পরিবেশনকারী সকল শিল্পী ও নৃত্যকার মণিপুরী নৃত্য সংশ্লিষ্ট ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও অলঙ্কার পরে বিশেষভাবে সাজসজ্জা গ্রহণ করে থাকেন। সাধারণত নিজ নিজ বাড়ি থেকে সাজ গ্রহণ করে শিল্পী-নৃত্যকারগণ রাসমণ্ডপে আসেন। এক্ষেত্রে সাজঘর হিসেবে শিল্পী-নৃত্যকারগণ নিজ নিজ বাড়ির সাধারণ শোবার ঘরকেই ব্যবহার করে থাকেন।

রাসলীলা নাট্যে অভিনয় উপকরণ হিসেবে প্রধানত প্রদীপ, থালা, মোমবাতি, ফুল, মালা, পানি, পাতা, বর্ণিল কাপড়ের আসন, কাঁচ বা কাঁসার গ্লাস, বাঁশি, সুঁই-সুতা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

রাসপূর্ণিমার দিন রাত্রি ১২টার দিকে মাধবপুর গ্রামে পাশাপাশি অবস্থানের তিনটি জোড়মণ্ডপে প্রায় একসঙ্গে মণিপুরীদের রাসলীলার মূলপর্বের সূচনা হয়। সূচনাতেই থাকে প্রতিটি মণ্ডপের প্রবেশপথ ঘেঁষে বাদ্যকর ও গায়েন-দোহারদের সম্মিলিত বাদ্যের ঐকতান। তারপর থাকে সম্মিলিত কণ্ঠে একটি রাগিণী বা রাগাশ্রিত ভক্তিমূলক গান। যার ঠিক পর পরই শুরু হয় রাসলীলার প্রথম অঙ্ক। প্রথমে থাকে আগমনী। আর এই আগমনীতে একটি কিশোরী রাজকীয় নাচের পোশাকে বৃন্দার ভূমিকায় মণ্ডপ প্রণাম করে নৃত্য শুরু করেন। শুরুতে এই বৃন্দা দূতি তার দুই হাতে নৃত্যের বহুবিধ ভঙ্গিমা করেন এবং তার সে হস্ত-নৃত্যের ভঙ্গিমার মধ্যে রাসধারী গায়েনবৃন্দ আগমনীর সুরে একটি বর্ণনাত্মক গীত পরিবেশন করতে থাকেন।

বর্ণনাত্মক গীত : জয় বৃন্দাবন চিন্তামণিধাম
সাজি আইলা বৃন্দাদেবী অতি মনোহর
প্রবোধ দিয়া কই হে বৃন্দা শুন বৃক্ষলতা
জাগি রহ আজু কৃষ্ণ আসিবেন হেথা... ॥

রাসমণ্ডপের বৃত্তাকার অভিনয়-নৃত্য মঞ্চের বাইরে অর্থাৎ বৃত্তের পরিধির এক পাশে বসা রাসধারী গায়েন বৃন্দার আগমনী-নৃত্যের মধ্যে উপর্যুক্ত বর্ণনাত্মক গীত পরিবেশন করেন।

নৃত্য, অভিনয় ও গীত সমন্বয় : বৃন্দার আগমনী গীতি-নৃত্য শেষ হলে শুরু হয় প্রদীপ আরতি। প্রদীপ আরতিতে বৃন্দা দূতির হাতে ধরা প্রদীপের আলোতে চমৎকার এক ঢেউ খেলে যায়। বৃন্দা সে আলোকের ঢেউ খেলানো নৃত্যে ঘুরতে থাকেন মণ্ডপ মধ্যবর্তী ছোট একটি গাছকে কেন্দ্র করে। বৃন্দার হাতে প্রদীপের পাত্র হিসেবে কাঁসার থালা ব্যবহৃত হয়। থালার উপরে প্রদীপ হিসেবে বিভিন্ন বর্ণের মোমবাতি এবং কাদার উপর লোবানকাঠির মতো বাঁশের কাঠি সংযুক্ত করে তাতে আগুন লাগিয়ে প্রদীপ সৃজন করা হয়। বৃন্দার ধেই ধেই মাত্রার নৃত্যের মধ্যে প্রদীপের শিখাগুলোও স্বমহিমায় নৃত্যরত হয়ে ওঠে গায়েনদের গানের সঙ্গে—'আমি কৃষ্ণের প্রেমে কাঙালিনী। বৃন্দাবনে বৃন্দা দুর্ভাগিনী... ॥'

গান শেষে প্রদীপের থালা রেখে বৃন্দা এবারে আবার কিছুক্ষণ মুক্ত হাতের নৃত্য করেন। এরপর বাম হাতে একটি কাচের স্বচ্ছ একটি কাঁচের গ্লাস তুলে নেন। গ্লাসের মধ্যে গোলাপি রঙের পানিতে সুগন্ধি

Dhaka University Institutional Repository

দৃশ্যমান। মুহূর্তের মধ্যে দেখা গেল বৃন্দার ডান হাতে একটি পাতা-বাহারের পাতা সমেত ডাল এবং বৃন্দা সেই ডালটিকে নৃত্যের মাঝে সুগন্ধি ছেটানোর কাজে ব্যবহার করতে শুরু করেন। মণ্ডপের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে সে অপরূপ নৃত্যের ভঙ্গিমায় সুগন্ধি ছেটাতে থাকেন পাতাবাহারের বিচিত্রবর্ণের পাতা সমেত শাখা দিয়ে। বৃন্দা এস্থলে অপরূপ এক সুগন্ধিকরী হয়ে ওঠেন। বৃন্দার এই পুষ্পপত্র হাতে সুগন্ধি ছেটানো নৃত্য মুহূর্তে গায়েনদের গীত শোনা যায় :

আওত শ্রীবৃন্দাদেবী। নিকুঞ্জ কাননে আজু। ফলফুল প্রফুল্লিত কুসুম কাননে
নানা জাতি ফল ফুল তোলে বৃন্দাদেবী। মাধবী মালতী ফুল তোলে বৃন্দাদেবী ॥

এবারে সুগন্ধি রেখে বৃন্দার ফুল সংগ্রহ পর্ব। বৃন্দা ফুলের থালা হাতে এবারে নৃত্যের মাঝে ফুল সংগ্রহে বের হন, তিনি মণ্ডপের কেন্দ্রে রাখা ফুলগাছ থেকে কয়েকটি কাগজের ফুল সংগ্রহ করেন। শুধু তা-ই নয়, বৃন্দা মালা গাঁথেন। তার আগে বৃন্দা ফুলের থালা হাতে কিছুক্ষণ আনন্দ নৃত্য করে নেন। এক্ষণে তিনি মণ্ডপ জুড়ে কিছুক্ষণ ঘুরে ঘুরে এই নৃত্য করে নিয়ে এক স্থানে একটুখানি বসে অভিনয়ের মাধ্যমে সুঁই-সুতার সাহায্যে সত্যি সত্যি মালা গাঁথেন। বৃন্দা আসন নিয়ে নৃত্যাভিনয় করে করে এক পর্যায়ে মণ্ডপের এক স্থানে আসনটি পেতে দেন এবং আসনে সুগন্ধি ছিটিয়ে নিজে প্রস্থান করেন। রাসের প্রথম অঙ্ক বৃন্দার নৃত্যাভিনয় এখানেই শেষ।

এবারে মণ্ডপে বালকরূপী এক কৃষ্ণের আগমন ঘটে। শুরু হয় দ্বিতীয় অঙ্কের নৃত্যাভিনয়। শুরুতেই দেখা যায়, কৃষ্ণ বৃত্তাকার নৃত্যাভিনয় মঞ্চের প্রবেশ পথে আসন করে ঘুমিয়ে আছেন। তার এক হাতের মুঠোর মধ্যে জরি দিয়ে সজ্জিত একটি বাঁশি। সাজসজ্জার দিক দিয়ে কৃষ্ণও পিছিয়ে থাকেন না। তার মাথায় ময়ূরের বহুবর্ণ চূড়া, চূড়ার নিচের দিকে লাল রঙের লেট্রেং, কপনাম, শুধু তা-ই নয় মাথার চূড়া থেকে জোড়াফুল, জুড়া বা চুল, গলায় ফুলদান বা মালা ঝুলতে দেখা যায়। কৃষ্ণের দুই বাহুতে পাঙপঙ বাঁধা; এছাড়া তার আরো আভরণে থাবেরেত, থবল, ঘুঙুর, খাড়ু, আঙটি আর পিছনদারীর রাজকীয় ভঙ্গিমা সব ঠিক ঠিক থাকে। এই দৃশ্যে এমন মনে যেন এই কৃষ্ণ এই কলিতে প্রকৃতপক্ষে সেই সে দ্বাপর থেকেই উঠে এসেছেন। এভাবে একে একে নানান ঘটনা ও কাহিনির চিত্রায়ণের মাধ্যমে সমাপ্ত হয় একটি রাতের পূর্ণাঙ্গ রাসলীলা।[৩৭]

প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, মণিপুরীদের রাসলীলা নৃত্য, অভিনয় ও গীতের সমন্বয়ে পরিবেশিত থাকে। আসলে, রাসলীলা পরিবেশনে নৃত্যকার যখন নৃত্য করে তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আখ্যান মেনে অভিনয়ও করেন এবং একই সময়ে নৃত্যকারদের নৃত্য ও অভিনয়ের সঙ্গে সমন্বয় রেখে রাসধারী গায়ক গীত পরিবেশন করে থাকেন।

উল্লেখ্য, সমগ্র আয়োজনে সুর ও তাল সমন্বয় করেন বাদ্যকারগণ। রাসলীলার নৃত্য ও অভিনয়ের গতি এবং বৈচিত্র্য সৃজনে বাদ্যকারগণ প্রধান ভূমিকা পালন করেন। কারণ, বাদ্যকারদের সুর-তাল ও লয়ের নির্দেশ মেনেই নৃত্যকারগণ নৃত্য ও অভিনয় উপস্থাপন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

রাসলীলার মূল ভূমিকায় থাকেন মণিপুরী মেয়েরা। তবে, যন্ত্রীদলে পুরুষের অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। অনেক সময় রাসধারী হিসেবেও পুরুষদের দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়। এছাড়া, কৃষ্ণ চরিত্রে সাধারণত কম বয়সী ছেলেদেরকে অংশ নিতে দেখা যায়।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও মণিপুরী জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েনি। বরং নিজস্ব সংস্কৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কৃত্যচার মূলক অনুষ্ঠান তারা অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ততার সাথেই পালন করে থাকে। রাসলীলায় তাদের সে স্বতঃস্ফূর্ততা প্রকাশ প্রত্যক্ষ করা যায়।

প্রতি বছর রাসপূর্ণিমা এলে শহরবাসী মণিপুরী জনগণও রাস উদ্‌যাপনের জন্যে গ্রামে ফিরে যান এবং গ্রামের মানুষের সাথে একাত্ম গ্রামের মানুষকে রাস উদ্‌যাপনে সহযোগিতা করে থাকেন। রাসলীলার শিল্পী-কুশীলব হিসেবে সাধারণত গ্রামের মেয়ে-শিশু ও কিশোরীরা অংশগ্রহণ করে থাকেন। তবে, কৃষ্ণের ভূমিকায় একজন শিশুকে অংশ নিতে দেখা যায় এবং বাদ্যযন্ত্রী ও গায়কদলে পুরুষের অংশগ্রহণ রাসলীলার আরেকটি সাধারণ চিত্র। কিছু কিছু ক্ষেত্রে গায়ক দলে গৃহস্থ নারীদের অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায়।

৪. বৈষ্ণবধর্মগুরু শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পার্ষদদের জীবন-মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান

বাংলাদেশের হিন্দুধর্ম বা সনাতন শাস্ত্রীয় পৌরাণিক দেব-দেবীর সঙ্গে সমন্বিতভাবে বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক মানব-চরিত্র শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পার্ষদদের জীবন-মাহাত্ম্য-প্রকাশক নাট্যরীতির উদ্ভব হয়েছে। এ ধরনের নাট্য পরিবেশনের প্রধান আশ্রয় শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ হলেও এরসঙ্গে কৃষ্ণলীলা, রামলীলা ইত্যাদির সমন্বয়-সংযোগ ঘটে। মোটকথা, লোককথায় প্রচলিত শ্রীকৃষ্ণ ও ঐতিহাসিক চরিত্র শ্রীচৈতন্যের বাস্তব জীবন-আখ্যানের মিশ্রণে এটি একটি সরস পরিবেশনরীতিতে রূপ লাভ করেছে। সেদিক দিয়ে এ ধরনের পরিবেশনরীতিকে যেমন পূর্বে আলোচিত ধ্রুপদী মহাকাব্য *রামায়ণ* ও বাঙালির জাতীয় মহাকাব্য *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* আখ্যান পরিবেশন-আঙ্গিকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তেমনি শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পার্ষদদের জীবন মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান পরিবেশনরীতি হিসেবে ভিন্নভাবেও আলোচনা করা যায়।

বাংলাদেশে রাধাকৃষ্ণের লীলাসমূহ নিয়ে পদাবলি কীর্তনের আসরে যেমন সকল ক্ষেত্রে কলির অবতার শ্রীচৈতন্যের গৌরাঙ্গলীলার আখ্যান বিস্তার করা হয়—তেমনি গৌরলীলা বা গৌরচন্দ্রিকার ভিন্ন ধরনের কিছু পরিবেশনরীতির প্রচলন রয়েছে। উল্লেখ্য, এদেশের বৈষ্ণবভক্তমণ্ডলীর কাছে শ্রীকৃষ্ণের কলিযুগের অবতার হিসেবে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব কল্পিত হয়ে থাকেন। তাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অধিকাংশ আসরের শুরুতেই চৈতন্যপ্রভুকে বন্দনা করা হয়। অপরদিকে শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পার্ষদদের জীবন মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান পরিবেশনের শুরুতে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধালীলার বন্দনা করে নেওয়া হয়।

সাধারণত কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণযাত্রার আঙ্গিকে শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পার্ষদদের জীবন মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান পরিবেশন করা হয়। আঙ্গিক যা-ই হোক, এ শ্রেণির আখ্যানের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় পালা হচ্ছে—'নিমাই সন্ন্যাস'। কেমন করে মহাপ্রভু চৈতন্য যুবতী বধূকে এবং পরমবান্ধব মাকে ঘরে রেখে বিশ্ব-সংসারের সকল মানুষকে উদ্ধার করার জন্য সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেছিলেন সে কথা এ ধরনের নাট্যপালাতে বর্ণিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১ কৃষ্ণযাত্রা

কৃষ্ণযাত্রায় আদিতে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র ও রাধা-কৃষ্ণের লালা বিষয়ক আখ্যান নাটকের আকারে অভিনয় করা হত। পরবর্তী সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অবতার হিসেবে শ্রীচৈতন্যের প্রতিষ্ঠা ঘটলে কৃষ্ণযাত্রার আখ্যানবস্তু প্রধানত শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পার্ষদদের জীবন কাহিনিকে আশ্রয় করে। বর্তমানকালে কখনো কখনো কৃষ্ণযাত্রা'র পরিবেশনে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা লীলার আখ্যান অভিনীত হলেও তার প্রচলন খুব বেশি নয়। আসলে, শ্রীচৈতন্য ও তার পার্ষদদের জীবনাখ্যানই এখনকার কৃষ্ণযাত্রা'র প্রধান অবলম্বন।

'কৃষ্ণযাত্রা' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণের জন্মযাত্রা। মূলে কৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে শোভাযাত্রা অর্থে ব্যবহৃত হত। চৈতন্যভাগবতে আছে :

কৃষ্ণযাত্রা অহর্নিশি কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন।
ইহার উদ্দেশ্য নাহি জানে কোনজনে॥[৩৮]

উদ্ধৃতাংশে প্রথম চরণের যৌক্তিক অর্থ হল কৃষ্ণের জন্মযাত্রা উপলক্ষে কৃষ্ণের নাম বা প্রশংসা কীর্তন। 'কৃষ্ণযাত্রা' নাটক অর্থে 'কৃষ্ণ বিষয়ক যাত্রা'।

মধ্যযুগে বাংলায় নাটগীত নামে এক শ্রেণি ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা প্রচলিত ছিল। গবেষকগণ এই নাটগীত পরিবেশনরীতি সম্পর্কে যে-সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তা হচ্ছে—নৃত্য সম্বলিত গীতই হচ্ছে নাটগীত। এ ধরনের পরিবেশনাতে প্রধানত রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ থেকে বিষয়বস্তু গ্রহণ করা হত। স্পষ্টতই বোঝা যায় যে তার মধ্যে কোনো গদ্য সংলাপ ছিল না এবং কেবলমাত্র নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে তার বিষয়বস্তু অগ্রসর হয়ে যেত।

'কৃষ্ণযাত্রা'র ধারা বাংলায় আজও প্রচলিত রয়েছে। তবে, তা শ্রীকৃষ্ণের জীবন কাহিনির বদলে আশ্রয় করেছে শ্রীচৈতন্যের জীবনী। শুধু তা-ই নয়, এ ধরনের 'কৃষ্ণযাত্রা'তে দেখা যায়—তাতে সংলাপ, অভিনয় এবং গান যেমনভাবে আছে তেমনভাবে নাচের আধিক্য দেখা যায় না। এ থেকে ধারণা করা যায়, মধ্যযুগের নাটগীত এক ভিন্ন প্রকারের ঐতিহ্যবাহী নাট্য ছিল, তা পরবর্তীকালের 'কৃষ্ণযাত্রা'র সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে গেছে এবং অন্য একটি রূপের মধ্য দিয়ে এখনো বেঁচে আছে। বিভিন্ন পূজা-পার্বণ ও মেলা উপলক্ষে উত্তরবঙ্গের লালমনিরহাট-কুড়িগ্রামের শিবমন্দির, রাধাকৃষ্ণমন্দির, সার্বজনীন দুর্গামন্দির কমিটি ও মেলা উদ্‌যাপন কমিটি সাধারণত কৃষ্ণযাত্রা আয়োজন করেন।

৪.২ কৃষ্ণলীলা

শ্রীচৈতন্য ও তার পার্ষদদের ঐতিহাসিক বা বাস্তব আখ্যান অবলম্বনে বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদ ও কিছুটা কল্পনার মিশেলে ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা হিসেবে 'কৃষ্ণলীলা' নামে এক ধরনের পরিবেশন-আঙ্গিক প্রচলিত রয়েছে। আদিতে কৃষ্ণলীলার আখ্যানবস্তু পৌরাণিক দেবতা শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র নির্ভর ছিল। এখনও কৃষ্ণলীলার পরিবেশনে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক আদিলীলা উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। তবে, শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের

Dhaka University Institutional Repository

আখ্যান অবলম্বনে রচিত 'নিমাই সন্ন্যাস' পালাই কৃষ্ণলীলার সবচেয়ে জনপ্রিয় পরিবেশনা। গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার চুয়ারিয়াখোলা গ্রামে কৃষ্ণলীলার আসরে প্রায় নিয়মিতভাবে 'নিমাই সন্ন্যাস' পালা পরিবেশিত হয়ে থাকে।

দু'টি শব্দ কৃষ্ণ এবং লীলা যোগে সৃষ্টি হয়েছে কৃষ্ণলীলা। যার ব্যাখ্যাতে বলা যায়, কৃষ্ণ চরিত্রকে কেন্দ্র করে যে আখ্যান এবং লোককথা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাকে আশ্রয় করে যে লীলানাট্য গ্রামের আসরে অভিনীত হয়ে থাকে তাই কৃষ্ণলীলা। শ্রীচৈতন্য পরবর্তী সময়ে বৈষ্ণবদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের অবতার হিসেবে শ্রীচৈতন্যদেব প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন বলে কৃষ্ণলীলার আসরে চৈতন্য-কাহিনি কৃষ্ণলীলানাট্যের আসরে জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

চৈতন্যদেবের সমসাময়িককালে লীলানাট্যের আঙ্গিকে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক আখ্যান প্রচলিত ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক চৈতন্যদের যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন তা সামগ্রিকভাবে বাংলার সামাজিক জীবনের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। চৈতন্যদেব নিজে যে একদিন ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার অভিনয়ে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন তার একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিস্তারিত বর্ণনা আছে চৈতন্যজীবনীতে। চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করবার আগেই খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই ঘটনা ঘটেছিল। চৈতন্যদেব স্বয়ং রুক্মিণীর অংশে অভিনয় করেছিলেন, রুক্মিণী, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরম ভক্তিমতী ছিলেন। চৈতন্যের অন্যান্য ভক্তগণ তাঁদের বয়স এবং আকৃতি অনুযায়ী তাতে বিভিন্ন স্ত্রী এবং পুরুষের অংশে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এটাই বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার অভিনয়ের প্রথম সাহিত্যিক প্রমাণ। এই অনুষ্ঠান যে তখন কি বলে পরিচিত ছিল, তা জানা যায় না, কিন্তু বাংলার পরবর্তীকালের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারার বিবরণ থেকে জানা যায় যে তার নাম ছিল 'কৃষ্ণলীলা'। কারণ, তা ছিল শ্রীকৃষ্ণের জীবন কাহিনি ভিত্তিক নাট্যানুষ্ঠান। এছাড়া, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে আছে–'দেখিলা সকল তাঁহা কৃষ্ণচরিত্রলীলা।' অর্থাৎ নিশ্চিতভাবেই তা ছিল কৃষ্ণলীলা আর সে পরিবেশনাতে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র উপস্থাপিত হত। একালেও কৃষ্ণলীলার আসরে কৃষ্ণ চরিত্র উপস্থাপিত হয়ে থাকলেও জনপ্রিয় ও অধিকতর হৃদয়গ্রাহী আবেগ জাগ্রতকারী আখ্যান হিসেবে শ্রীচৈতন্য চরিত্রের আখ্যানই বেশি অভিনীত হয়।

৫. লোকায়ত হিন্দু দেব-দেবী শিব-কালী ও তাদের মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান

শিব ও কালী লোকায়ত বাংলার জনপ্রিয় দেব-দেবী। বাংলাদেশে বসবাসরত বাঙালি ও বেশ কয়েকটি নৃগোষ্ঠী শিব-কালীর মাহাত্ম্য-প্রকাশক ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা উপস্থাপন করে থাকে। বৃহত্তর সিলেট জেলার চা-বাগানের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী চৈত্র মাসে কালীপূজা উপলক্ষে শিব-কালীর মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান নির্ভন ঐতিহ্যবাহী নৃত্যনাট্যরীতি দণ্ডনাচ; বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার হাজং নৃগোষ্ঠী মহিষাসুরবধ ও দেবাসুরবধ পালা এবং বিভিন্ন অঞ্চলের বাঙালি হিন্দুরা চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে চড়কের মাঠে, বাড়ির উঠানে, খোলা মাঠে, কালীমন্দিরের কালীকাচ, মণিহাজরা, মুখোশ নৃত্য ইত্যাদি নাট্যমূলক পরিবেশনা উপস্থাপন করে থাকে।[৩৯] মহিষাসুর পালার আখ্যানে জানা যায়, চণ্ডা-মণ্ডার মুখে দেবীর অতুলনীয় রূপ-মাধুরীর কথা শ্রুত

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে শুম্ভ-নিশুম্ভ দৈত্যদ্বয় দেবীর পাণিগ্রহণার্থ মহাসুর সুগ্রীবকে দূতরূপে প্রেরণ করেন। দূতের মুখে অসুরদ্বয়ের প্রস্তাব শুনে দেবীর ক্রোধের উদ্বেগ হয়। কিন্তু দেবী তা সংযত করে দূত করে বলেন :

যমং জয়তি সংগ্রামে যমে দর্পং ব্যাপ্পাহতি
যমে প্রতি বলালোকেসক মে ভবতা ভবিষ্যতি।

দূতের মুখে দেবীর বাক্য শুনে কম্পিত কলেবর অসুরদ্বয় ধুম্রোলোচনকে পাঠালেন দেবীকে পরাজিত করবার মানসে। দেবীর হুংকার শব্দে ধুম্রোলোচন ভস্মীভূত হলে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন চণ্ড-মণ্ড অসুরদ্বয়। দেবগণ দেবীকে যুযুৎসু করে তুলতে আরম্ভ করলেন দেবীর বিজয় বন্দনা। সেই বন্দনার শক্তিতে দেবী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে সকল অসুরকে পরাস্ত করে শান্তির রাজ্য রচনা করেন। এ ধরনের পৌরাণিক আখ্যান উপস্থাপনের ভেতর দিয়ে কুশীলবগণ বর্তমানকালকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করেন।

৫.১ মহিষাসুরবধ

চণ্ডীমঙ্গল বা কলিকাপুরাণের কাহিনি অবলম্বনে হাজং নৃগোষ্ঠী মহিষাসুরবধ পালা অভিনয় করে। আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দী থেকে বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা, সুসংদুর্গাপুর, ধোবাউরা, কলমাকান্দা, হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ি এবং বৃহত্তর সিলেট জেলার সুনামগঞ্জে হাজং জনগোষ্ঠী বসবাস করে আসছে। এদেশে বসবাসরত অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মত হাজংরা নিজেদের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব, কৃত্যাচার ও ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে বিভিন্ন ধরনের গীতি, নৃত্য, বাদ্য এবং নাট্যপালা পরিবেশন করে থাকে। প্রতি বছর বাংলা আশ্বিন-কার্তিক মাসে চরমাগা বা নবান্ন উৎসবে এদেশের হাজংরা শ্যামাপূজার আয়োজন করে। এ সময় হাজং যুবকরা একটানা সাত দিন ধরে গ্রামের বিভিন্ন বাড়ি ঘুরে মুখোশ নৃত্যসহ দেবতার বন্দনামূলক গীত পরিবেশন করে থাকে। শুধু তাই নয়, হাজং জনগোষ্ঠীর কিছু গীতিনৃত্যের দল এ ধরনের চরমাগা বা নবান্ন উৎসবে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে পরিভ্রমণের কালে ধর্মীয় আখ্যানমূলক নৃত্যগীতের অংশ হিসেবে মহিষাসুরবধ ও দেবাসুরবধ পালার অভিনয় করে থাকে। এছাড়া, বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন বা কোনো ধরনের আমন্ত্রিত অনুষ্ঠানে বছরের যে কোনো সময়েই এই পালা পরিবেশিত হয়।

এ ধরনের পরিবেশনরীতির মূল বিষয়বস্তু যেহেতু যুদ্ধ তাই এর প্রধান অভিনয় উপকরণ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র, যথা—ঢাল, তরবারি, ত্রিশূল, ফলা, তীর-ধনুক, খড়্গ ইত্যাদি। এছাড়া, বিভিন্ন ধরনের মুখোশ, ধূপদানী, শঙ্খ ইত্যাদি সামগ্রীও অভিনয় উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মহিষাসুরবধ পালা পরিবেশনে বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে সাধারণত ঢোল, করতাল, হারমোনিয়াম, শঙ্খ, ড্রাম, ঝাঁঝ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মহিষাসুরবধ পালার শুরুতেই থাকে বন্দনাগীত। মঞ্চের উত্তর-পশ্চিম ভাগে বসা বাদ্যযন্ত্রী ও সঙ্গীতশিল্পী দল বাদ্যের তালে তালে বন্দনাগীত শুরু করেন :

নমঃ নমঃ নারায়ণী জগৎ তারিণী

Dhaka University Institutional Repository

দুর্গাসুর বিনাশিনী দুর্গতী হারিণী ॥
সর্বলোক নিস্তারিণী পতিত উদ্ধারিণী
কালী তারা তাপহারা সন্তোষ কারিণী ॥
কালী তারা মহাবিদ্যা রাজা রাজ্যশ্বরী
শ্রীমতী ভুবনশ্বরী ভৈরব শঙ্করী ॥
চন্দ্র রূপ রক্ষগণ রক্ষকতারিণী
অতি চণ্ডী রক্ষা কর অশুভ হারিণী ॥

এই বন্দনাগীতের মধ্যে একে একে সকল কুশীলব চরিত্রানুযায়ী বিভিন্ন অভিনয় উপকরণ ঢাল, তরবারি, ত্রিশূল, তীর-ধনুক, মুখোশ সহযোগে নৃত্যের তালে তালে মঞ্চে এসে নৃত্য পরিবেশন করেন এবং বন্দনাগীত সমাপ্ত হলে তারা মঞ্চ থেকে প্রস্থান করেন।

মূল নাট্যপালার শুরুতেই এক হাতে তরবারি আর অন্য হাতে ফলা অস্ত্র নিয়ে নৃত্যের তালে তালে মহামায়া বা দুর্গা মঞ্চে প্রবেশ করেন। একই সঙ্গে তাকে অনুসরণ করে ঢাল-তরবারি হাতে একজন কুশীলব অসুর রূপে নৃত্য যোগে মঞ্চে আগমন করেন। এক সময় তিনি তাঁর নৃত্যের মধ্যে নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন এবং বলেন :

অসুর : হু হা হা হা। কে? কে তুমি নারী? আমায় সত্য পরিচয় দাও।

মহামায়া : সমরের প্রাঙ্গণে দেবতার আলয়ে কেন তুমি আসিলে হেথায়?

অসুর : এই তো আমি অসুর। তুমি আমাকে সত্য পরিচয় দেবে, না হলে তোমাকে আমি করতে পারি জানো?

মহামায়া : হ্যাঁ জানি। তোমার মতো তোমার মত কত সহস্র অসুর আমার পায়ের তলায় রেখে দিয়েছি। সেই পাপিষ্ঠ অসুর আমার পরিচয় জানতে চায়ছো! জানো, আমি মহামায়া।

অসুর : মহামায়া! আজ তুমি কী চাও।

মহামায়া : চাই শুধু রাজ্য।

অসুর : রাজ্য! হু হা হা হা। তবে আয়, আয়রে মৃত্যুকামিনী নারী, তোকে রাজ্যের সাধ মিটিয়ে দেই॥

বেজে ওঠে যুদ্ধের দামামা। আর অসুর সেই বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে মহামায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে যুদ্ধ চলার পর মহামায়ার কাছে অসুর পরাস্ত হয়। কিন্তু পরক্ষণেই আবার অসুর যুদ্ধে মেতে ওঠেন। এ পর্যায়ে মহামায়া প্রায় পরাস্ত হয়ে যান এবং বলেন :

মহামায়া : ওরে পাপিষ্ঠ অসুর আমি যে আর পারছি না।

অসুর : পাপীয়সী নারী—তুমি এখনই আমার দুটি পাও ধরো। আর রাজ্যের ইচ্ছা পরিত্যাগ করো।

Dhaka University Institutional Repository

মহামায়া : না না না।

আবার যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। মহামায়া পূর্ণ শক্তিতে অসুরের সাথে যুদ্ধে মেতে ওঠেন। এবারের যুদ্ধে অসুর পরাস্ত হয়ে বলেন :

অসুর : জগৎতারিণী মা, আমায় ক্ষমা করো। আমি জেনে বুঝে করেছি অপরাধ। আমায় তুমি ক্ষমা করো।

যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে অসুর এভাবে মহামায়ার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়তেই মঞ্চে নতুন করে আরেক অসুরের আবির্ভাব ঘটে। তিনি হাতের এক হাতের তরবারি দিয়ে অন্য হাতের ঢালে আঘাত করে শব্দ করে নৃত্য যোগে মঞ্চে এসে বলেন :

মহিষাসুর : হা হা হা।

মহামায়া : তুমি আবার কেন এলে মহিষাসুর! আর কোনো মহাপাপ করো না তুমি।

মহিষাসুর : বড় দুষ্ট নারী তুমি, লজ্জা নাহি তোর মুখে। পুরুষের সাথে রণ কর মন সুখে। ধিক ধিক নারী জাতি, নাহি গুরু জ্ঞান। ত্যাজ্য পথে আসিয়াছ হারাইতে প্রাণ। নারী জাতি বলে ক্ষমা করেছি এতোক্ষণ। কিন্তু এখনি হইবে তোর সম্মুখে মরণ।

মহামায়া : তবে আয়—আয়রে মোরই গর্বে গর্বিত দানব। তোরে মেরে ঘোচাইব দেবেরই ভয় সব। নারীর অপার মায়া দৈত্য কেমনে জানিবে। ষোলকলা পাপ তোর হইলো পূরণ। অনিবার্য হল তোর নিকটে মরণ ॥

যুদ্ধ শুরু হয় বাদ্যের তালে তালে। মহামায়া আর মহিষাসুরের সেই যুদ্ধের মধ্যে একসময় একে একে দুর্গা-কার্তিক-গণেশ-লক্ষ্মী-সরস্বতী মঞ্চে প্রবেশ করে। বাদ্যের তালে তালে তাদের প্রত্যেকের সাথেই মহিষাসুরের যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে মহিষাসুর পরাস্ত হয়। আর তখনই সকল দেব-দেবী পরিবেষ্টিত আসনে মহামায়া বা দুর্গার অধিষ্ঠান ঘটে। এ সময় সঙ্গীতশিল্পীগণ গেয়ে ওঠেন :

ভালো ভালো সকল দেবতা পরাস্ত হয়ে গেল।
আর নাহি কো দেরী জানাই পূর্ণ সালাম ॥

এ পর্যায়ে মন্দিরে যেমন দেব-দেবী পরিবেষ্টিত দুর্গামূর্তির অধিষ্ঠান তৈরি করা হয় তেমনি মহিষাসুরবধ পালা অভিনয়-মঞ্চে দেব-দেবী পরিবেশিত দুর্গার অধিষ্ঠান ঘটে। এ সময় পেছন দিকে একটি চিত্রিত কাপড়ের প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয় এবং দুর্গা বন্দনার গান গীত হয়—'জগৎতারিণী... ॥' ধূপ-ধোঁয়া সহযোগে দুর্গার অধিষ্ঠানে পূজা প্রদান করা হয়। এভাবেই প্রথম পর্বের সমাপ্তি হয় এবং একই ভাবে দ্বিতীয় পর্বের সূচনা এবং সমাপ্তি হয়। তবে, দ্বিতীয় পর্বে মহামায়া তার দুর্গা রূপের পরিবর্তে কালী রূপে আবির্ভূতা হয়ে থাকেন।[৪০]

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় পর্যায়ে জনপ্রিয় এই দুটি ঐতিহ্যবাহী হাজং নাট্যপালা সম্প্রতি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবেশন করে আসছে নেত্রকোনা জেলার রাসমনি হাজং সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর নেতৃত্বে দুর্গাপুর-বগাউড়ার রাধাকৃষ্ণ সম্প্রদায় এবং লাঙ্গলজোড়া হাজং সাংস্কৃতিক দল।

৫.২ কালীকাচ

কালীকাচ চৈত্রসংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত এক ধরনের যুদ্ধ নৃত্য। কাচ শব্দের অর্থ অভিনয়ের জন্য সাজসজ্জা গ্রহণ, কালী সেজে নৃত্যের অনুষ্ঠান হয় বলে এ শ্রেণির নৃত্য কালীকাচ নামে পরিচিতি পেয়েছে। চৈতন্যদেব চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে যে নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান করেছিলেন তাকে কাচ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কালীকাচ শব্দটি তার মতোই প্রাচীন। কালীকাচে কালীই প্রধান নায়িকা। কখনো কখনো শিব সাজ গ্রহণ করে আবির্ভূত হয়ে থাকেন, কিন্তু তিনি কখনো নৃত্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন না, তার পরিবর্তে অসুর কালীর সঙ্গে নৃত্যে ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশের টাঙ্গাইল অঞ্চল এ শ্রেণির কালীকাচ পরিবেশনের জন্য প্রসিদ্ধ।

প্রতি বছর উক্ত বিভিন্ন গ্রামে চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে কালীকাচ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তবে, তার মধ্যে মির্জাপুর থানার নগরভাদগ্রাম, চরপাড়া, শেওড়াতৈল ইত্যাদি গ্রামে এ ধরনের অনুষ্ঠান সর্বাধিক জাকজমকের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত গ্রামগুলোতে প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ বছর ধরে বাংলা বছরের চৈত্রসংক্রান্তিতে শিব-কালীর মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যানের পরিবেশকেন্দ্রিক কিছু কৃত্যানুষ্ঠানমূলক পরিবেশন-আঙ্গিক, যেমন—শোভাযাত্রা, নৃত্যগীত, বীচট, কালীকাচ, পরীনাচ, ডুগনী, কবিতা, কুচকি বানাম, মইন জাগানো, সঙখেলা, চড়ক ও স্বাদ গ্রহণ ইত্যাদি প্রচলিত রয়েছে। এ পর্যায়ে সেই সব কৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য থেকে শিব-কালী মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যানের যুদ্ধনৃত্যমূল পরিবেশনা কালীকাচসহ অন্যান্য কিছু পরিবেশন-আঙ্গিকের বিবরণ তুলে ধরা হল।

প্রথমেই বলা যায় 'মিছিল' বা শোভাযাত্রার কথা। স্থানীয় জনগণ যাকে 'মিছিল' বলে উল্লেখ করে থাকে, তা হচ্ছে—পৌরাণিক চরিত্র সেজে ওই এলাকার মানুষের সার বেঁধে হেঁটে চলার ঘটনা। এক্ষেত্রে কেউ শিব-পার্বতী, কেউ অসুর, কেউ হনুমান, কালী, রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি সেজে বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায়।

পৌরাণিক চরিত্রদের মধ্যে শিব-কালীরা সাধারণত ঢাক-কাশা বা খোল-মন্দিরার দল নিয়ে এক একটা বাড়ির ভেতরের উঠানে গিয়ে বাদ্যের তালে কিছুক্ষণ ঘুরে নাচে। তারপর নাচ শেষে গৃহস্বামীর দেওয়া চাল-ডাল কিংবা টাকা নিয়ে চলে যায় আরেক বাড়ি। এভাবেই তাদের সারাদিন চলে যায়।

রাতে শুরু হয় মইন জাগানো পর্ব। মাঠের কাঁচা মাটিতে মৃত মানুষের মাথায় খুলি রেখে-শুরু হয় এই মইন জাগানো। গ্রামের লোকের বিশ্বাস—খুলিটা কোনো পুণ্যবান মানুষের। এই রাতে তার আত্মাকে ডাকা হয়—তারই খুলিতে পূজার ফুল ছিটিয়ে বা পূজা করে। মাঠের মধ্যে অন্ধকারে হ্যাজাকের আলোয় মইন

Dhaka University Institutional Repository

জাগানোর ক্রিয়াকর্ম অদ্ভুত এক মায়া তৈরি করে। ঠাকুর দুহাতে খুলিটাকে মাটিতে আগলে ধরে রাখে, আর একটি লোক তার মুখোমুখি গড় হয়ে বসে উন্মাদের মতো খুলিটাকে বারবার প্রণাম করতে থাকে। অন্য একজন লোকটার প্রণামের হাত দুটির মধ্যে বারবার ফুল গুঁজে গুঁজে মন্ত্র পড়তে থাকে। লোকটার প্রণাম-ক্রিয়াতে উন্মাদ ভাব ক্রমাগত বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে মনে হয়, এখনই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে এবং ঠিক তা-ই হয়। লোকটা খুলিটার ওপর লুটিয়ে পড়ে আর কয়েকজন লোক তাকে উচ্চে তুলে ধরে দৌড় দেয় মন্দিরের দিকে। খুলিটা আটকে থাকে প্রণামকারীর বুকে। কিন্তু তারা মন্দিরের সামনে পৌঁছলে-খুলিটা ঠাকুরের কাছে চলে যায়।

এবারে অন্য বাড়ির অন্ধকার থেকে দুটি কালীমূর্তির আবির্ভাব ঘটে। তাদের এক হাতে তরবারি অন্য হাতে মাটির বড় টাকনীপাত্র। তাদের একজন ঠাকুরের কাছ থেকে খুলিটাকে ছিনিয়ে নিতেই শুরু হয় দুই কালীমূর্তির পরম যুদ্ধ। ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ চলতে থাকে।

যুদ্ধের চারদিকে মশাল জ্বেলে পাহারা দেওয়া হয়। ধারালো তরবারি মশালের আলোয় ঝিলিক কাটতে থাকে। যুদ্ধে তারা সমানে সমান। উপস্থিত দর্শকদের তখন স্পষ্টত মনে হয়—মা কালী তার তাণ্ডব বা রুদ্ররূপ পৃথিবীতে আবার নেমে এসেছেন...তার আরো মাথা চাই... কেননা এ জগতের নিষ্ঠুরতায়, অশুভ আর অন্যায়কারী নরমুণ্ডু গলে আবার তিনি মঙ্গল সাধন করতে চান-মানুষের তরে। যুদ্ধে তারা কেউ কাউকে পরাস্ত করতে পারে না। বরং কালীর মূর্তির ভরক্রিয়ায় তারা তাদের নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতেই ঘের দেওয়া মানুষেরা তাদের আগলে ধরে। এর নাম 'কালীকাচ'।

কালীকাচ শেষে একদল গঙ্গা আনতে যায়, মানে পাশের কোনো নদী বা ডোবা থেকে পানি আনতে যায়। সব শেষে আসে হাজরা। ঢাকের বাদ্যের শ্মশানে তখন আরেক উন্মাদনা। সেখানে সবাই যেতে পারে না। কেননা, সেখানে যেতে মানা।

পরদিন শিব-কালী পূজার আরেক আয়োজন হিসেবে চড়ক অনুষ্ঠান করা হয়। চড়কের মাঠ-এক উন্মাদনার মাঠ। চড়ক গাছকে কেন্দ্র করে একটি সদ্য চাষ দেওয়া বিস্তৃত মাঠে বৃত্ত তৈরি করে বৃত্তাকারে ঘিরে থাকে রঙ-বেরঙের পোশাক পরা হাজারো মানুষ। মানুষের ঘের দেওয়া সেই বৃত্তের মাঠে বিশাল তরবারি হাতে রাবণের উন্মাদনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে তার কোমরে বাঁধা দড়ি দুই পাশ থেকে দুইজন ধরে রাখে। রাবণের সাধ্য কী সেই দড়ির বাঁধন ছিন্ন করে কাউকে আক্রমণ করার।

রাবণের অস্ত্রহাতের উন্মাদনা অন্য পাশে রামসুহৃদ হনুমানজী গাছের সবুজ পাতাসমেত দুটি ডাল হাতে কসরত করে চলে। সারা দেহে পাটের পোশাক বেঁধে মুখে মুখোশ পরে গ্রামের মানুষ যেমন হনুমান সেজে থাকে তেমনি আবার কেউ সারা দেহে কালো রঙ মেখে-কালো হাফপ্যান্ট পরে বিশাল তরবারি হাতে রাবণ সাজে। রামের প্রতিনিধি হনুমান আর রাবণের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতির সঙ্গে রাম-রাবণের যুদ্ধেরই প্রতীকী উপস্থাপন হিসেবে চড়কের মাঠে থাকে শিশুদের তীর-ধনুকের যুদ্ধক্রীড়া।

অন্যদিকে লাল ধুতি পরা এক ভক্তের প্রার্থনা-উন্মাদনা চলে কালীমূর্তির সামনে। ভক্তের এই উন্মাদনাকে নিয়ন্ত্রণ করে একজন ঢাকবাদক। তার ঢাকের শব্দে ভক্ত তার দেহ-প্রাণ-ভাঙা উথাল-পাথাল

Dhaka University Institutional Repository

প্রার্থনায় সদ্য চাষ দেওয়া জমিতে গড়াগড়ি যায়-তাক ধিনা ধিন নাচতে থাকে-নাচের সঙ্গে দৌড় দেয়-পুনরায় ঢাকের বাদ্যে কালীপ্রতিমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে।

কালী প্রতিমারও এখানে জীবন্তরূপ—আসলে কালীর মুখোশ আর সাজবস্ত্রে একজন কালী রূপে দাঁড়িয়ে থাকে অস্ত্র হাতে, তার পায়ের নিচে কালীর স্বয়ং স্বামীবেশে আরেকজন শুয়ে থাকে। অন্যজন কালীকে আগলে ধরে রাখে এই কারণে যে, ভক্তের প্রার্থনায় কালী যেন সত্যিই জেগে না উঠতে পারে। চড়কের মাঠে এক বা একাধিক কালী থাকতে পারে। এই কালীপূজার পর চড়কের মূল আয়োজন শুরু হয়।

চড়ক সম্পর্কে লোকশ্রুতিতে জানা যায় যে, চড়কের গাছটি হচ্ছে শিবলিঙ্গের প্রতীক আর সেই গাছের উপরে আড়াআড়িভাবে টানানো বাঁশটি হচ্ছে কালীর যৌনাঙ্গ। শিবলিঙ্গের উপর ভর করে কালীর যৌনাঙ্গের ঘূর্ণন হচ্ছে চড়কপূজার মর্মকথা।[৪১] কালীকাচের মতোই কৃত্যনাট্যের আঙ্গিকে বৃহত্তর সিলেট জেলার চা-বাগানে বসবাসরত কিছু নৃগোষ্ঠী প্রতি বছর চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে দণ্ডনাচ পরিবেশন করে।

৬. লোকায়ত নাথ-সংস্কৃতির তত্ত্ব-মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান

বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র অঞ্চল, তথা—বগুড়া, নাটোর, নওগাঁ ও রাজশাহী জেলাতে যোগাচারী বৌদ্ধদের মতো এক ধরনের নাথযোগীসম্প্রদায়ের সংস্কৃতির ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞ মতে, উক্ত অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মানুসারী পালদের যুগাবসানে নিম্নবর্গের বৌদ্ধরা তান্ত্রিক ও শৈব আবরণে আত্মগোপন করে এবং তারা নিজেদের মধ্যে ধর্ম সঙ্করের ভিত্তিতে নতুন ধরনের ধর্ম উদ্ভাবন ও তার ধর্মসাংস্কৃতিক চর্চার সূত্রপাত করে, যা নাথসম্প্রদায়ের সংস্কৃতি হিসেবে পরিচিতি পায়। উল্লেখ্য, বিচিত্র ধর্মাবলম্বীদের শাসন ও শোষণের ফলে বরেন্দ্র অঞ্চল এক সময় হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধদের লীলাভূমিতে পরিণত হয়। বগুড়ার ১০ কিলোমিটার উত্তরে মহাস্থানগড় বা পুণ্ড্রবর্ধন অবস্থিত। কথিত আছে, স্বয়ং বুদ্ধদেব এক পুণ্ড্ররাজকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত কোটিকপুর জৈন তীর্থ বিশেষ, খ্রিষ্টপূর্ব ৭০০ অব্দে পার্শ্বনাথ স্বামী এক রাজ্যে জৈন ধর্ম প্রচার করেন। চীনা পরিব্রাজক যুয়নচঙ পুণ্ড্ররাজ্যে দিগম্বর-জৈনদের আবাস স্থল, বৌদ্ধদের সংঘারাম ও হিন্দুদের দেবালয় দেখেন। নয়পালের সময়ে ১০৩০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় তান্ত্রিক মতের বিস্তার ও প্রাধান্যের যুগে হিন্দু ও বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের আচার-ব্যবহার অনেকটা শিথিল হয়ে ওঠে, তারপর শৈবমতের প্রচারের যুগে বৌদ্ধযোগীরা এদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আত্মগোপন করে। লক্ষ্মণ সেনের সময়ে বৌদ্ধ-যোগী গোরক্ষ-শিষ্যরা শৈব-সন্ন্যাসী হয়। বর্তমান নাথসম্প্রদায়ের সংস্কৃতি বা যোগী-সংস্কৃতির মধ্যে বৌদ্ধধর্মের আভাস পাওয়া যায়।৩৬ আসলে, বৌদ্ধধর্মের লোকায়ত রূপকে আত্মসাৎ করে পরবর্তীকালের নানা পুরাণ প্রসঙ্গ আত্মস্থ করেই নাথসম্প্রদায়ের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। নাথসম্প্রদায়ের সংস্কৃতি ও নাথধর্মমতকেন্দ্রিক একটি ঐতিহ্যবাহী নাট্য আঙ্গিকের অস্তিত্ব রয়েছে উত্তরবঙ্গের নাটোর ও বগুড়া অঞ্চলে। এই ঐতিহ্যবাহী নাট্য আঙ্গিকটি যুগীর গান বা যোগীপর্ব নামে পরিচিত।

বাংলাদেশের লোকায়ত বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে নাথ-সম্প্রদায়ের কিছু সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়ে থাকে। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে নাথ-সম্প্রদায়ের তেমন কোনো সম্পর্কসূত্র আবিষ্কার করা বেশ দুরূহ। আসলে, বৌদ্ধধর্ম

Dhaka University Institutional Repository

বিস্তারের সমসাময়িকালে ও তার পরবর্তী সময়ে এদেশে নাথ-সম্প্রদায়ের যোগ-সাধনা চর্চার কথা জানা যায়। তবে, এ কথাও জানা যায় যে, প্রাচীনকাল থেকে নাথপন্থী মানুষেরা কঠোর তপস্যা, কঠিন আত্মনিগ্রহমূলক বৈরাগ্য ও অতিলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের মাধ্যমে এদেশের সাধারণ মানুষের কাছে অনেক সমাদর ও সমীহ আদায় করতে সক্ষম হন। আজও এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নাথসম্প্রদায়ের যোগাচারী সাধকদের ধর্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে অতিলৌকিক জ্ঞান প্রদর্শনের ক্ষমতা নাট্য, গীত ও অভিনয় আকারে পরিবেশিত হয়ে থাকে।

নাথসম্প্রদায়ের উদ্ভব প্রসঙ্গে জানা যায়, মূলত এদেশেই নাথ সিদ্ধাচার্যগণ প্রচলিত ধর্মসংঘের বিরুদ্ধে নিজস্ব ধর্মচর্চার একটা সহজিয়াপন্থা উদ্ভাবন করেন, যা শুধু বাংলাতে নয়, এক সময় সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর সেই সূত্রেই প্রাচীনকাল থেকে নাথ সিদ্ধাচার্য গোরক্ষনাথ, মহস্যোন্দ্রনাথ, হাড়িপা প্রমুখ সাধনা ও সিদ্ধির মূর্ত প্রতীকরূপে জনসমাজে গৃহীত হয়েছিল।

সুফিতত্ত্বের সাধক পির-দরবেশদের সঙ্গে নাথ গুরুদের ধর্ম-সাধনাপন্থার ঐক্য আবিষ্কার করে গবেষকগণ জানিয়েছেন যে—মুসলমান দরবেশদের নৃত্য-গীত-বাদ্য সহকারে পরিবেশিত ধর্মসাধনায় হলকায়ে-জিকিরের সঙ্গে নাথদের ধর্মচর্চার ব্যবহৃত গীত-নৃত্যের খুব একটা অমিল নেই। নাথসিদ্ধাদের নৃত্যগীতের সঙ্গে সুফিতত্ত্বের সাধকদের 'ঘূর্ণায়মান দরবেশ'-এর তুলনা চলে। মীননাথের সম্মুখে গোরক্ষনাথ 'নাটুয়া'র ছদ্মবেশে নৃত্যবেশে নৃত্যগীত করেছিলেন। *গুপিচন্দ্রে সন্ন্যাসে*, 'ফকির ও যুগী' সমার্থকরূপে প্রযুক্ত হয়। এদেশের লোকমানস নাথপন্থার সঙ্গে সুফিতত্ত্বের এক দার্শনিক যোগসূত্র আবিষ্কার করেছিল এবং সেই ধারা এখানকার লোকায়ত সমাজে এখনও বহমান।[৪২] এর প্রমাণ হিসেবে একালে প্রচলিত 'যুগীর গান' বা 'যোগী পর্ব' প্রভৃতি ঐতিহ্যবনাহী নাট্যের কথা উল্লেখ করা যায়।

৬.১ যুগীর গান বা যুগী পর্ব

এটি মূলত বাংলার ঐতিহ্যবাহী যোগাচারী নাথধর্ম ও সন্ন্যাসব্রত দর্শনের ধারায় মৌখিকরীতিতে উপস্থাপিত নাট্যধারা। এই নাট্যধারা আদিতে ছিল যোগীব্রতের গান, মধ্যযুগে এর অন্য নাম ছিল যোগান্ত-ভেদান্ত গান। 'চৈতন্যভাগবতে' উল্লেখ আছে :

যোগিপাল ভোগিপাল মহীপালের গীত।
ইহাই শুনিতে সর্ব্বলোকে আনন্দিত ॥

বর্তমানে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী, নাটোর, বগুড়া জেলায় এ ধরনের নৃত্য-গীত আশ্রিত নাট্যধারা প্রচলিত রয়েছে। যুগীর গান মূলত দোহার সহযোগে পরিবেশিত চার চরিত্র বিশিষ্ট একটি ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা। এর মূল চরিত্র একজন গুরু, দুইজন শিষ্য বাল্লক দাস বা ভূট্ট দাস ও যুগী বা যোগী এবং একমাত্র নারী চরিত্র জৈগান ও তার ভক্ত শাম দাস।

সম্পূর্ণ নাটকটি প্রধানত বাল্লক দাস ও যুগীর কথা, উক্তি-প্রত্যুক্তি বা প্রশ্ন-উত্তরমূলক সংলাপ ও গানে অভিনীত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সাধারণত শিষ্য বাল্লক দাস বা ভূট্ট দাস প্রশ্ন করে আর গুরু যুগী উত্তর

Dhaka University Institutional Repository

দেন। শিষ্য বাল্লক দাসের প্রশ্নের কারণ তিনি গুরুকে যাচাই করে নিতে চান। কেননা, বাল্লক দাসের কথা হল, যার সঙ্গে তিনি সন্ন্যাসব্রতে যাবেন জ্ঞান শিক্ষার জন্য সেই লোকটা আসলেই জ্ঞানী কি-না তা না যাচাই করে তার পিছনে যাওয়া ঠিক নয়।

বাল্লক দাস যোগ সাধনার পথের সন্ধানে নেমে যুগীর দেখা পান এবং যুগীর মুখ থেকে জানতে পারেন—তিনি হলেন হিন্দুর গুরু আর মুসলমানের পির-ফকির। একথা শুনে বাল্লক দাস যুগীকে প্রথমে মুসলমান শাস্ত্র থেকে প্রশ্ন করে বলেন—'তুমি যদি সত্যি মুসলমানের পির-ফকির হয়ে থাকো। তাহলে মুসলমানের চার কালেমার অর্থ বলে দাও।'

যুগীর গানে গানে চার কালেমার অর্থ বলে দিতেই বাল্লক দাস এবার হিন্দু শাস্ত্র থেকে প্রশ্ন করে বলেন—'এবার বলো তুলসির জন্ম কথা। তাহলে বুঝবো তুমি হিন্দুর গুরু।'

যুগী এবারও গানে গানে তুলসির জন্মকথা বর্ণনা করেন এবং বাল্লক দাসকে বলেন—'বাল্লক দাস, এখন থেকে তোমার পুরো দেহটা আমার। আমি তোমার গুরু। তাই আমার অনুমতি ছাড়া তুমি তোমার কোনো কিছু ব্যবহার করতে পারবে না।'

বাল্লক : গুরুজি, আমার সব কিছু নেন কিন্তু আমার দুইখানা হাত পা ও দুইখানা চোখ নিবেন না।

যুগী : কেন হাত এবং চোখ দিয়ে তুমি কি করবে?

বাল্লক : গুরুজি এই হাত পা দিয়ে আমি হেঁটে গেছি দুই চোখ দিয়ে দেখেছি। দেখার পর অন্যের জিনিস দুইহাত দিয়ে নিয়েছি।

যুগী : জিনিসগুলো কি করেছো?

বাল্লক : বাপ, মা, বউ, ছেলেকে খেতে দিয়েছি।

যুগী : কিন্তু, তারা কি তোমার পাপের ভাগি হবে?

বাল্লক দাস বাড়ি গিয়ে সবাইকে জিজ্ঞেস করেন—কেউ তার পাপের ভাগি হবে কি-না। কিন্তু কেউ রাজি হয় না। তখন বাল্লক দাস বৈরাগ্যে পথে আরও গভীরভাবে প্রণয় অনুভব করে গুরু যুগীর কাছে ফিরে আসেন। এবার সে যুগীর কাছে এসে জানতে চান—'এ ভুবনে গুরু কয়টি?'

যুগী এ প্রশ্নের উত্তর দিতেই বাল্লক দাস এবার যুগীর সঙ্গী হবার জন্য দেহের সাজ-অলঙ্কার চান। যুগী তাকে সাজ-অলঙ্কার পরিয়ে দেন। কিন্তু বাল্লক দাস তখন মায়াজালের কথা মনে হয়। এবার যুগী তাকে মায়াজাল কাটার পথ বাতলে দেন। এবার বাল্লক দাস একে একে নারী, স্বপ্ন, ফুল, ঋতু, চন্দ্র, জন্ম ইত্যাদি নানা ভেদতত্ত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করে যুগীর সঙ্গে বৃন্দাবনের পথে যেতে থাকেন।

এই পথে যাবার অভিনয়ের এক পর্যায়ে জৈগানকে সঙ্গে নিয়ে শাম দাস প্রবেশ করেন। এক্ষেত্রে শাম দাস জৈগানকে মা বলে সম্বোধন করেন এবং জৈগানের ভিন্ন জিজ্ঞাসা বাল্লক দাসকে জানান। আসলে

Dhaka University Institutional Repository

জৈগানকে সঙ্গে নিয়ে শাম দাস আসরে প্রবেশ করলে বাল্লক দাস নিজেকে যুগী হিসেবে পরিচয় দেন। তখন জৈগান তাকে নানা ধরনের প্রশ্ন করেন। কিন্তু বাল্লক দাস তার সে প্রশ্নের উত্তর নিজে না করতে পেরে গুরু যুগীর কাছ থেকে জেনে এসে বলেন। এক্ষেত্রে শাম দাস বাল্লক দাসকে শোনা যুগী বলে উপহাস করে। কিন্তু বাল্লক দাস তাতে দমে না গিয়ে গুরুর শিক্ষায় আরও বহু তত্ত্ব নির্ভর জ্ঞান অর্জন করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষা লাভ করেন।[৪৩]

এ ধরনের নাট্য পরিবেশনে গুরু চরিত্রের হাতে থাকে মশাল, শিষ্যের হাতে একটি লাঠি বা মুগুর। মুগুরটি মঞ্চে বা মাটিতে ঠুকে শিষ্য গুরুকে প্রশ্ন করে। গুরুর হাতের মশাল দিব্যজ্ঞানের প্রতীক।

যুগীর গান বা যুগী পর্ব পরিবেশনে পোশাক হিসেবে গুরু সাধারণত সাদা রঙের ফতুয়া, ধুতি পরিধান করেন। আর তাঁর পায়ে বাঁধা থাকে নূপুর। এ ধরনের নাট্য পরিবেশনাতে দোহার-বাদ্যকরগণ মঞ্চের মাঝখানে গোল হয়ে বসে থাকেন এবং সারা রাত যুগী পর্ব পরিবেশনে মূলগায়েন ও তার সহযোগী অভিনেতাদের গানের ধুয়া টেনে, বাদ্য বাজিয়ে সহযোগিতা করেন। দীর্ঘ তর্কবিতর্কের পর শেষ রাতে শিষ্য গুরুর কাছে সন্ন্যাসব্রত বা যুগীমন্ত্রে দীক্ষিত হবার পর এ নাট্যের এক একটি আসর সমাপ্ত হয়।[৪৪]

যুগী পর্বের আখ্যান পরিবেশনে হাস্য রসাত্মক প্রকাশভঙ্গি, বর্ণনা, সংলাপ, গীত ও নৃত্যের সমন্বয় চোখে পড়ে। সাম্প্রতিক কালে জীবিত যুগী পর্বের কয়েকজন পালাকার-শিল্পী হচ্ছেন—নাটোর জেলার কৈগাড়িকৃষ্ণপুর গ্রামের তছের আলী মণ্ডল, হাটজালাবাদ গ্রামের আফসার আলী, করমদোষী গ্রামের মরম গায়েন, দবিলা গ্রামের জহিরউদ্দিন পলান; রাজশাহী জেলার বাগমারা থানার আলোকনগর গ্রামের সুখেন্দ্রনাথ পদ্দার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোদাগাড়ি থানার বশ্যিকুড়া গ্রামের মাহিঙ্গা মাঝি প্রমুখ।

৭. লোকায়ত সর্পদেবী পদ্মা বা মনসা ও তার মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান

বাংলাদেশে আর্য দেবদেবী ছাড়াও অনার্য দেবী মনসা, চণ্ডী, শীতলা এবং অনার্য দেবতা ধর্ম, সূর্য ও শিবের প্রতি প্রবল আনুগত্য ও ভক্তিভাব সঞ্চিত ছিল এবং এখনো তার কিছুটা বর্তমান। ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত প্রায় পাঁচশত বছর ধরে বাংলাদেশে ওই সকল অনার্য দেবদেবীর মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান রচনার পাশাপাশি সে-বিষয়ক পরিবেশনের প্রমাণ পাওয়া যায়। অনার্য দেবদেবীর আখ্যান ভিত্তিক পাণ্ডুলিপি ও পরিবেশনা সমূহ-ই 'মঙ্গলকাব্য' নামে সমধিক পরিচিত। মঙ্গলকাব্য রচনা ও পরিবেশনের সময় থেকে শুরু করে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে ঘটেছে অনেক কিছু, যেমন—ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শোষণ-শাসন ও তার অবসান এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ। কালিক পরিক্রমার এ সকল জটিল ও কঠিন সঙ্কটকে উপেক্ষা করে এদেশের জনগণ অদ্যাবধি বিভিন্নরূপে মঙ্গলকাব্যের গীতিনাট্যাভিনয় বিপুলভাবে পরিবেশন করে আসছে। মঙ্গলকাব্যের ধারায় অভিনীত নাট্যপালার মধ্যে এদেশে 'মনসামঙ্গল'-এর বিভিন্ন আঙ্গিকের নাট্য পরিবেশনা সর্বাধিক জনপ্রিয়।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাম বাংলায় বিভিন্ন দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রকাশ উপলক্ষ্যে যে সকল প্রাচীন কাহিনি ও রূপকথা একত্রিত হয়ে গেয় আখ্যানকাব্যে রূপ নিয়েছিল তার মধ্যে দেবী মনসাকে নিয়ে মনসাবিজয় বা মনসামঙ্গল, দেবী চণ্ডীকে নিয়ে চণ্ডীমঙ্গল, আর ধর্ম দেবতাকে নিয়ে ধর্মমঙ্গল উল্লেখযোগ্য।

এক সময় গ্রামীণ দেবদেবীর বাৎসরিক ও নৈমিত্তিক পূজা-উৎসব অথবা দুর্গাপূজার উৎসব উপলক্ষ্যে দেবতার মন্দিরে কয়েকদিন ধরে চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল বা ধর্মমঙ্গলের গান করা হত। এক্ষেত্রে মনসামঙ্গল-চণ্ডীমঙ্গলের গান হলে আট দিন ধরে, ধর্মমঙ্গলের গান হলে একটানা বারো দিন ধরে আসর বসতো। গানের আসরে দেবতার ঘট স্থাপন করা হত। সেই ঘটে গান শুনবার জন্য দেবতার অধিষ্ঠান কল্পনা করা হত। উদ্দিষ্ট দেবতাকে আহ্বান করবার পর অন্য দেবতাদেরও সভায় শ্রোতারূপে স্বাগত করে বন্দনা করা হত। গানের গোড়ায় এই স্থাপনা ও বন্দনা পালা ব্রতগীত-পাঁচালি বা পাঞ্চালী গানের এক বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। মূল রচনায় দেবতা-বন্দনা এবং সেই সঙ্গে যৎকিঞ্চিত আত্মপরিচয় ও গ্রন্থ রচনার কারণ নির্দেশ প্রায়ই সংক্ষেপে সারা হত, কিন্তু গায়নেরা সাধারণত নিজেদের সংগৃহীত দীর্ঘ বন্দনা পালার শুরুতে জুড়ে দিতেন। তাতে অতিরিক্ত থাকত দিগ্‌বন্দনা। অর্থাৎ যেখানে গান করা হত সেখানকার আশপাশের এবং চতুর্দিকের প্রখ্যাত স্থানীয় দেবতাকে এবং পিতা-মাতা গুরু-পীর ইত্যাদি নরদেবতাকে প্রণতি জানানো হত। একই সঙ্গে অপদেবতার ভয় এড়াবার জন্য দেবতার দোহাই দেওয়া হত।

এ ধরনের ব্রতগীত-পাঁচালি গানের আসর যেন হয়ে উঠতো দেবসভা, আর এমনই এক কল্পনা থেকে গানের শুরুতে দেবতাদের অধিষ্ঠান এবং গান শেষে আবার তাঁদের স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করানো হত। বাংলাদেশের প্রধানতম লোকপুরাণ হচ্ছে—সর্পদেবী মনসার কাহিনি। মনসার কাহিনি পঞ্চদশ শতাব্দী শেষ হবার আগেই পরিণত এবং পরিপূর্ণ পাঁচালিরূপ ধারণ করে। তারই ইঙ্গিত আছে বিপ্রদাসের রচনায়। উল্লেখ্য, বিপ্রদাসের কাব্যটি রচিত হয়েছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে।

বাংলাদেশের গ্রাম পর্যায়ে প্রথম থেকেই বাস্তুদেবতা, আরোগ্যের দেবতা অথবা সম্পদের দেবতা বলে বিভিন্ন নামে মনসার পূজার প্রচলন ছিল। মনসা সাপের দেবতা হলেও নিজে কিন্তু সাপ নন। আসলে, বেদের সময় থেকে আরোগ্য-পুষ্টির রূপকাশ্রিত দেবভাবনা বলে যে নদীদেবতার মহিমা গীত হত তিনি মুখ্যত ছিলেন সরস্বতী। তারই নামান্তর ইলা, পুষ্টি, শ্রী। তিনিই গৌরী যিনি জল কেটে একপদী দ্বিপদী চতুষ্পদী নবপদী সৃষ্টি করেছিলেন। তিনিই বাক্ যিনি নারীরূপে গন্ধর্বদের ছলে দেবতাদের সোম বা অমৃত এনে দিয়েছিলেন। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসের শুরুতে দেবীর এই যে প্রসন্নরূপ তা কিন্তু বাংলা সাহিত্যে প্রথম থেকেই ঢাকা পড়ে গিয়েছে। বাংলাতে মনসা প্রকাশিত হয়েছে চণ্ডীর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে, শুধু তাই নয় শিবভক্তের চরম বিদ্বেষিণী হিসেবে। অবশ্য ঋগ্‌বেদের আরেকটি রূপক ভাবনাও পরে দেবীত্বের মূর্তি পেয়েছিল। তিনি দুর্গমের অরণ্যের দেবতা, পৌরাণিক সাহিত্যে যিনি দুর্গতের দেবতা দুর্গা (পার্বতী, চণ্ডী) হয়েছেন। তার আগে তিনি সরস্বতী-শ্রীর সাথে অভিন্ন ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

মনসা শব্দের মৌলিক অর্থ মনের তীব্র বাসনা, কাম। পৌরাণিক যুগের আগেই সরস্বতী-শ্রীর সঙ্গে বাস্তুনাগদেবতার পূজা মিশে গিয়েছিল। তখন থেকে মনসা নিজে নাগ না হয়েও সর্পরানী। সরস্বতী ও শ্রী (মনসা) দুই পৃথক দেবতায় (মনসা ও লক্ষ্মী) পরিণত হবার আগেই নাগ-পূজার সঙ্গে দেবীর যোগাযোগ ঘটে গিয়েছিল। পরে যখন ভাগাভাগি হল তখন মনসার ভাগে পড়লো সর্প-নাগ আর লক্ষ্মীর ভাগে পড়লো হস্তী-নাগ। কিন্তু এই ভাগাভাগি মুসলমান আমলের আগে পর্যন্ত সম্পূর্ণ পাকাপাকি হয় নি। বাংলায় মুসলমান আমলের আগে নির্মিত হাতি-চড়া মনসার প্রাচীন মূর্তি পাওয়া গেছে। মনসা-লক্ষ্মীর মৌলিক একতার আরো অনেক প্রমাণ আছে। দুই জনেরই নামান্তর কমলা ও পদ্মা। পদ্মদলে মনসার উৎপত্তি আর কমলার আসন পদ্মে। এক সময় চণ্ডী-মনসা (শ্রী) একই দেবতা ছিলেন। পরেও তার স্মৃতি রয়ে গিয়েছে চণ্ডীর কমলে-কামিনী মূর্তিতে। এই মূর্তিতে পদ্ম আছে, হাতি আছে, বিলাসিনী নারী আছে, ক্রোধও আছে। লক্ষ্মীর উৎপত্তি সাগরে, মনসার উৎপত্তি হ্রদে।[৪৫]

মনসামঙ্গলের আখ্যানের মধ্যে দুইটি স্বতন্ত্র লৌকিক-কাহিনির ধারা এসে একসঙ্গে মিলিত হয়েছে। একটি শঙ্কর গারড়ী-নেতার কাহিনি, অপরটি চাঁদ সওদাগর-বেহুলার কাহিনি। সন্দেহ নেই প্রথম কাহিনিটি প্রাচীনতর এবং এর সঙ্গেই পরবর্তীকালে যুক্ত হয়েছে চাঁদ সওদাগর-বেহুলার কাহিনিটি। মঙ্গলকাব্য বিশারদ আশুতোষ ভট্টাচার্য আরও মনে করেন, শঙ্কর গারড়ী-নেতার কাহিনিটি একটি স্বতন্ত্র কাব্যের বিষয়বস্তু হবার যোগ্য, সম্ভবত আগে এ বিষয়ে লৌকিক ছড়া কিংবা লোক-গাথার আকারে স্বতন্ত্র কাহিনি লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। শঙ্কর গারড়ীর চরিত্র কতকটা লৌকিক রামায়ণ কাব্যের রাবণ-চরিত্রের অনুরূপ, খুব প্রাচীন একটি জনশ্রুতি থেকে এটা উদ্ভুত হয়েছে বলে অনুভব করা যায়। সেই জন্যই মনে হয়, লৌকিক রামায়ণের কাহিনি এই শঙ্কর গারড়ীর কাহিনি দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছে।[৪৬]

৭.১ বিষহরির গান

মনসাদেবীর অপর নাম বিষহরি। বিষহরি শব্দটির অর্থ বিষ হরণকারী। লোক-বিশ্বাস আছে যে, মনসাদেবীর গান বা পূজা করলে তিনি মানুষকে বিপদ-আপদকে উদ্ধার করে থাকেন—তাই তিনি বিষহরি। রংপুর অঞ্চলের বিধবারা মনসাদেবীর যে গান গেয়ে থাকেন তাকে *বিষহরির গান* বলা হয়। এ গান পরিবেশনে বিধবা মূলগায়ক বা গিদাল স্বাভাবিকভাবেই সাদা শাড়ি পরিধান করেন। আর যদি দু'একজন সধবা গায়ক দোহারি হিসেবে আসরে উপস্থিত থাকেন তাহলে তাঁরা উজ্জ্বল রঙের প্রিন্ট বা চেক শাড়ি পরে থাকেন।

বিষহরির গানের অভিনয় অনুষঙ্গ রূপে খঞ্জনি নামের এক ধরনের তালযন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। এই খঞ্জনিটি বিষহরির গানের শিল্পীদের নিজস্ব তৈরি। এই বাদ্যযন্ত্রটি এক টুকরো কাঠ ও কয়েক টুকরো ছোট ছোট টিনের পাতের তৈরি। আসলে, টিনের ছোট গোলার দু'তিনটি পাত একটি লোহার কাটা দিয়ে কাঠের টুকরার এক মাথায় এমনভাবে জুড়ে রাখা হয় যেন কাঠের টুকরার অপর প্রান্ত ধরে আরেক হাতে আঘাত করলে ঝনঝন করে শব্দ হয়। এই খঞ্জনি বাদ্য বিষহরির গানে কাঠজুড়িরই বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়। উল্লেখ্য, খঞ্জনি ছাড়া এ ধরনের পরিবেশনাতে অন্য কোনো বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামের বিধবা নারীরা বিষহরির গানের পরিবেশনে অভিনয় উপকরণ সংগ্রহ করেন তাঁদের গ্রামীণ জীবনসম্পৃক্ত প্রকৃতি থেকে। যেমন—ভাসান দৃশ্য আসতেই কলাগাছের একটি খোলস এনে বাঁশের কঞ্চি, পাটকাঠি ও গামছা দিয়ে ছইসমেত ভেলা তৈরি করে নেন। শুধু তা-ই নয়, ভেলায় তুলে নেন খড়ের তৈরি বালা-বালী বা লক্ষ্মীন্দর বেহুলা। এরপর ভাসান দৃশ্য শুরু হতেই গিদাল বেহুলার কষ্ট কান্নাকে নিজের অন্তরদেহে ধারণ করে সেই ভেলা হাতে এমনভাবে আসর পরিক্রমণ করতে থাকেন। এমনই ভাবে জিয়ন দৃশ্যে একটি কাঁসার থালায় ভরা পানির মধ্যে সাত টুকরো পাটকাঠি নিয়ে চাঁদ সওদাগরের সাত পুত্র জিয়ানো হয়। এছাড়া, সেই একই থালার পানিকে সমুদ্র হিসেবে বর্ণনা করে তার ভেতর থেকে চাঁদের ডুবে যাওয়া বাণিজ্য ডিঙা উত্তোলন করা হয়। এক্ষেত্রে বিধবা বয়স্কা নারীর হাতের লাঠির বাঁকানো মাথাটি থালার পানি ছুঁয়ে ধীরে ধীরে দাঁড় করিয়ে চাঁদের বাণিজ্য ডিঙার উত্তোলন দেখানো হয়। বিষহরির গানের মধ্যে একটি দৃশ্যে আছে, বেহুলা তার সখীদের নিয়ে বাজার দেখতে যাচ্ছে। এই দৃশ্যটিতে বাজারে যেতে পথে নদী পড়লে বেহুলা যখন নদী পার হতে চায় তখন একটি কাঁথাকে দুটি পাটকাঠির সঙ্গে বেঁধে নৌকা তৈরি করা হয়। আর সেই নৌকাতে করে গানে গানে বেহুলা তার সখীদের নিয়ে নদী পার হয়ে যায়।

বিষহরির গান করার জন্য অবশ্য পালনীয় কিছু কৃত্যাচার রয়েছে। যেমন—গান শুরুর আগে মনসামূর্তির সামনে গিয়ে গিদাল ও তার সহযোগী দোহারিদেরকে মনসাপূজা ও প্রণাম করে আসতে হয়। এরপর আসরে এসে গিদাল প্রথমেই টানা সুরে বন্দনা শুরু করে :

'বন্দনা মা সরেস্বতী পুরাণে মহিমা শুনি। মা গো ওগো মা মানসা... ॥'

একে একে সরস্বতী, বিষ্ণু, ধর্মনিরঞ্জনসহ অন্য দেব-দেবীসহ শিক্ষাগুরু-দীক্ষাগুরু ও গানের গুরুদের বন্দনা করে নেন। এই বন্দনাগীতে সহযোগী দোহারিগণ তাঁদের সম্মিলিত কণ্ঠ যোগ করেন গীদালের কণ্ঠের সঙ্গে। বন্দনাগীত শেষ হলে গিদাল একটি বর্ণনাত্মক-গীতের ভেতর দিয়ে মূলপালার সূচনা করেন :

কান্দে কান্দে ওহে সনেকা। আহা রে হায় ॥
আরে কান্দে কান্দে ওহে সনেকা পন্থে বসিয়া। হায় রে ও ও হায় রে হায় ॥
ওই না পন্থে দিয়া যাইতে আছে নারদও ভাগিনা। ও আরে হায় রে হায় ॥
কেনে কান্না করে মামী পন্থে বসিয়া। হায় রে ও ও হায় রে হায় ॥

বর্ণনাত্মক-গীতের এ পর্যায়ে দোহারিদের ভেতর থেকে একজন নারী নারদের ভূমিকা নিয়ে দোহার দল থেকে বেরিয়ে এসে গিদালকে প্রশ্ন করে—'ও মামী?'

সাথে সাথে গিদাল হয়ে ওঠেন সনেকা চরিত্র দানকারী অভিনেত্রী। তিনি সনেকার ভূমিকায় পাল্টা উত্তর নেন—'কী?'

নারদ পাল্টা সংলাপে বলেন—'আপনি কেনে পন্থে বসে করুণা করেন?'

'আমি কেনে পন্থে বসে কান্দি?'

Dhaka University Institutional Repository

'হয় মামী।'

'ওই ছয় পুত্র গেছে আমার কালিদাহ সাগরে। ছয় বধূ আড়িয়াছে ছয় মন্দির ঘরে ॥ সুখের ঘরে হাটিয়া আগুনও জ্বালি। দুই নয়নের জলে আমি পন্থেই বসে কান্দি।'

'এটাই তোমার মনের দুঃখ?'

'এটাই আমার মনের দুঃখ।'

সংলাপাত্মক অভিনয়ের এ পর্যায়ে নারদ গীত-সংলাপে প্রবেশ করেন :

আমার বচন শুনো মামী। আমার বচন ধরো ও রে ও আরে হায়
রূপের গাছে মামী কত ফলও ধরে। আরে ও ও হায়।
কতেকও ঝুরিয়া পড়ে কতক ফলও ধরে। আরে ও ও হায় রে হায়।[৪৭]

গিদাল তাঁর বর্ণনাত্মক গীতের পর গদ্যে এসে এভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করে নতুন করে বর্ণনাত্মক গীত ও সংলাপাত্মক অভিনয়ে কাহিনি এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন।

বিষহরির গানের পুরো পরিবেশনাতে এক একটি ঘটনাকে এভাবেই বর্ণনা, গীত, সংলাপ এবং নৃত্য সহযোগে অভিনয় আকারে উপস্থাপন করা হয়। বিষহরির গানের পুরো পরিবেশনাটি গান ও নাচনির্ভর।

রংপুর অঞ্চলে প্রচলিত বিধবাদের বিষহরির গানের সঙ্গে পুরুষ শিল্পীদের অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায় না। অতীতেও এ ধরনের পরিবেশনের সঙ্গে পুরুষ শিল্পীদের কোনো যোগ ছিল না বলে বিষহরির গানের বর্তমান কালের শিল্পীরা জানান। প্রতি বছর বেশ কয়েকবার বিষহরির গানের আসর হয়ে থাকে। রংপুর শহর থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দক্ষিণে ফতেহপুর-দুর্গাপুর গ্রামে এই গানের বিখ্যাত দুইজন গীদালের নাম শোনা যায়। যাঁদের একজন হচ্ছেন—শরৎ পাগলি বা শরৎ বালা, আর অপরজন তাঁরই শিষ্যা সজো বালা।

৭.২ পদ্মাপুরাণ গান

বাংলাদেশের লোকায়ত দেবী পদ্মা বা মনসা বিষয়ক আখ্যানের পরিবেশন-আঙ্গিক *পদ্মাপুরাণ গান* রাজশাহী-নাটোর অঞ্চলের সবচেয়ে জনপ্রিয়। *পদ্মাপুরাণ গানের* কাহিনি থেকে জানা যায়, বৃক্ষডালে শ্রীফল দেখে স্ত্রী পার্বতীর স্তনের কথা মনে হলে মহাদেব শিব কাম ভাবে আক্রান্ত হন। আর তখনই তার বীর্য স্খলন হয়। মহাদেব সেই স্খলিত বীর্য নিয়ে কালীদহের পদ্মপাতার উপর রেখে দেন। সাথে সাথে তা পদ্মপাতার নাল বেয়ে পাতালে বাসুকীর কাছে চলে যায়। বাসুকী তা থেকে এক কন্যা সৃজন করেন। তারই নাম পদ্মাদেবী। আর পদ্মাপাতায় জন্ম নেওয়া সর্পদেবী পদ্মার পৌরাণিক কাহিনি অবলবম্বনে যে গীতাভিনয় করা হয় তাকে *পদ্মাপুরাণ গান* বলা হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে *পদ্মাপুরাণ গান* পরিপূর্ণ নাট্যধারার রূপ লাভ করে এবং ষষ্ঠদশ শতকে মঙ্গলকাব্যের বিকাশের যুগে এই আখ্যানের পরিবেশনা সারা বাংলায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বিগত

Dhaka University Institutional Repository

কয়েক শতাব্দী ধরে বহু প্রতিভাবান কবি ও পালাকার দ্বারা পদ্মাপুরাণের আখ্যাননির্ভর অসংখ্য পাণ্ডুলিপি রচিত এবং তা অভিনয় আকারে এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবেশিত হয়ে আসছে। সেই ধারাবাহিকতায় প্রায় ২০০ বছর ধরে উত্তরবঙ্গের রাজশাহী-নাটোর অঞ্চলে *পদ্মাপুরাণ গান* নামের এক ধরনের পরিবেশনরীতি প্রচলিত রয়েছে।

পদ্মাপুরাণ গান পরিবেশনে মূলগায়েন অভিনয় উপকরণ হিসেবে সাধারণত একটি চামর ব্যবহার করেন। আসরে চামর ধারণ প্রধান গায়ক বা মূলগায়েনকে নির্দেশ করলেও সংলাপাত্মক অভিনয়ে সেই চামরকে অন্যান্য গায়ক-অভিনেতা কখনো কখনো বিশেষ বস্তু আকারে ব্যবহার করে থাকেন। যেমন—শিবের জটা থেকে তক্ষকনাগ (কালনাগ) চুরি করতে মনসা (অভিনেতা) পিতা শিবকে ভাঙ-ধুতরা দিচ্ছেন চামর ব্যবহারের মাধ্যমে। এছাড়া, ভাসান-দৃশ্যে দু'একটি দল অভিনয় উপকরণ হিসেবে কলার ভেলা ব্যবহার করে থাকে। এক্ষেত্রে ভেলাটিকে জরি ও ফুল দিয়ে সাজানো হয় এবং ভেলার মধ্যে মৃত লক্ষ্মীন্দরের প্রতীক হিসেবে একটি প্লাস্টিকের পুতুল শুয়ে রাখা হয়। এ ধরনের পরিবেশনে আরো কিছু অভিনয় উপকরণ ব্যবহার করতে দেখা যায়, যার ব্যবহার অনেকটাই ভক্ত-পৃষ্ঠপোষকদের দান বা সরবারহের ওপর নির্ভরশীল। যেমন—বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের বিবাহ দৃশ্যে ভোগ হিসেবে প্রদেয় শঙ্খ, সিঁদুর, ঘট, আম্রপল্লব, পাখা, কলা প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। বিশেষত অগ্নি-সাক্ষী রেখে বেহুলাকে বিবাহের সময়ে লক্ষ্মীন্দরের সাত পাক ঘোরার বর্ণনাত্মক অভিনয় অংশে কুশীলবগণকে উপর্যুক্ত প্রাপ্ত দ্রব্যবস্তু হাতে নিয়ে বৃত্তাকারে পরিক্রমণ করতে দেখা যায়। এছাড়া, জিয়নপর্বে কাণ্ডারি ঘেরা, অর্থাৎ মৃত লক্ষ্মীন্দরকে জীবিত করার সময়ে সাদা ধুতি দিয়ে মৃতের চারদিকে ঘিরে রাখা হয়।

এ ধরনের পরিবেশনে রাজশাহী-নাটোর অঞ্চলের কুশীলব-পালাকারগণ সাধারণত *বাইশকবি পদ্মাপুরাণ*-এর মুদ্রিত পুঁথিকে অনুসরণ করলেও তার সঙ্গে উক্ত অঞ্চলে প্রচলিত মৌখিকরীতির *মনসামঙ্গল* কাহিনির মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। পদ্মাপুরাণের সমগ্র আখ্যানকে পদ্মার জন্ম, চাঁদের জন্ম, বালা-বালীর জন্ম, বাণিজ্য, দংশন, শংকরওঝা বধ ও ভাসান নামে সাতটি পালায় বিভক্ত করে বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলে পরিবেশন করা হয়ে থাকে। সাত পালায় সমগ্র আখ্যান পরিবেশনে এক থেকে এগারো দিন পর্যন্ত সময় লাগে। তবে, অধিকাংশক্ষেত্রে দুই থেকে তিন দিন ধরে পালা পরিবেশন করতে দেখা যায়। বিশেষ প্রকার ধর্মীয় উৎসব বা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কখনো কখনো পাঁচ থেকে এগারো দিন ধরে *পদ্মাপুরাণ গান* পরিবেশিত হয়ে থাকে। এ ধরনের নাট্যপালা পরিবেশনের সময়ে আসরে চারদিকে দর্শক-ভক্তগণ অবস্থান গ্রহণ করেন। আর এ ধরনের নাট্যপালা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে থাকেন মূলগায়েন।

পদ্মাপুরাণ গান পরিবেশনের শুরুতে কুশীলবগণ আসরে এসে অর্ধবৃত্তাকারে উত্তর বা মন্দিরের দিকে মুখ করে পাশাপাশি সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে সম্মিলিত বাদ্য বাদন করেন। সম্মিলিত বাদ্য বাদনের দ্বিতীয় পর্যায়ে মূলগায়েনের সাথে অন্যান্য কুশীলব জোড়হাতে মনসার ধ্যান এবং প্রণামমন্ত্র পাঠ করেন। এরপর সকলে একসঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে রাম নাম শরণ ও বন্দনাগীত পরিবেশন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

বন্দনাগীতের পর শুরু হয় পদ্মাপুরাণ গানের মূল আখ্যান পরিবেশনা। সাধারণত বর্ণনাত্মক গীত, বর্ণনাত্মক গদ্য ও পদ্য এবং সংলাপাত্মকগীত, সংলাপাত্মক গদ্য ও পদ্যের আশ্রয়ে পদ্মাপুরাণ গানের আখ্যান পরিবেশনে করা হয়। এই নাট্য পরিবেশনে সকল ধরনের গীত ধুয়া সহযোগে গীত হয়। সচরাচার মূলগায়েন ধুয়া টেনে এক একটি গীতাংশের সূচনা করেন। এরপর সেই ধুয়াটি দোহারগণ গেয়ে চলেন আর তখন মূলগায়েন গানের অন্যান্য চরণ পরিবেশন করে আখ্যানবস্তুকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন বা কোনো চরিত্রের ভাব প্রকাশ করে থাকেন।[৪৮]

এভাবেই বর্ণনাত্মক গীত, বর্ণনাত্মক গদ্য, সংলাপাত্মক গদ্য, পদ্য ও গীতাভিনয় এবং নৃত্য সহযোগে পদ্মাপুরাণ গান পরিবেশিত হয়ে থাকে। রাজশাহী-নাটোর অঞ্চলে পদ্মাপুরাণ গানের ঐতিহ্য এখনও অনেক সমৃদ্ধ। হিন্দু-মুসলিম অসংখ্য গায়েন-পালাকার উক্ত অঞ্চলে প্রায় সারা বছরই বিভিন্ন মানতে এ ধরনের নাট্যপালা পরিবেশন করে থাকেন। এ ধরনের নাট্যপালা পরিবেশনে উক্ত অঞ্চলের নাটোর জেলার কৈগাড়িকৃষ্ণপুর গ্রামের তছের মণ্ডলের পদ্মাপুরাণ গানের দল ও একই জেলার বাগাতিপাড়া থানার জামনগর-শাখারিপাড়া গ্রামের সনৎকুমার সাহা ও আশরাফ আলীর মনসামঙ্গল থিয়েটার এবং রাজশাহী জেলার চারঘাট থানার মৌলভাগ-চাইপাড়া গ্রামের সুবলচন্দ্র মণ্ডলের রাধা-গোবিন্দ সম্প্রদায় এবং বাসুদেবপুর গ্রামের ক্ষুদিরামচন্দ্র প্রামাণিক ও মহিষাণখাঁ গ্রামের নিতাইচন্দ্র মণ্ডলের *পদ্মাপুরাণ গানের* দল সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এছাড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বারোঘরিয়া-নতুন বাজার গ্রামের অসিত কুমার পাল এবং কুষ্টিয়া জেলার রামচন্দ্র মোহন্ত গোঁসাই ও মাধব গোঁসাই পদ্মাপুরাণ গানের আসর করে থাকেন।

৭.৩ পদ্মার নাচন

পদ্মাপুরাণের আখ্যানের গীতিনৃত্যনাট্যমূলক পরিবেশনাকে *পদ্মার নাচন* বলা হয়। এ ধরনের নাট্য পরিবেশনে নৃত্যের আধিক্য থাকে বলেই পরিবেশনরীতির নামের সঙ্গে নাচন শব্দটি যুক্ত হয়েছে। এ ধরনের পরিবেশনা মূলত পাবনা অঞ্চলে প্রচলিত পদ্মাপুরাণ গান থেকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে সৃষ্টি হয়েছে।

পদ্মার নাচন মূলত একটি নৃত্য প্রধান পরিবেশনরীতি। নৃত্য ছাড়াও এ ধরনের পরিবেশনরীতিতে বর্ণনাত্মক গদ্য, বর্ণনাত্মক গীত এবং সংলাপাত্মক অভিনয় লক্ষ করা যায়। আসরের শুরুতে বাদ্যযন্ত্রী ও অন্যান্য কুশীলব খোল বাদককে কেন্দ্রে রেখে বৃত্তাকারে অবস্থান গ্রহণ করে ভূমি প্রণাম করে নেন। এরপর খোল এবং করতাল বাদনের মধ্যে সকল কুশীলব এবং ছুকরিগণ বৃত্তাকারে নৃত্যযোগে বাম দিক থেকে ডান দিকে আসর পরিক্রমণ করেন। কুশীলবদের আসর পরিক্রমণের পর এ ধরনের পরিবেশনে একে একে রামস্তব, বন্দনা গীত এবং পালার প্রসঙ্গ অবতারণা করা হয়। প্রসঙ্গ অবতারণাকে পালা পরিবেশনের প্রস্তাবনা বলা যেতে পারে। কেননা, এ পর্বে দুই গায়েন উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক সংলাপের ভেতর দিয়ে পালা পরিবেশনের উদ্দেশ্য ও কারণ ব্যক্ত করে থাকেন। আর মূল আখ্যান পরিবেশনে সাধারণত বর্ণনাত্মক গদ্য, বর্ণনাত্মক গীত, গদ্য সংলাপ, গীত সংলাপ এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে বর্ণনাত্মক গীত ও গীত সংলাপ মিশ্রভাবে পরিবেশিত হয়ে থাকে।[৪৯]

Dhaka University Institutional Repository

পদ্মার নাচনে বর্ণনাত্মক গীত পরিবেশনের সময় বাদ্যযন্ত্রীগণ, ছুকরি এবং পাইল-দোহার বেষ্টিত একটি ছোট বৃত্তের বাইরে মূলগায়েন আরেকটি বড় বৃত্ত রচনা করে বাম-ডান উভয় দিকে পরিক্রমণ করেন। তবে, ছুকরি ও দোহারগণ কেবল বামদিক দিয়ে নৃত্যযোগে ধুয়া গেয়ে পরিক্রমণ করতে থাকেন। দোহারগণ প্রতিবার ধুয়ার প্রথম মাত্রার উপরে ঘূর্ণনসহ ধুয়া গেয়ে বৃত্ত রচনা অব্যাহত রাখেন। বৃত্তে দোহারদের অবস্থান থাকে কেন্দ্রমুখী।

বর্ণনাত্মক গীতের এক পর্যায়ে গায়েন চলমান তাল থামিয়ে দ্রুত তালে পুনরায় বর্ণনাত্মক গীত (লাচাড়ি) শুরু করেন। এসময়ে ধুয়ার চরণ সংক্ষিপ্ত এবং পয়ারের দ্বি-পদী চরণ থেকে এক-পদী চরণ শেষে এই সংক্ষিপ্ত ধুয়া পরিবেশিত হয়। তাল দ্রুততর হয় এবং নৃত্যে উল্লম্ফন ও ঘূর্ণন অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। এই পরিবেশনের নৃত্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য কোমরের ব্যবহার। এই নৃত্যে দোহার বা নৃত্যকারগণ এক নাগাড়ে দীর্ঘক্ষণ বিশেষভাবে কোমর ঘোরাতে থাকেন। এই বিশেষ প্রকারের নৃত্যকে পদ্মার নাচনের শিল্পীরা 'ডাইল ঘোটা' বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। শুধু তাই নয়, তারা নৃত্যে সমস্ত শরীরের ঘূর্ণনকে 'পায়রা' বলে থাকেন। লাচাড়ি পরিবেশনের সামগ্রিক যে রূপ পরিলক্ষিত হয় তা হল—এসময়ে খোল বাদক দোহারদের বৃত্তের কেন্দ্রে অবস্থান করেন এবং এক পর্যায়ে তিনি তালের ছন্দের সাথে ছড়া কেটে বোল বলেন। দীর্ঘ সময় নিয়ে পরিবেশিত হতে থাকে এই নৃত্য। এ ধরনের নৃত্যাংশে মূলগায়েনও তার গীতাভিনয় বন্ধ রেখে উক্ত নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন। অবশ্য এ সময়ে কখনো কখনো তাকে বিশ্রামে চলে যেতেও দেখা যায়। নৃত্য পরিবেশনের অংশটি পরিচালনা করেন খোল বাদক। এভাবে বেশ কিছু সময় চলার পর বাদক জোরালো তেহাই যোগে নৃত্য পরিবেশনের এই বিশেষ অংশটি শেষ করেন।

নৃত্যাংশ শেষ হলে গায়েন পুনরায় বর্ণনাত্মক গীত, বর্ণনাত্মক গদ্য, অথবা সংলাপাত্মক গদ্য যে কোনো একটি উপাদান ব্যবহার যোগে আখ্যান পরিবেশনা শুরু করেন। সংলাপাত্মক গদ্য অভিনয়ের সময়ে দোহারগণ বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ পান। দুই গায়েন এবং সকল নারী চরিত্রের ক্ষেত্রে যে কোনো একজন ছুকরি এই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। সংলাপাত্মক অভিনয়ে অভিনেতাদের সংলাপ প্রক্ষেপণে কণ্ঠের বিশেষ কোনো পরিবর্তন নেই। তবে ভাব ও রসযুক্ত সংলাপাত্মক অভিনয়ের সাথে আঙ্গিক অভিনয়ের বিশেষ প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন—বাসর ও দংশন দৃশ্যে বেহুলা লক্ষ্মীন্দর (যথাক্রমে ছুকরি ও গায়েন) একটি পাটিতে পাশাপাশি শুয়ে বর্ণনাত্মক গীত এবং সংলাপাত্মক গদ্যে কাহিনির চরিত্রাভিনয় পরিবেশন করেন। এসময়ে দ্বিতীয় গায়েন কালনাগ হয়ে এসে শয়নরত দু'জনকে ঘিরে কালনাগের অভিনয় (বর্ণনাত্মক গীত) করেন। এভাবে সংলাপাত্মক অভিনয়ে নানান দৃশ্য তৈরি করে কাহিনি পরিবেশন করতে দেখা যায়।

প্রায় সারা বছর কুষ্টিয়া জেলার মুসলমান ধর্মাবলম্বী গ্রামের কৃষক, শ্রমিক ও খেটে খাওয়া মানুষ পেশাজীবীর ভিত্তিতে এ ধরনের গীতিনৃত্যমূলক নাট্য পরিবেশন করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর, ভেড়ামারা ও মিরপুর থানাতে মুসলমান গায়কদের নেতৃতে *পদ্মার নাচনের* অসংখ্য দল প্রত্যক্ষ করা যায়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দল হচ্ছে—ভেড়ামারা থানার পরানখালি গ্রামের হায়দার আলী, মিরপুর থানার নওদাখারারা গ্রামের আক্তার পরামানিক, কেউপুর গ্রামের হোসেন আলী,

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগচারমাইল গ্রামের ময়েনউদ্দীন বয়াতী এবং দৌলতপুর থানার নারায়ণপুরের নাসির উদ্দিন, সুরামপুরের জামাত, দীঘরকান্দির গনিমুল্লা, শেরপুরের শারেজ উদ্দিন, ছাতারপাড়া ইউসুফপুরের মক্কেল ও ঝাওদিয়ার পাথর হাজামের *পদ্মার নাচনের* দল।

উল্লেখ্য, 'পদ্মার নাচন' মূলত জনপ্রিয় লোকদেবী মনসা বা পদ্মাপুরাণ গানের একটি গীতিনৃত্যমূলক নাট্য হলেও এ ধরনের পরিবেশন-আঙ্গিকের অধিকাংশ শিল্পী-কলাকুশলী মুসলমান বলে ভিন্নতর গুরুত্বের দাবি রাখে। আসলে, সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পদ্মাপুরাণ গানের বহুবিধ পরিবেশনরীতি বর্তমান থাকলেও কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা, মিরপুর, দৌলতপুর অঞ্চলের মতো অন্য কোথাও এতো ব্যাপকভাবে মুসলমানদের অংশগ্রহণে পদ্মাপুরাণের আখ্যান পরিবেশন করতে দেখা যায় না।

৭.৪ বেহুলার নাচাড়ি

কুষ্টিয়া জেলার মতো টাঙ্গাইল জেলাতেও কিছু সংখ্যক নিম্নবর্গের মুসলমান পদ্মাপুরাণের আখ্যান পরিবেশন করে থাকেন। এই অঞ্চলের পরিবেশনরীতির নাম *বেহুলার নাচাড়ি* এবং এ ধরনের পরিবেশনাতেও নৃত্যের আধিক্য চোখে পড়ে।

টাঙ্গাইল অঞ্চলের বেহুলার নাচাড়ি মূলত নৃত্য-গীত প্রধান পরিবেশনরীতি হলেও এ ধরনের পরিবেশনাতে সংলাপাত্মক ও বর্ণনাত্মক অভিনয় প্রত্যক্ষ করা যায়। সংলাপাত্মক অভিনয়ের ক্ষেত্রে যাত্রার সংলাপ প্রক্ষেপণের কিছুটা প্রভাব থাকলেও এ ধরনের পরিবেশনাতে যাত্রার অভিনয়রীতি তেমনভাবে অনুসৃত হতে দেখা যায় না। বেহুলার নাচাড়ির অভিনেতাগণ তাদের চরিত্রাভিনয়ের অনেক সময় ভাবাক্রান্ত হয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে তারা পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গনসহ মাটির উপর আছড়ে পড়েন এবং কখনোবা আবার চেতনালুপ্ত হয়ে যান। চেতনালুপ্ত অভিনেতাকে অন্যান্য কুশীলব অভিনয় স্থান থেকে কোলে তুলে সাজঘরে নিয়ে গিয়ে সুস্থ করে তোলেন। তবে, অভিনেতা চেতনা হারালেও বেহলার নাচাড়ির চলমান অভিনয়কে কখনো অভিনয় থেমে থাকতে দেখা যায় না। বর্ণনাকারী ওস্তাদ এক্ষেত্রে মঞ্চে এসে বর্ণনাত্মক অভিনয়ের আশ্রয়ে অপর কোনো একটি ঘটনা বা দৃশ্যের অভিনয়ের অবতারণা করেন।

এ ধরনের আসরে বর্ণনাকারীর ভূমিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আসলে পালার আখ্যানকে সংক্ষিপ্ত এবং বিস্তৃতির ক্ষেত্রে তিনিই প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকেন। মঞ্চে এসে তিনি গল্পকথকের ছলে তার বর্ণনা করেন, যে কারণে মুহূর্তের মধ্যে তিনি অনেক ঘটনার বর্ণনা মাত্র কয়েকটি কথার ভেতর দিয়ে সমাপ্ত করে আখ্যানকে বেশ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। আবার দর্শক-শ্রোতাদের উপস্থিতি ও মুগ্ধতা দৃষ্টে তিনি আখ্যান বস্তুর মধ্যে একটি ঘটনাকে অনেকখানি বিস্তৃত দান করে থাকেন।

বেহুলার নাচাড়ির শুরুতে বাদ্যযন্ত্রীগণ বেশ কয়েকটি গানের সুরে সম্মিলিত বাদ্য বাদন করেন। এরপর ওস্তাদ এবং নারীর বেশধারী তিন-চারজন ও লক্ষ্মীন্দর চরিত্রে রূপদানী অভিনেতা সাজঘর থেকে মঞ্চ প্রণাম করে বৃত্তাকারে ঘুরে বাদ্যযন্ত্র ও বাদ্যকরদের প্রণাম করে পূর্বমুখী হয় বন্দনাগীত শুরু করেন। বন্দনাগীত

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশনের সময় ওস্তাদ অনেক সময় দোহার-বাদ্যকর দলে অবস্থান নেন। আর নারীর বেশধারী অভিনেতা ও লক্ষ্মীন্দর চরিত্র মঞ্চের চার কোণে দাঁড়িয়ে বন্দনাগীত পরিবেশন করেন। বন্দনাগীতের মধ্যে যখন যেদিকের কথা আসে অভিনেতাগণ তখন সেদিকে মুখ ঘুরে নৃত্যের ছন্দে দেহ দুলিয়ে বন্দনা গেয়ে চলেন :

ওরে আইসো পদ্মা মা গো বড় আসরে
আসিলে বসিতে গো দিবো আমার মস্তকের উপরে রে ॥
প্রথমে বন্দনা গো করি পুবের ভানুশ্বরও রে
একদিকে উদয় রে ভানু ভালো চৌদিকে ফজরও রে ॥
দ্বিতীয় বন্দনা গো করি হিন্দু-মুসলমানও রে
মুসলমানে জানাই গো সালাম ভালো হিন্দুদের প্রণামও রে ॥
পশ্চিমে বন্দনা গো করি ভালো হযরতের চরণও রে
রোজ হাসরে করবেন ভালো সকল পাপীগণও রে ॥
দক্ষিণে বন্দনা গো করি ভালো ক্ষীর নদী সাগরও রে
সেই সাগরে চালাইতো ডিঙ্গা ভালো চান্দু সওদাগরও রে ॥
পাতালে বন্দনা গো করি ভালো মা কালীর চরণও রে
ওস্তাদ আমার হালিম মিয়া ভালো সিংগুরিয়াতে বাসও রে ॥

এ ধরনের বন্দনাগীত পরিবেশন করে অভিনেতাগণ মঞ্চ থেকে প্রস্থান করতেই বর্ণনাকারী ওস্তাদ এসে আখ্যান বর্ণনা শুরু করেন। এ ধরনের আসরে সাধারণত পদ্মাদেবীর জন্মের ঘটনা দিয়ে শুরু হয়। পদ্মার জন্ম প্রসঙ্গে উল্লেখ করে বর্ণনাকারী মঞ্চ থেকে চলে যেতেই মঞ্চে শিব চরিত্রের আগমন ঘটে। তার সঙ্গে ঘটনা প্রাসঙ্গিক অন্যান্য চরিত্রেরও আগমন প্রত্যক্ষ করা যায়।

এ পর্যায়ে পদ্মাদেবীর জন্মের পরবর্তী অংশের একটি ঘটনার উদ্ধৃতি করে বেহুলার নাচাড়ির পরিবেশনরীতি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা নেওয়া যেতে পারে। টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী থানার হরিপুর গ্রামে পরিবেশিত আব্দুল করিম ও রুস্তম আলীর বেহুলার নাচাড়ি দলের একটি অংশে বর্ণনাকারী ওস্তাদ মঞ্চে এসে আখ্যান বর্ণনায় বলেন :

বর্ণনাকারী/ ওস্তাদ : এবার পদ্মাদেবী কী করতাছে? আস্তে-আস্তে পুষ্পরথে চইড়া বইছে। কতেক দূরে যাইতে শেষে ছিল একা ধন। আপনারও বাড়িতে যাইয়া দেছে দরশন। বাড়িতে করছে কী এমন ঝোলাখান ধরনানোকে বাঁধাই থুইয়া শিব গেছে চান্দরবন পুষ্প নিতে। যখন এই পদ্মাদেবীকে ঝোলার ভিতর ভইরা রাখছে একটা পুষ্পফুল বানাইয়া। যখন ওই ঝুলাখান ধরনানোকে বাঁধাই থুইছে।

Dhaka University Institutional Repository

এখন আস্তে-আস্তে পার্বতী চিন্তা করতাছে, এরে আমার স্বামী পাহাড়ে যায়, পাহাড়ে গিয়ে ফল আনে, সুন্দর ফল আনে, আমার স্বামী খায়, আমিও খাই। আজকে না জানি কি জিনিস আনছে ওই ঝুলাখান ধরনানোকে বাঁধাই থুইয়া গেছে।

এই যে পাকের ঘরের থিকে একটা বাঁধা ঝাটা হাতে নিয়া, একটা বিষধর তীর হাতে নিয়া আস্তে-আস্তে পাকের ঘরের থিকা বড় ঘরের দিকে চইলা যাইতেছে। পদ্মাদেবীর ভরে ধরনানোকের ঘরে ওই ঝুলাখান আস্তে-আস্তে নড়ে। যখন ওই ঝুলাখান নড়ে। তখন ওই পার্বতী ভাবলো, ঝুলার ভেতর খাইলা বাঘ নড়তাছে। তখন ওই বিষধর একটা তীর দিয়া আঘাত করছে। পদ্মাদেবীর বাম চোখে হান্দায়ছে। তাই মা বলে একটা চিক্কির দিছে। মায়ের সাথে কথা বলতাছে আর পদ্মাদেবী আস্তে-আস্তে শান্ত হইতাছে। যাইক, এইভাবে পদ্মাদেবীকে লালন-পালন করতাছে। কিছুদিন পরে পদ্মাদেবী বলতাছে, মাগো আমি একটা দেবতা, আমি খাবো দুধকলার ভোগ। এই খাদ্যর কাম আমার না। তখন মায় বলছে, যা বলছো একবারই বলছো। আমার বাড়ির থিকে তুমি চলে যাও আমি তোমাকে লালন-পালন করতে পারবো না। তাই পিতার কাছে চলে গেছে।

পিতা গো, তুমি যদি আমাকে একটা দুধকলার ভোগ দাও আমার আমার এই উদরটা ভরবে।

তাই শিব বলতাছে, তোমাকে যে একটা দুধকলার ভোগ দেবো এই ক্ষমতা আমার নাই। তুমি চইলা যাও ওই উজানি নগর চন্দ্র সওদাগরের বাড়িতে। এই চন্দ্র সওদাগর যদি একটা পূজা তোমাকে দেয়, হিন্দু-মুসলমান সত্য তোমাকে ভজবে আর একটা কইরা পূজা দেবে।

এইবার চন্দ্র সওদাগরের বাড়ি যাইতাছে একটা পূজা লইতে।

এবার বর্ণনাকারী আসর ত্যাগ করতেই পদ্মাদেবী প্রবেশ করে দোহারদলের সামনে গিয়ে বসেন। আর পরক্ষণেই পার্বতী এসে মঞ্চে এসে বলেন :

পার্বতী : শিব তো গেছে অনেকদিন হয়ে চলেছে, এখনও আসে না কেন?

এমন কথার মধ্যে আসরে শিবের আগমন ঘটে। তিনি এসে বলেন :

শিব : একী পার্বতী, আমি তোমাকে যত্ন করে প্রসাদ দিতে বলেছিলাম। শোনা পার্বতী এইবার তুমি আমার সেই প্রসাদটা দেও। আজ যে আমি আমার প্রাণটা জুড়িয়ে খাবো। আর শোনো পার্বতী আমার জন্য সেবা প্রস্তুত করো, আর আমি যে ঝুলাখান করনানোকে ঝুলাইয়ে রাখছি ওইটা তুমি কখনো হাত দিও না।

Dhaka University Institutional Repository

এ কথা বলে শিব চরিত্র মঞ্চ ত্যাগ করতেই পার্বতী চরিত্র বলেন :

পার্বতী : শিব যে আমার দোহায় দিলো, কিন্তু ঝুলার ভিতরে কি আছে?

এ কথা বলে তিনি দোহার-বাদ্যকরদের সামনে বসা পদ্মাদেবীর পিঠে আঘাত করেন। সাথে সাথে পদ্মাদেবী চিৎকার বলেন :

পদ্মাদেবী : মা। মা গো।[৫০]

এখানে প্রত্যক্ষ করা যায়, ওস্তাদ কর্তৃক বর্ণনাত্মক অংশ কথকতার ভঙ্গিতে পরিবেশিত হয়ে থাকে। আর এই বর্ণনাত্মক অংশ মূলত পালার আখ্যানভাগকে খুব সহজে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং সংলাপাত্মক চরিত্রাভিনয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে। শুধু তাই নয়, এ ধরনের পরিবেশনরীতির আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য গীত-নৃত্য মূলত সংলাপাত্মক চরিত্রাভিনয়ের সময়েই প্রযুক্ত হতে দেখা যায়।

টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি থানার হরিপুর গ্রামের ওস্তাদ রুস্তম আলী ও ম্যানেজার আব্দুল করিম-এর নেতৃত্বে হরিপুর, বেতডুবা, সাতকুয়া, নারাইঙ্গেল, নওয়াবাড়ি, কস্তুরীপাড়া এবং ঘাটাইল থানার হামিদপুর গ্রামের কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, চায়ের দোকানদার ও রিকশা-ভ্যানচালক কিছু সংখ্যক নিম্নবর্গের মুসলমান প্রায় নিয়মিতভাবে বেহুলার নাচাড়ি পরিবেশন করে থাকেন। এ দু'টি ছাড়াও টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন গ্রামে আরও অসংখ্য দল প্রায় নিয়মিতভাবে বেহুলার নাচাড়ির অভিনয় করে থাকে।

৭.৫ ভাসান যাত্রা

ভাসান যাত্রা মূলত সর্পদেবী মনসার কাহিনি সংবলিত ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা। সাধারণত দোহারকেন্দ্রিক ও চরিত্রাভিনয়ের মাধ্যমে *ভাসান যাত্রা* পরিবেশিত হয়। 'কৃষ্ণযাত্রা থেকে' *ভাসান যাত্রার* উদ্ভব বলে ধারণা করা হয়। উল্লেখ্য, ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে 'কৃষ্ণলীলা'র প্রচলন ছিল। কিন্তু 'কৃষ্ণযাত্রা'র অস্তিত্ব ছিল না। তাই লীলানাট্যের ধারায় যাত্রার উদ্ভবের কালে নাট্যরীতি হিসেবে 'ভাসান যাত্রা' জন্ম লাভ করে। লীলানাট্য বা যাত্রার মতোই ভাসান দ্বি অথবা ত্রিচরিত্র বিশিষ্ট ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা। নাট্যবিশেষজ্ঞের ধারণা, ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে মনসামঙ্গল কাব্য সংক্ষিপ্ত গীতরূপে *মনসার ভাসান* নামে অভিহিত হত।[৫১]

প্রচলিত যাত্রাপালার পরিবেশনরীতি থেকে *ভাসান যাত্রার* পরিবেশনে বেশ কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। বর্ণনাত্মক গীত, সংলাপাত্মক গদ্য ও সংলাপাত্মক গীতের সমন্বয়ে *ভাসান যাত্রা* পরিবেশিত হয়ে থাকে। এ ধরনের পরিবেশনরীতির শুরুতেই থাকে সম্মিলিত বাদ্য বাদন। সম্মিলিত বাদ্য বাদনের পর দুইজন ছুকরি এসে আসরে তাদের নৃত্য-গীত পরিবেশন করেন। স্থানীয় ভাষা যাকে মজমা বলা হয়। এরপর থাকে বন্দনাগীত। এই গীতে পদ্মীদেবী ও চারদিককে বন্দনা করা হয়। বন্দনাগীত পরিবেশনে একজন গায়েনসহ দু'জন ছুকরি অংশগ্রহণ করেন। ছুকরিদ্বয় তাদের নৃত্যের মধ্যেই বন্দনাগীতের ধুয়া গেয়ে চলেন। তবে, বাদ্যযন্ত্রী দলে বসা দোহারগণই ধুয়া গীতে অধিক সক্রিয় থাকেন। বন্দনার পর শুরু হয় ভাসান যাত্রার মূল আখ্যান পরিবেশনা।

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশনের শুরুতে বর্ণনাত্মক গীতে দু'জন ছুকরি নৃত্য সহযোগে পদ্মার জন্ম থেকে পূজা লাভের আকাঙ্ক্ষায় চম্পলায় গমন পর্যন্ত আখ্যান বর্ণনা করেন। এক্ষেত্রে বর্ণনাত্মক গীতাভিনয়ের ব্যতিক্রমী প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। আসলে, বর্ণনাত্মক গীতে কাহিনি অগ্রসর হলেও বর্ণনার প্রতিটি দ্বৈত চরণের প্রথম লাইন এক একজন ছুকরি প্রথমে পদ্যে সুর ছাড়া কথার আকারে বর্ণনা করেন, তারপর বর্ণিত পদ্য-কথাকে তারা সুর সহযোগে দ্বিতীয় ও প্রথম চরণ গীত আকারে নৃত্যের আশ্রয়ে আসরে পরিবেশন করেন। লক্ষ করার বিষয়, এ ধরনের পরিবেশনে কেবল গীত বর্ণনাতে নৃত্য প্রযুক্ত হয়। উল্লেখ্য, পালা পরিবেশনের এ সময় থেকেই রেফারি কাহিনির প্রম্পট শুরু করেন এবং প্রতিটি দৃশ্যের শুরু ও শেষে বাঁশি বাজিয়ে দৃশ্যের নিয়ন্ত্রণসহ সমগ্র কাহিনি পরিচালনা করেন।

*ভাসান যাত্রা*র প্রতিটি দৃশ্যের শুরুতে থাকে বর্ণনাত্মক অভিনয়। তবে, অধিকাংশক্ষেত্রে পদ্য ও গীতের যৌথ পরিবেশনা প্রত্যক্ষ করা যায়। বর্ণনাত্মক অভিনয়ের পর পরিবেশিত হয় সংলাপাত্মক অভিনয়। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ বর্ণনাত্মক অভিনয় থেকে সংলাপাত্মক অভিনয়ের এই পরিবর্তন মুহূর্তে আঙ্গিক বা বাচিক অভিনয়ে বিশেষ কোনো প্রয়োগ লক্ষ করা যায় না। সংলাপাত্মক চরিত্রাভিনেতা বর্ণনাত্মক অভিনয়ের মধ্যে মঞ্চে প্রবেশ করে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং তার নির্দিষ্ট ক্রিয়া অনুসারে অভিনয় শুরু করেন। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় বাদ্যযন্ত্রীদের ভূমিকা সুস্পষ্ট। বাদ্যযন্ত্রী তাদের বাদ্যে জোরালো আওয়াজের মাধ্যমে সংলাপাত্মক পরিবর্তনকে সুস্পষ্ট করে তোলেন। সংলাপাত্মক গদ্য ও সংলাপাত্মক গীত বা গীত সংলাপ ভাসান যাত্রা পরিবেশনের মুখ্য বিশেষত্ব। তবে, সংলাপাত্মক অভিনয়ের মধ্যে বর্ণনাত্মক গীত অভিনয়ের মিশ্রণ লক্ষ করা যায়।

সংলাপাত্মক অভিনয়ে কুশীলবদের বাচিক অভিনয় প্রচলিত যাত্রা অনুসৃত উচ্চস্বরের প্রলম্বিত সংলাপ প্রক্ষেপণ রীতিকেই অনুসরণ করে। তবে কুশীলবদের চলন বিন্যাসে একটি সাধারণ প্রবণতা দেখা যায়, সেটি হচ্ছে, উত্তর-দক্ষিণমুখী চলন প্রবণতা। এর একটি বড় কারণ মঞ্চের দক্ষিণ সীমান্ত রেখায় একমাত্র সেট দু'টি চেয়ার এবং উত্তরে দেবী মনসার প্রতীকী ম্যাড় স্থাপন করে রাখা হয়। আর এ কারণে সংলাপাত্মক অভিনয়েই শুধু নয় বর্ণনাত্মক অভিনয়েও অভিনেতাদের উত্তর-দক্ষিণমুখী চলন লক্ষ করা যায়।

সংলাপাত্মক অভিনয়ে বাদ্যযন্ত্রীদল নানা প্রকারে আবহ সংগীত পরিবেশন করেন। এক্ষেত্রে কি-বোর্ড, ঢোল এবং ঝাঁঝ-এর প্রয়োগ বেশি পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া সংলাপের কোনো বিশেষ, জোরাল এবং উচ্চগ্রামে প্রক্ষেপিত সংলাপের ওপরেও ঝাঁঝ এর প্রয়োগ দেখা যায়। সংলাপে সুস্পষ্টভাবে দুই ধরনের প্রক্ষেপণরীতি পরিলক্ষিত হয়। চরিত্রানুগ পোশাক ও সাজ গ্রহণকারী মুখ্য অভিনেতাদের অভিনয়ে উচ্চগ্রামে সংলাপ প্রক্ষেপণের প্রবণতা লক্ষ করা গেলেও গৌণ চরিত্রের অভিনেতাগণ নৈমিত্তিক পোশাকে সাধারণ কথোপকথনের ঢঙে সংলাপ প্রক্ষেপণ করেন।[৫২]

*ভাসান যাত্রা*র পরিবেশনাতে এভাবেই বর্ণনাত্মক গীত ও চরিত্রের গীত সংলাপ; চরিত্রের গদ্য সংলাপ, গীত সংলাপ ও বর্ণনাত্মক গীত এবং কখনো কখনো চরিত্রাভিনয় কেন্দ্রিক নিরালম্ব গদ্য সংলাপাত্মক

Dhaka University Institutional Repository

অভিনয় প্রত্যক্ষ করা যায়। বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলের নাটোর জেলার কালিকাপুর, কাফুরিয়া গ্রামে *ভাসান যাত্রা*র একাধিক দল রয়েছে। এই সব দল প্রায় নিয়মিতভাবে ভাসান যাত্রা ছাড়াও *নছিমন*, *যুগীপর্ব*, *ইমাম যাত্রা* ও *ঝুমুর যাত্রা*র আসর করে থাকেন।

৭.৬ কান্দনী বিষহরির গান

বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে পদ্মাপুরাণ গানের পাশাপাশি পদ্মাপুরাণ আখ্যানেরই একটি স্বতন্ত্র পরিবেশনরীতি *কান্দনী বিষহরির গান* প্রচলিত রয়েছে। উক্ত অঞ্চলে কোথাও কোথাও এ ধরনের পরিবেশনরীতি *কান্দে না বিষহরির গান* নামেও কম-বেশি পরিচিত। উল্লেখ্য, নাম যাই হোক পর্যবেক্ষণে দেখা যায় ওই দু'টি নামের পরিবেশনরীতি মূলে এক।

ক্রন্দনরত পদ্মাদেবী বা বিষহরির কান্নাকে প্রাধান্য দিয়েই কান্দনী বিষহরির গান পরিবেশিত হয়ে থাকে। এছাড়া, বেহুলার কান্নাও এ ধরনের পরিবেশনরীতির আরেক প্রধান আশ্রয়। কান্দনী বিষহরির গানের এ রূপ নাম করণের পিছনে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর থানার চণ্ডীপুর গ্রামের গায়েনের ব্যখ্যা হচ্ছে—'পূজা লাভের জন্য বিষহরিকে (মনসা) যে নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয় সেটাই এই কাহিনির মুখ্য বিষয়, তাই এই পরিবেশনের এই ধরনের নামকরণ করা হয়েছে।' তবে, এ ধরনের পরিবেশনে বেহুলা চরিত্রের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ মনসার জন্ম এবং পূজালাভের আকাঙ্ক্ষা অতি-সংক্ষেপে পরিবেশন করে বেহুলা লক্ষ্মীন্দরের বিবাহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই মূল আখ্যান পরিবেশিত হয়। এক্ষেত্রে বেহুলার বাসর রাত, দংশন, ভাসান, জিয়ন, স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং মনসার পূজা লাভের মাধ্যমে পরিবেশনের সমাপ্তি ঘটে। কাহিনির প্রাসঙ্গিক হিসেবে মনসা ও চাঁদ সওদাগরের দ্বন্দ্ব পরিবেশিত হলেও মূলত গোটা পরিবেশনে বেহুলার ক্রন্দনরত ঘটনাই প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

গুরু পরম্পরার ভিত্তিতে প্রায় দুই শত বছর ধরে বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চলে *কান্দনী বিষহরির গান* পরিবেশিত হয়ে আসছে। কিন্তু এ ধরনের পরিবেশনরীতির উদ্ভব সম্পর্কে তেমন কোনো লিখিত প্রমাণ তথ্য পাওয়া যায় না। তবে, পরিবেশনরীতির বিশেষত্ব দৃষ্টে ধারণা করা যায়, ঝুমুর যাত্রার উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা অনুসরণে অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে *কান্দনী বিষহরির গান* প্রচলিত হয়েছে। বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন গ্রামে এ ধরনের পরিবেশনরীতি ব্যাপক আকারে বিকাশ লাভ করেছে।

*কান্দনী বিষহরির গানে*র আসরে সাত পালায় পদ্মাপুরাণ আখ্যান পরিবেশিত হয়ে থাকে। পালাগুলোর মধ্যে থাকে—মনসার জন্ম ও পূজা লাভের আকাঙ্ক্ষা পালা, বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের বিবাহ পালা, বেহুলার বাসর রাত ও দংশন পালা, ভাসান পালা, জিয়ন ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন পালা এবং মনসার পূজা প্রাপ্তি পালা। লক্ষ করার বিষয় *কান্দনী বিষহরির গানে*র আসরে মনসার বিবাহ, বনবাস, চাঁদ সওদাগর-মনসা বিবাদ ইত্যাদি অংশের অভিনয় অনুপস্থিত থাকে। আসলে অতি-সংক্ষেপে মনসার জন্ম কথার বিবরণ দিয়ে বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের বিবাহ অনুষ্ঠান থেকেই শুরু হয় এ ধরনের পরিবেশনরীতির মূল আখ্যান পরিবেশনা।

Dhaka University Institutional Repository

কান্দনী বিষহরির গানের দল পরিচালনার জন্যে একজন পরিচালক ও ম্যানেজার নিযুক্ত থাকেন। সাধারণত একজন গিদাল (মূলগায়েন) ও সহগিদাল (সহগায়েন) এ ধরনের পরিবেশনে আসর পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। এক্ষেত্রে প্রতিটি দৃশ্যের শুরুতে গিদাল ও সহগিদাল যৌথভাবে বর্ণনাত্মক অভিনয়ের মাধ্যমে এক একটি দৃশ্যের অবতারণা করেন এবং সে অনুযায়ী নতুন দৃশ্যাভিনয়ের সূচনা হয়। এক্ষেত্রে আখ্যান পরিবেশনে এই দুইজন কুশীলবকে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। আর তাদের বর্ণনাত্মক প্রস্তাবনা প্রক্রিয়া ভেতর পরিবেশিত আখ্যান পরম্পরাগত কিছু দৃশ্যে বিন্যস্ত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, গিদাল ও সহগিদাল আখ্যানের পরম্পরা ঠিক রেখে দৃশ্যের বিন্যাস সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত করে থাকেন এবং এই নিয়ন্ত্রণের কাজটি তারা তাৎক্ষণিকভাবে পরিবেশনা চলাকালীন করে থাকেন। গিদাল ও সহগিদাল ছাড়াও কখনো কখনো মুখ্য চরিত্র বেহুলার ভূমিকা গ্রহণকারী অভিনেতা আসর পরিচালনা করে থাকেন।

কান্দনীবিষহরির গান পরিবেশনের জন্যে কুশীলবগণ মঞ্চে উঠার আগে মন্দিরে গিয়ে মনসার প্রতি তাদের ভক্তি জানিয়ে আসেন। এরপর চাঁদ সওদাগর, লক্ষ্মীন্দর ও বেহুলা চরিত্র মঞ্চে এসে ক্রমানুসারে বৃত্তাকারে আবর্তন করে গীতাভিনয়ের মাধ্যমে বন্দনা পরিবেশন করেন। এক্ষেত্রে কুশীলবগণ কিছু অংশ গীতসুরে এবং কিছু অংশ সংলাপাত্মক গদ্যে বন্দনা পরিবেশন করে থাকেন। বন্দনা পরিবেশনে গিদাল চাঁদসওদাগরের ভূমিকায় মহাদেব শিবের বন্দনা করেন। বন্দনাতে যথাক্রমে শিব, কালী, বিষহরি মনসাকে স্মরণ করে গীত সুরে এবং অন্যান্য দেবদেবী, চারদিক, দর্শক, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল প্রভৃতিকে স্মরণ করে সংলাপাত্মক গদ্যে বন্দনা পরিবেশন করা হয়। বর্ণনার পর শুরু হয় কান্দনী বিষহরির গানের আখ্যান পরিবেশনা।

সাধারণত বর্ণনাত্মক গীত এবং সংলাপাত্মক গদ্য ও গীতের আশ্রয়ে কান্দনী বিষহরির গান পরিবেশিত হয়ে থাকে। এ ধরনের পরিবেশনে কোন একক কুশীলব বা গিদাল কর্তৃক বর্ণনাত্মক অংশ অভিনীত হয় না। বেহুলা, লক্ষ্মীন্দর, চাঁদ সওদাগর, সনকা, কালনাগিনী এবং মনসা প্রভৃতি মুখ্য চরিত্রের কুশীলবগণ তাদের স্ব স্ব চরিত্রে সংলাপাত্মক অভিনয়ের পাশাপাশি বর্ণনাত্মক অভিনয়েও অংশ নিয়ে থাকেন। তবে বর্ণনাত্মক অভিনয়ে গিদাল বা মূলগায়েনের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তিনি তার সহঅভিনেতা বা সহগিদালের সহায়তায় বর্ণনাত্মক উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে প্রতিটি স্বতন্ত্র দৃশ্যের পরিচিতি দর্শকদের সামনে ব্যক্ত করে থাকেন। অর্থাৎ এ ধরনের বর্ণনাত্মক অভিনয়ে গিদাল এবং সহযোগী গিদালের ভূমিকা আখ্যান প্রকাশে সূত্রধরের অনুরূপ। এক্ষেত্রে দুই কুশীলবের বর্ণনাত্মক অভিনয়ের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাদের বর্ণিত চরণের ১ম অংশ গিদাল বললে বাকি অংশ সহগিদাল বলে চরণটির পূর্ণতা দান করেন। এভাবেই উভয় কুশীলব যৌথভাবে বর্ণনাত্মক পদ্যে উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে আখ্যানের প্রতিটি স্বতন্ত্র দৃশ্যের মূলবিষয় প্রস্তাবনা আকারে দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করেন।

কান্দনী বিষহরির গান পরিবেশনে বর্ণনাত্মক গীত বা পদ্যকে আশ্রয় করেই অভিনেতাগণ সাধারণত সংলাপাত্মক অভিনয়ে প্রবেশ করেন। অন্যদিকে সংলাপাত্মক অভিনয় থেকে বর্ণনাত্মক অভিনয়ে প্রবেশের ক্ষেত্রে অভিনেতাগণ বর্ণনাত্মক গীতকে আশ্রয় করে থাকেন। এই রীতির সংলাপাত্মক অভিনয়ের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–একই দৃশ্যে একজন কুশীলব একাধিক চরিত্রে অভিনয় করেন। সামান্য কিছু পোশাক বা

Dhaka University Institutional Repository

অভিনয় উপকরণ পরিবর্তনের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যে প্রবেশ-প্রস্থানের মাধ্যমে একজন কুশীলব একাধিক চরিত্রে অভিনয় করে থাকেন। এ ধরনের পরিবেশনে সংলাপের ভাষা ব্যবহারে আরেকটি বিশেষ প্রবণতা প্রত্যক্ষ করা যায়, আর তা হচ্ছে—আখ্যানের সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন চরিত্র তাদের সংলাপে সাধারণত শুদ্ধ ও পরিশীলিত ভাষা ব্যবহার করেন। এছাড়া, তাদের সংলাপ প্রক্ষেপণেও প্রচলিত যাত্রার সংলাপ প্রক্ষেপণরীতি অনুসৃত হতে দেখা যায়। অপরদিকে আখ্যানের গৌণ চরিত্রসমূহ তাদের সংলাপে আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ করেন। এক্ষেত্রে তারা সংলাপ প্রক্ষেপণেও স্বাভাবিক কথোপকথন রীতি অনুসরণ করেন। সংলাপাত্মক অভিনয়ে সকল চরিত্রই প্রবেশ-প্রস্থানের মাধ্যমে তাদের অভিনয় উপস্থাপন করেন।

এ ধরনের পরিবেশনে কখনো কখনো ছুকরিরা নৃত্য ও ধুয়া সহযোগে বর্ণনাত্মক গীতাভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু বর্ণনাত্মক গীতাভিনয় যখন সংলাপাত্মক অভিনয়ে পরিবর্তিত হয় তখন নৃত্যরত এই কুশীলবগণ উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক কিছু সংলাপাত্মক অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে থাকেন। অধিকাংশক্ষেত্রে দ্রুতপদে সারিবদ্ধভাবে ছুকরিগণ মঞ্চে এসে দুই তিনটি আবর্তনে মঞ্চ পরিক্রমণ করেন এবং বৃত্তাকারে তাদের অবস্থান গ্রহণ করেন।

কান্দনী বিষহরির গানের আখ্যান পরিবেশনে বর্ণনাত্মক গীতের দুই ধরনের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। প্রথমত, একটি নির্দিষ্ট সুরের গীতাভিনয়ের মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ দৃশ্য বা ঘটনা পরিবেশন করা হয়। অর্থাৎ একটি একক দৃশ্য বা ঘটনার জন্য একটি নির্দিষ্ট সুরে গীতাভিনয় চলমান রেখে উক্ত গীতাভিনয়ের মধ্যেই অন্যান্য অভিনয় উপাদান প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, প্রথমটির ঠিক বিপরীত। অর্থাৎ একটি একক দৃশ্য বা ঘটনার অভিনয়ে নির্দিষ্ট কোন সুরের ধারাবাহিকতায় বর্ণনাত্মক গীতাভিনয় উপস্থাপিত হয় না। এক্ষেত্রে অন্যান্য অভিনয় উপাদানের সাথে একাধিক সুরে বর্ণনাত্মক গীতাভিনয় উপস্থাপিত হয়ে থাকে।

বর্ণনাত্মক গীতাভিনয় থেকে অন্যান্য অভিনয় উপাদানে প্রবেশের একটি সুস্পষ্ট কৌশল হচ্ছে—'তেহাই'। বাদ্যযন্ত্রীদল গীত অভ্যন্তরে দোহারদের প্রতিবারের ধুয়া শেষে সুস্পষ্টভাবে তেহাই প্রদান করে থাকেন। এ তেহাই একই সঙ্গে গীতের সমাপ্তি ও চলমানতাকে ইঙ্গিত করে। ফলে গীতাভিনয়ের কুশীলবগণ তার ইচ্ছামত তেহাই গ্রহণপূর্বক গীতাভিনয় অব্যাহত রাখতে পারেন অথবা তা পরিবর্তন করে অন্য আরেকটি অভিনয় উপাদান প্রয়োগ করতে পারেন।

বর্ণনাত্মক গীত ও গদ্য অভিনয়ে কুশীলবগণ বৃত্তাকারে মঞ্চে আবর্তনের মাধ্যমে নৃত্য পরিবেশন করে থাকেন। অবশ্য, এ সময় বর্ণনাকারী অভিনেতা উক্ত বৃত্তের বাইরে আরেকটি বৃত্ত রচনা করে বা একই বৃত্তের চলনে এই অভিনয় পরিবেশন করেন। গীতাভিনয়ের এই বৃত্তাকার চলনে দুটি পর্যায় লক্ষ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে বর্ণনাকারী অভিনেতা ও ছুকরি একই বৃত্তরেখায় সম্মিলিত কণ্ঠে গীত পরিবেশন করেন। এ সময় কোনো প্রকার নৃত্য ছাড়াই ছুকরিগণ সাধারণত টানা সুরে এবং ধীর লয়ে বর্ণনাত্মক গীত পরিবেশন করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে বর্ণনাকারী অভিনেতা বাদ্যযন্ত্রীদের তেহাই অবলম্বন করে গীতের লয় বৃদ্ধি করে দ্রুত লয়ে গীত পরিবেশন করেন। এক্ষেত্রে কখনো কখনো গীতের সুর পরিবর্তন করে নতুন সুরে দ্রুত লয়ে গীত

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশন করতে দেখা যায়। পরিবর্তিত এই দ্রুতলয়ের গীতাভিনয়ের মধ্যে গায়েনের আবর্তিত বৃত্ত থেকে ছুকরিগণ বেরিয়ে নতুন আরেকটি বৃত্তে আবর্তনের মাধ্যমে নৃত্য পরিবেশন করেন। এ সময় গায়েন ছুকরিদের আবর্তিত বৃত্তের বাইরে থেকেই বর্ণনাত্মক গীত পরিবেশন করে থাকেন। এবারে *কান্দনী বিষহরির গান* থেকে বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের বাসরঘরের পরিবেশনের কিছু অংশের উদ্ধৃতি দেওয়া যাক।

বাসরঘরে স্বামী লক্ষ্মীন্দরের জন্যে খাবার রন্ধন করে এনে বেহুলা যখন দেখে স্বামী ঘুমিয়ে গেছে তখন সে সংলাপাত্মক গীতের ভেতর দিয়ে তাকে ডাকতে থাকেন :

বেহুলা : প্রথমেতে হে...প্রভু উঠো হে। উঠে পালঙ্ক পাইয়া বসো প্রাণনাথ হে।
এই যে বহু কষ্টে রান্ধিলাম আমি ব্যঞ্জন আরও ভাত। ওরে হায়রে হায়...।
অভাগিনীর কর্মদোষে স্বামী পড়িল যে নিদ্রায়। ওরে হায়রে হায়।
(এই যে) অন্ন হইল রন্ধন প্রভু ব্যঞ্জন হইল বাসী। ওরে হায়রে হায়।
(এই যে) অন্ন যদি না খাও প্রভু খাও মোর মুণ্ড। ওরে হায়রে হায়।
অভাগিনীর কর্মদোষে প্রভু কত নিদ্রা যাও। ওরে হায়রে হায়।
(এই যে) একে তো পুষ্পের পালঙ্ক ভরা যুবতির কোল। ওরে হায়রে হায়।
অন্ন যদি না খাও প্রভু আমার হইবে অমঙ্গল। ওরে হায়রে হায়।
নিদ্রায় পড়িয়া স্বামী আজ হয়েছে বেহুশ। ওরে হায়রে হায়।

উপর্যুক্ত গীত সংলাপটির মধ্যে বর্ণনাত্মক গীতের মিশেল লক্ষ করা যায়। আর এ ধরনের বর্ণনা মিশ্রিত গীত সংলাপের ভেতর ছোট একটি গদ্য সংলাপ প্রক্ষেপণ করে আবার গীত সংলাপ শুরু করেন এবং সব শেষে আবার গদ্য সংলাপের আশ্রয় নিয়ে আখ্যানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। যেমন :

বেহুলার গদ্য সংলাপ : বলিগো প্রাণনাথ, বলিগো প্রাণনাথ।

বেহুলার গীত সংলাপ : (এই যে) কালকে যে আনিলেন প্রভু বিবাহ করিয়া। ওরে হায়রে হায়...।
কেমনে ডাকিবো আমি ওই নামও ধরিয়া। ওরে হায়রে হায়...।

বেহুলার গদ্য সংলাপ : বলিগো প্রাণনাথ, বলিগো প্রাণনাথ, আহা স্বামী একবার চৈতন্য হও।

এ পর্যায়ে বাসরঘরের দৃশ্যে চেয়ারের উপর ঘুমিয়ে যাওয়া স্বামী লক্ষ্মীন্দরকে জাগাতে না পেরে বেহুলা এবার আসরে উপস্থিত ছুকরিদেরকে ডেকে বলেন :

বেহুলা : বলি ও দিদি

সখী/ছুকরি : কিরে কি অইছে ?

বেহুলা : আমি যে স্বামীকে কিছুতেই জাগাতে পারছি না ।

ছুকরি : বলি ডাকাও হাকাও শোনে না, নাম করা তো যায় না। আস্তে জোরে ডাকো তারে, ভাত খায়ে যাও না ওরে।

Dhaka University Institutional Repository

বেহুলা : বলি ওই না দিদি, আমিতো ও ভাবে ডাকতে পারবো না ।

ছুকরি : তালি ডাকো কীভাবে ডাকো ।

বেহুলা : বলি ও দিদি আমি তাই ডাকছি।

বেহুলা চরিত্র এবার বর্ণনাত্মক গীতে বলেন :

এই যে তবে আমি সতী কন্যা এই নামও রাখিব। হায়রে প্রভু জাগো রে।
চন্দন ঘসিয়া আমি বাসনা পুরাবো। ওরে হায়রে হায়...।
এই যে চন্দন ঘষিয়া স্বামী বাসনা পুরাবো।
অগূঢ় চন্দন স্বামী সর্বাঙ্গে মাখিবো।
এই যে সর্বদা আমি ছিটাই অগূঢ় চন্দন। ওরে হায়রে হায়...।
এই যে সর্বদা ছিটাইলো বালী অগূঢ় চন্দন।
তবু তো না পাইলো বালীর মনিবের চৈতন্য। ও জাগো প্রভু...।

গদ্য সংলাপের ভেতর দিয়ে বর্ণনাত্মক অভিনয় :

'হায়রে ভগবান দয়াময়, কত চেষ্টা করেও আমি আমার স্বামীকে কিছুতেই জাগাইতে পারলাম না। এখন আমি কি করি। এই অন্ন ব্যঞ্জন সব রাখিয়া আমিও স্বামীর পদতলে একবার বিশ্রাম গ্রহণ করি।'[৫৩]

এ পর্যায়ে বর্ণনাত্মক গীত শুরু হয় এবং বর্ণনাত্মক গীতের ভেতর দিয়ে আবার নতুন দৃশ্য বা ঘটনার সূচনা হয়। এভাবেই সংলাপ, বর্ণনা, গীত ও নৃত্যের আশ্রয়েই *কান্দনী বিষহরির গান* পরিবেশিত হয়।

বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে কান্দনী বিষহরির গান ও কান্দে না বিষহরির নামে বেশ কিছু দল নিয়মিতভাবে এ ধরনের পরিবেশনা করে থাকে। যার মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ দল হচ্ছে পার্বতীপুর থানার চণ্ডীপুর ইউনিয়নের বাবুপাড়া গ্রামে শ্রীগৌড় সম্প্রদায়।

৭.৭ মনসামঙ্গলের ঢপযাত্রা

ঢপ বা ঢপকীর্তন মূলত রাধাকৃষ্ণলীলার কাহিনি নির্ভর পরিবেশনা। বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে ঢপযাত্রার আসরে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আখ্যানের পাশাপাশি অন্যান্য হিন্দু-পুরাণ রামায়ণ, মহাভারত, মনসামঙ্গলের কিছু জনপ্রিয় কাহিনি মঞ্চায়নের পাশাপাশি স্থানীয় কিছু লোকপুরাণের কাহিনিও মঞ্চস্থ হয়। তবে, তার মধ্যে বৃহত্তর সিলেট জেলার সুনামগঞ্জ অঞ্চলে মনসামঙ্গলের ঢপযাত্রা অধিক জনপ্রিয়।

সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লার থানার ডুমরা গ্রামের ঢপযাত্রার দল দেবী সোমেশ্বরী সম্প্রদায়ের ম্যানেজার ও পালা পরিচালক ঝন্টুকুমার দাস জানান, উক্ত অঞ্চলে প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে ঢপযাত্রার আসরে কৃষ্ণলীলার কাহিনি ছাড়াও রামায়ণ-মহাভারত ও মনসামঙ্গলের কাহিনি পরিবেশিত হয়ে আসছে। তাদের দল গুরু পরম্পরার ভিত্তিতে সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

মনসামঙ্গলের ঢপযাত্রা পরিবেশনে নারী চরিত্রে রূপদানকারী সকল কুশীলব হলেন পুরুষ, তাই তাদের নারী হয়ে ওঠার সাজসজ্জায় প্রয়োজনীয় সকল উপদানই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মনসামঙ্গলের ঢপযাত্রা পরিবেশনের জন্য কিছু কুশীলব অনেকটা পেশাজীবী যাত্রাশিল্পীদের মতো পোশাক গ্রহণ করে থাকেন। যেমন–চাঁদ সওদাগর চরিত্র আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে জরির কাজ করা সিল্ক কাপড়ের তৈরি বিশেষ ধরনের বস্ত্র পরিধান করেন। এছাড়া, বেহুলা চরিত্র সোনালি জরির কাজ করা লাল রঙের সিল্কের শাড়ি-ব্লাউজ এবং লক্ষ্মীন্দর চরিত্র সাদা রঙের ধুতি-পাঞ্জাবি ও কাঁধে লাল রঙের ওড়না ব্যবহার করেন। অপরাপর নারী চরিত্রের অভিনেতাগণ বিভিন্ন রঙের নকশা করা শাড়ি-ব্লাউজ এবং পুরুষ চরিত্রের অভিনেতাগণ হলুদ ও কমলা রঙের ফতুয়া বা পাঞ্জাবি ও নকশা করা শাড়িকে ধুতি হিসেবে পরিধান করেন।

ঢপযাত্রার আঙ্গিকে পরিবেশিত মনসামঙ্গলের আসর শুরু হয় একটি দেবী বন্দনা দিয়ে। দেবী বন্দনায় প্রথমে চাঁদ সওদাগর চরিত্রে রূপদানকারী অভিনেতা একা মঞ্চে এসে পূর্ব দিকে মুখ করে বসে বসেন এবং ধ্যান যোগে পাঠ করতে থাকেন :

যা দেবী সর্ব ভূতে শক্তি রূপেন সংস্তিতা
নমোস্তস্যঃ নমোস্তস্যঃ। নমোঃ নমোঃ ॥

এ ধরনের প্রার্থনামূলক দেবী বন্দনার মধ্যে এবার মঞ্চে দশভূজা দুর্গাদেবীর আবির্ভাব ঘটে। প্রায় একই সময়ে দেবীর বাহন হিসেবে একজন অভিনেতা বাঘের পোশমের মতো পাটের আঁশের এক ধরনের পোশাক পরে ও মুখে বাঘের মুখোশ লাগিয়ে মঞ্চে আসেন। এরপর একে একে অসুরসহ দুর্গাদেবীর অন্যান্য পার্ষদ লক্ষ্মী, সরস্বতী, গনেশ আসেন। এবার তারা সকলে মিলে মন্দিরে যেরূপ দুর্গার অধিষ্ঠান দেখা যায় সেরূপ দুর্গাদেবী অধিষ্ঠান দৃশ্য সৃজন করেন। এসময় একজন নারী ভক্ত এসে ধূপকাঠি জ্বেলে দেবীপূজা করেন। ভক্তের সেই দেবীপূজার মধ্যে চারদিকে বসা দর্শকদের দিকে ঘুরে ঘুরে দুর্গাদেবী তার জীবন্ত অধিষ্ঠান দেখান এবং এক সময় অধিষ্ঠান সহযোগে মঞ্চ থেকে প্রস্থান করেন।

এ পর্যায়ে নারীর বেশধারী তিনজন অভিনেতা এসে দুই হাতের নৃত্যমুদ্রা রচনা করে একটি বর্ণনাত্মকগীত পরিবেশনের মাধ্যমে আখ্যান অংশের অভিনয় শুরু করেন। এ ধরনের পরিবেশনে এই বর্ণনাকারীদেরকে জুড়ি বলা হয়ে থাকে। জুড়িগণ তাদের বর্ণনাত্মক অংশে চারদিকে ঘুরে ঘুরে নৃত্য সহযোগে গীত করেন :

জুড়ি : (গান) চাঁদের ছয়টি পুত্র মারা গেল।
মনসার বাধ রহিল।
চলে গেল ইন্দ্রেরই আলয় গো ॥
স্বর্গপতির বাক্য শুনে আনন্দিত হল মনে।
মনসা চলিন আপন গৃহে ॥

Dhaka University Institutional Repository

এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনাত্মক গীত পরিবেশনের পর জুড়িগণ প্রস্থান করেন। এবার মঞ্চে আসেন চাঁদ সওদাগর ও দেওয়ান চরিত্র। চাঁদ মঞ্চে এসে একটি বর্ণনাত্মক সংলাপের ভেতর দিয়ে তার অভিনয় শুরু করেন :

চাঁদ : দূর হ, দূর হ। আমি চাঁদ। পদ্মাবতীর বাদে ছয় পুত্র হারিয়েছি। আমার এই হেমতাল হাতে থাকতে চেংড়ি কানিকে আমি দেবী বলে সম্বোধন করব না।[৫৪]

এভাবেই বর্ণনাত্মকগীত, নৃত্য ও সংলাপাত্মক চরিত্রাভিনয়ের মাধ্যমে ঢপযাত্রার আঙ্গিকে মনসামঙ্গলের পালা পরিবেশিত হয়ে থাকে।

মনসামঙ্গলের ঢপযাত্রা বর্তমানে হিন্দুধর্মীয় উৎসব বা পূজা-পার্বণ কেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। দুর্গাপূজা পালন উপলক্ষে মনসামঙ্গলের ঢপযাত্রা বেশি পরিবেশিত হয়। বৃহত্তর সিলেট জেলার মূলত সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা ও দিরাই থানার প্রত্যন্ত কিছু গ্রামে ঢপযাত্রার বেশ কিছু দল রয়েছে।

৭.৮ রয়ানী গান

দক্ষিণবঙ্গের বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলে 'রয়ানী গান' নামে পদ্মাপুরাণের জনপ্রিয় পরিবেশনরীতি প্রচলিত রয়েছে। অন্যান্য পরিবেশনরীতিতে যেখানে সাধারণত পুরুষেরাই অভিনয় করে থাকেন এবং নারীর চরিত্রাভিনয়ের প্রয়োজন হলে যেখানে পুরুষেরাই নারী সেজে অভিনয়ে অংশ নেন সেখানে বরিশাল অঞ্চলের রয়ানী গান পরিবেশনকারী প্রধান শিল্পী-কুশীলবগণ হচ্ছেন নারী। রয়ানী গানের দলে পুরুষেরা প্রধানত বাদ্যযন্ত্রীর দায়িত্ব পালন। তবে, দু'একটি ক্ষুদ্র ও হাস্যরসাত্মক প্রক্ষিপ্ত অভিনয়ের ক্ষেত্রে বাদ্যযন্ত্রী দল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কোনো কোনো পুরুষ কুশীলবকে অভিনয়ে অংশ নিতে দেখা যায়।

রয়ানী শব্দটি 'রওয়ানা' বা যাত্রা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবার কারো কারো মতে, জাগরণ পালা হিসেবে রয়ানী শব্দটি প্রচলিত।[৫৫] আসলে, সংস্কৃত 'রজনী' থেকে 'রয়ানী' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে।[৫৬] আগে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে সাধারণত রাতের বেলা জাগরণ পালা আকারে মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ গান গাওয়া হত বলে এ ধরনের পরিবেশনরীতি স্থানীয় মানুষের কাছে 'রয়ানী গান' নামে পরিচিতি পেয়ে যায়।

রয়ানী গান পরিবেশনের শুরুতে বাদ্যযন্ত্রীগণ আসরে এসে নির্ধারিত স্থানে বাদ্যযন্ত্র রেখে ভক্তি যোগে প্রণাম করেন। তারপর তারা একটি সাধারণ স্কেলে হারমোনিয়াম, বেহালা ও খোলের মধ্যে সুর সমন্বয় করেন এবং সুর সমন্বয় শেষে স্থানীয়ভাবে জনপ্রিয় কোনো গানের সুরে সম্মিলিত যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন। সম্মিলিত বাদ্য বাদনের মধ্যে রয়ানী গান পরিবেশনের জন্যে নির্ধারিত নারী গায়েনগণ আসরে এসে যথাক্রমে মনসা দেবী, চতুর্দিক, বাদ্যযন্ত্র ও যন্ত্রীদেরকে প্রণাম করে আসনে বসে পড়েন।

এ সময় বাদ্যকরগণ আরেকটি সম্মিলিত যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন। উক্ত যন্ত্রসঙ্গীত শেষে নারী গায়েনরা উঠে দাঁড়িয়ে বন্দনাগীত শুরু করেন। বন্দনাগীতের মধ্যে মনসা-সহ বিভিন্ন দেব-দেবী, মুণি-ঋষি, শিক্ষা-গুরু, চতুর্দিক, দর্শক প্রভৃতিকে বন্দনা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর বর্ণনাত্মক গীতের মাধ্যমে রয়ানী গানের আখ্যান পরিবেশন করা হয়। এক্ষেত্রে আখ্যান পরিবেশনে দু'জন নারী গায়েন সর্বদাই পরস্পর বিপরীতমুখী অবস্থানে থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্ব-পশ্চিমমুখী উলম্ব চলনের মাধ্যমে যুগলকণ্ঠে বর্ণনাত্মক গীত পরিবেশন করে থাকেন। বর্ণনাত্মক গীত পরিবেশনে গায়েনদ্বয় তাদের উলম্ব চলনভঙ্গিমায় চারদিকে দর্শকদেরকে একযোগে আসরের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

রয়ানী গানের মুখ্য অভিনয় উপাদান হচ্ছে বর্ণনাত্মক-গীত। তবে, কিছু কিছু দৃশ্যের পরিবেশনে তাৎক্ষণিক সংলাপাত্মক অভিনয় প্রত্যক্ষ করা যায়। এ ধরনের সংলাপাত্মক চরিত্রাভিনয় সাধারণত আখ্যানে বর্ণিত কোনো ঘটনার সূত্র ধরে তাৎক্ষণিক কিছু ঘটনা সৃজনের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়।

এক্ষেত্রে সংলাপাত্মক অভিনয়ে মনসামঙ্গলের আখ্যান বহির্ভূত সমসাময়িক সামাজিক কোনো ঘটনার আধিক্য ও তার হাস্যরসাত্মক উপস্থাপন দৃষ্ট হয়। যেমন—বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের বিবাহ, ঝালু-মালুর মাছ ধরা, রতি ধাইয়ের শাক তোলা এবং গোদার ঘাট এই চারটি অংশে আখ্যান বর্ণিত ঘটনার সূত্র ধরে সম্পূর্ণ সমসাময়িক সামাজিক ঘটনার চিত্রায়ণে তাৎক্ষণিক সৃজনের মাধ্যমে সংলাপাত্মক অভিনয় পরিবেশিত হয়।

রয়ানী গানের আসরে বর্ণনাত্মক-গীত পরিবেশনে বেশ কয়েকটি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন—এক পদী বা এক চরণের বর্ণনাত্মক-গীত, পুনরাবৃত্তিমূলক বর্ণনাত্মক-গীত, পালা-অনুসার বা একান্তরমূলক বর্ণনাত্মক-গীত, সম্মিলিত বর্ণনাত্মক-গীত ইত্যাদি। এক্ষেত্রে এক পদী বা এক চরণের বর্ণনাত্মক-গীত সাধারণত একজন গায়েন কর্তৃক পরিবেশিত হয়।

এ সময়ে পয়ারের প্রতিটি একক চরণ শেষে ধুয়া গীত হয়ে থাকে। পুনরাবৃত্তিমূলক বর্ণনাত্মক-গীত পরিবেশনে একজন গায়েন পয়ারের প্রথম দুই চরণ গাওয়ার পর অন্যান্য কুশীলব পুনরায় উক্ত দুই চরণে পুনরাবৃত্তি করে থাকেন। আর এভাবেই একজন গায়েন এবং অন্য সকল কুশীলবের মাধ্যমে নৃত্য সহযোগে পুনরাবৃত্তিমূলক গীত পরিবেশিত হয়ে থাকে।

পালা-অনুসারে বা একান্তরমূলক বর্ণনাত্মক-গীত সাধারণত দুইজন গায়েন কর্তৃক পর্যায়ক্রমে বা পালা করে পরিবেশন করে থাকেন। এক্ষেত্রে একজন গায়েন প্রথমে একটি চরণ গাওয়ার পর পদটির দ্বিতীয় চরণ অন্য আরেকজন গায়েন বা সকল কুশীলব মিলে সম্মিলিতভাবে পরিবেশন করে থাকেন। এ ধরনের পরিবেশনের শুরুতেই শুধু ধুয়া পরিবেশিত হয়। গীত অভ্যন্তরে কোনো ধুয়া গীত হয় না।

আসলে, পালা করে চরণ গীত হয় বলে এই পরিবেশনের ভেতর দিয়ে আখ্যান দ্রুত পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। এছাড়া, রয়ানী গানের আখ্যান পরিবেশনে গায়েনগণ সমন্বিত কণ্ঠে এক ধরনের সম্মিলিত বর্ণনাত্মক গীত পরিবেশন করে থাকেন। এ ধরনের বর্ণনাত্মক-গীতের প্রথমে দুইজন গায়েন যুগলকণ্ঠে আখ্যান বর্ণনা করে থাকেন, আর অন্যান্য কুশীলব তাদের আসনে বসে থেকেই ধুয়া গীত করে থাকেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে সকল কুশীলব সম্মিলিত কণ্ঠে গীত পরিবেশন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

এক্ষেত্রে ধুয়া পরিবেশিত হয় না। দুইজন গায়েন দাঁড়িয়ে এবং অন্য সকলে বসা অবস্থায় থেকেই এই গীত পরিবেশন করে থাকেন। আখ্যানের যে সকল অংশ করুণ রসাত্মক, সেই সকল অংশে প্রথম পর্যায়ের সম্মিলিত কণ্ঠের গীত পরিবেশনা লক্ষ করা যায়।

দক্ষিণবঙ্গে প্রচলিত মনসামঙ্গলের বিখ্যাত কবি বিজয় গুপ্তের বাড়ি বরিশালের গৈলা গ্রামের মনসা মন্দিরের সামনে প্রতি বছর শ্রাবণ-সংক্রান্তিতে মনসা পূজা উপলক্ষ্যে অসংখ্য ভক্ত সমাগম ঘটে। সেখানে দক্ষিণবঙ্গের বহু রয়ানী গানের দল এসে এ ধরনের গানের আসর করে থাকেন। একই সময়ে বৃহত্তর বরিশাল জেলার পিরোজপুর ও ঝালকাঠি অঞ্চলের আরও অনেক গ্রামে রয়ানী গানের আসর বসে থাকে, আসর বসে বাগেরহাট জেলার বিভিন্ন বিভিন্ন গ্রামে। এছাড়া, বিভিন্ন মানতে উক্ত অঞ্চলে প্রায় সারা বছরই রয়ানী গানের আসর বসে। বাগেরহাট জেলার বিখ্যাত রয়ানী গানের দল হল—মোড়েলগঞ্জ থানার শৌলখালি গ্রামের শ্রীমীরা সম্প্রদায়। এই দলের মাস্টার হলেন মনোরঞ্জন ডাকুয়া। মূলগায়েন হলেন মীরা রানী মিস্ত্রি এবং অন্যান্য গায়েন হলেন—মায়া রানী বৈরাগী এবং উজ্জ্বলা সাহা। এই দলটি প্রায় নিয়মিতভাবে সারা বছর বিভিন্ন মানতে বায়নার ভিত্তিতে রয়ানী গান পরিবেশন করে থাকে।

উল্লেখ্য, উপরে বর্ণিত পরিবেশনরীতি ছাড়াও বরিশাল অঞ্চলে কীর্তন আঙ্গিকের আরেক ধরনের রয়ানী গান প্রচলিত রয়েছে। বরিশাল জেলার উজিরপুর থানার বাহেরঘাট গ্রামের নিমাই দেউড়ি এই দলের মালিক। বর্তমানে তার বয়স ৫২ বছর। তিনি ধর্মসূত্রে সনাতন, পেশাগতভাবে তিনি একমাত্র গানের সঙ্গেই যুক্ত। রয়ানী গানের এই দল সম্পর্কে নিমাই দেউড়ি জানান—আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দের দিকে তার এই রয়ানী গানের দলটি প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর বাবা অনন্ত দেউড়ি। দল প্রতিষ্ঠাতা গায়ক বাবার অনন্তের গুরু ছিলেন একই থানার রামের কাঠি গ্রামের ভদ্রকান্ত শিকদার। নিমাই দেউড়ি বাবার সঙ্গে রয়ানীর আসরে ঘুরতে ঘুরতে গান শিখে নেন। বাবা দেহ-রাখার পর সন্তান হিসেবে তিনি দলটির দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন।

গুরু পরম্পরায় নিমাই দেউড়ির এই দল দক্ষিণবঙ্গের জনপ্রিয় কবি বিজয়গুপ্ত রচিত 'পদ্মাপুরাণ' অবলম্বনে ২২টি পালায় রয়ানী গান পরিবেশন করে থাকে, যথা—'স্বপ্ন অধ্যায়', 'পুষ্পবাড়ি', 'মনসার জন্ম', 'মনসার বিবাহ', 'মনসার বনবাস', 'রাখালবাড়ির পূজা', 'চাঁদের বাদ', 'ছয় কুমার বধ', 'চাঁদের দুরাবস্থা', 'লক্ষ্মীন্দরের জন্ম', 'লক্ষ্মীন্দরের বিবাহ', 'দংশন', 'ভাসান', 'জিয়ন' ইত্যাদি।

৮. লোকায়ত হিন্দুদের সঙ্করজাত দেবতা ত্রিনাথ ও তার মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান

বাংলাদেশের নিম্নবর্গের মানুষের লৌকিক দেবতাদের মধ্যে ত্রিনাথ ঠাকুর অন্যতম। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব বা মহেশ্বর একত্রে ত্রিনাথ মূর্তি গ্রহণ করেন। গবেষক জানান, এই ত্রিনাথ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ত্রিগুণের সমীভূত সত্তা।[৫৭] একটি পাঁচালিতে ত্রিনাথের জন্মের অলৌকিক বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। সিদ্ধির অভাবে দুর্গা একদিন শিবকে শরীরের 'মলা' বা ময়লা খেতে দেন। শিব সেই 'মলা' দিয়ে বটিকা তৈরি করেন। আর এই বটিকা থেকে ত্রিনাথের জন্ম হয়। তাঁর তিনটি মাথা, ছয়খাতা হাত, গায়ের রঙ কালো।[৫৮] আরেক কাহিনিতে আছে:

Dhaka University Institutional Repository

ওহে হরি দীনবন্ধু অনাথ জনার বন্ধু
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি মহেশ্বর।
তিনদেব এক ওরে পূজা প্রকাশের তরে
ত্রিনাথ হইল তদন্তর ॥[৫৯]

এক্ষেত্রে পাঁচালি দুটিতে ত্রিনাথকে একই ব্যক্তিরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। নাথসম্প্রদায়ে ত্রিনাথ বলতে নাথধর্মের তিনজন শ্রেষ্ঠ সাধক গোরক্ষনাথ, মীননাথ ও জালন্ধরীপাকে বুঝায়। এক্ষেত্রে নাথসম্প্রদায়ের ধারণা থেকে ত্রিনাথ শব্দের উদ্ভব হওয়া সম্ভব। শূন্যপুরাণে ত্রিনাথের উল্লেখ আছে। চম্পক নগরে মাধাই কর্তৃক তাঁর পূজা প্রচারিত হয়। ফরিদপুর অঞ্চলে প্রচলিত ত্রিনাথের কাহিনিতে হারানো গুরু ফিরে পাবার কথা আছে। এখানে প্রকারান্তরে তাঁকে গুরুর দেবতা বলা হয়েছে। নাথসিদ্ধা গুরুর দেবতা রূপে পূজ্য।[৬০]

সবখানে ত্রিনাথকে মিশ্রগুণের দেবতা হিসেবে আবিষ্কার করা যায়। লোকবিশ্বাস আছে, ত্রিনাথের পূজা করলে সংসারে শান্তি-সুখ আসে, স্ত্রী-পুত্র-বাবা-মার মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হয়, গৃহপালিত পশুর মঙ্গল হয়।

৮.১ ত্রিনাথের গান

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব বা মহেশ্বর একত্রে ত্রিনাথ হিসেবে স্বীকৃত। আসলে, উক্ত তিনজন দেবতা মিলে ত্রিনাথ হয়েছেন। কলিযুগে পৃথিবীতে তাদের আবির্ভাবের কাহিনি নিয়েই ত্রিনাথের মেলার আখ্যান তৈরি হয়েছে।

গ্রামের অর্থনৈতিকভাবে নিম্নবর্গের হিন্দুধর্মাবলম্বীরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে ভজনার লক্ষ্যেই ত্রিনাথের মেলার আসর করে থাকেন। সাধারণত রোগমুক্তি, জীবনে উন্নতি, সন্তান কামনা, সংসারে শান্তি ইত্যাদির বাসনায় গ্রামের মানুষেরা ত্রিনাথের মেলার মানত করেন। মানত পরিশোধের লক্ষ্যে ত্রিনাথের মেলার আসরের জন্য শিল্পী-কুশীলবদেরকে বায়না করা হয়।

ত্রিনাথের মেলার আসরের জন্য প্রথমে বাড়ির ভেতরের উঠান বা বাইরের উঠান সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়। তারপর তা লেপে পাটি বিছিয়ে জলঘট, খূপ বা আগরবাতি জ্বেলে, গাঁজার কল্কি সাজনো হয়। এরপর উঠানে সাজানো অভিনয় স্থানকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে দর্শক-শ্রোতারা বসে যেতেই মূলগায়েন বাদ্যকর-দোহারদের সহযোগিতায় ত্রিনাথের আসর শুরু করেন।

উঠানে পাটি বিছিয়ে একটি টুলের উপর ত্রিনাথের ছবি নিয়ে ত্রিনাথের মেলা পরিবেশন করা হয়। আসর শুরু আগে এক থেকে তিনটি রক্তজবা ফুল দিয়ে ত্রিনাথের ছবিতে ভক্তি নিবেদন করা হয়। এরপর মূলগায়েন ও বাদ্যযন্ত্রী-দোহারগণ খোল, জুড়ি ও হারমোনিয়ামের সম্মিলিত বাদ্যবাদন করে নেন।

এ ধরনের আসরে ত্রিনাথের মেলা পরিবেশনে মূলগায়েন সাধারণত আয়তকার পাটির উপর দাঁড়িয়ে বর্ণনাত্মকরীতিতে আখ্যান উপস্থাপন করেন। তারপর পর্যায়ক্রমে তিনি ত্রিনাথের মেলার তিনটি গান পরিবেশন করেন। প্রথমে থাকে বন্দনা। এতে আসরে ত্রিনাথ ঠাকুরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়–'আমার এ আসরে ত্রিনাথ। ওরে দয়াল ত্রিনাথ এসোরে এসো। ত্রিনাথ এসে করো খেলা ...॥' এবারে দ্বিতীয় গান। এটি ত্রিনাথের মেলার কৃত্য-বর্ণনামূলক সঙ্গীত। কীভাবে ত্রিনাথ ঠাকুরের পূজা করতে হয় তার বিবরণ ভক্তেরা

Dhaka University Institutional Repository

এই গানের মধ্যে পেয়ে থাকেন এবং এই গানের কথা অনুসারেরই ভক্তগণ ত্রিনাথের মেলা করে থাকেন—'ও তিন পয়সাতে হয় যার মেলা কলিতে ত্রিনাথের মেলা পাগলের খেলা...॥' ত্রিনাথের মেলার সর্বশেষ গানটি ত্রিনাথের মেলার ভক্তদের জন্যে উপদেশ মূলক—'সারা দিন গেলে ত্রিনাথের নাম লইওরে মন আমার... ।'[৬১]

ফরিদপুর জেলার কাফুরা গ্রামের শম্ভুনাথ মালো ত্রিনাথের মেলা পরিবেশন করে থাকেন। তার সঙ্গে দোহারকি করেন নিমাইচন্দ্র পাল ও বাসুদেব বৈরাগী, খোল বাজান সুবলচন্দ্র মালো, জুড়ি বাজান দুলালচন্দ্র মালো, আর আড়বাঁশিতে থাকেন সুবোল মণ্ডল। এছাড়া, গোপালগঞ্জ জেলায় কোটালীপাড়া থানার সুয়াগ্রামে ত্রিনাথের যাত্রার প্রচলন রয়েছে।

৯. ইসলামের ইতিহাসের মর্মান্তিক কারবালাযুদ্ধ ও তার বেদনা প্রকাশক আখ্যান

ঐতিহাসিক কারবালা প্রান্তরে ইসলামের সর্বশেষ নবী হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর প্রিয় দৌহিত্র ইমাম হাসান-হোসেনের শহীদ হবার মর্মান্তিক ঘটনা নিয়েই সাধারণত ইসলামের ইতিহাস নির্ভর আখ্যান পরিবেশন করা হয়। এ ধরনের আখ্যানে হজরত মুহম্মদ (সঃ) এবং তাঁর প্রিয় কন্যা ফাতেমা, জামাতা হজরত আলী ও প্রিয় দৌহিত্র ইমাম হাসান-হোসেন প্রসঙ্গে সমকালীন ইতিহাসের অপরাপর চরিত্রের কথাও গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণিত এবং অভিনীত হয়।

ইসলামের ইতিহাস নির্ভর আখ্যান উপস্থাপনের মধ্যে জনপ্রিয় ও হৃদয়গ্রাহী ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা হিসেবে ইমামযাত্রা ও জারিগান উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জারিগান ও ইমামযাত্রার বহু ধরনের পরিবেশনা-রীতি প্রত্যক্ষ করা যায়।

৯.১ ইমাম যাত্রা

কারবালার মর্মান্তিক কাহিনি অবলম্বনে ইমামযাত্রা পরিবেশিত হয়ে থাকলেও এর আখ্যানবস্তুতে ইমাম হাসান-হোসেন, মাবিয়া-এজিদ প্রভৃতি চরিত্রের পারিবারিক ও সাংসারিক জীবন এ ধরনের পরিবেশনরীতিতে বেশ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। স্থানীয় নাট্যকার-পালাকারগণ সাধারণত মীর মশাররফ হোসেন রচিত *বিষাদ-সিন্ধু* অবলম্বনে ইমামযাত্রার সংলাপাত্মক নাটলিপি বা পাণ্ডুলিপি রচনা করে থাকেন।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবেশিত ইমাম যাত্রার আসরে সাধারণত উপর্যুক্ত আখ্যানটিই নানাভাবে মঞ্চস্থ হয়ে থাকে বলে জানা যায়।

৯.২ জারিগান

জারিগানের মাধ্যমেই সাধারণ মানুষের মধ্যে কারবালার শোকাবহ কাহিনি বিস্তৃতি লাভ করেছে। কারবালার আখ্যাননির্ভর জারিপালার মধ্যে 'জয়নাল আবেদীনের পত্র', 'সখীনার কান্না', 'কাশেম শহীদ' অত্যন্ত জনপ্রিয়। এর মধ্যে 'জয়নাল আবেদীনের পত্র' পালার কাহিনি থেকে জানা যায়—এজিদের সঙ্গে যুদ্ধে ইমাম হোসেনের পুত্র জয়নাল আবদীন পরাজিত হয়ে জেলখানায় বন্দি আছে। আর এজিদ বন্দি জয়নালের কাছে

Dhaka University Institutional Repository

মারোয়ানকে দিয়ে প্রস্তাব পাঠায়–ইমাম হোসেন পুত্র জয়নাল আবেদীন যদি মসজিদে গিয়ে এজিদের নামে খুতবা পড়ে তাহলে সে জয়নালকে ছেড়ে দেবে। এই প্রস্তাবে জয়নাল কেঁদে বলে–আমার আজ এমন কেউ নাই যার মনের কষ্টের কথা বলতে পারি। যে এজিদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে আমার বাবা-চাচা সবাই শহীদ হয়েছে–আমার মৃত্যু হলেও আমি সে এজিদের নামে খুতবা পড়তে পারবো না। কিন্তু এজিদ তাকে জোর করে তার নামে খুদবা পড়তে জয়নালকে মসজিদে পাঠায়। জয়নাল খুতবা পড়তে গিয়ে সাহসের সঙ্গে কোরআন হাতে নিয়ে নবীজী, দাদা আলী এবং বাবা হোসেনের নামে খুতবা পড়ে। ফল হয় খুব ভয়াবহ কাফেররা সবাই জয়নালকে ঘিরে ফেললো। জয়নাল তা দেখে ভয় পেলো ঠিকই, তবু ভেঙে পড়লো না বরং একটা পত্র লিখে চাচা মুহম্মদ হানিফার কাছে গুপ্তচরের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিলো। হানিফা সেই পত্রের ভিত্তিতে জয়নালকে রক্ষা করতে ছুটে আসে।

কারবালার এমন আরও অনেক ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারায় এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জারি গান, জারি নাচ ও শোভাযাত্রামূলক জারি পরিবেশন করতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে কারবালার ইতিহাসের ছোট ছোট ঘটনাকে অবলম্বন করে ছোট ছোট পর্বে বা পালায় জারি গান পরিবেশিত হয়ে থাকে। তার মধ্যে ইমাম হাসান-হোসেনের জারি অধিক জনপ্রিয় হলেও মা ফাতেমার জারি, কাসেম-সখিনার জারি ইত্যাদি পালাসমূহও কম জনপ্রিয় নয়।

৯.৩ জারিগান ও জারিনৃত্য

প্রতি বছর মহররমের সময় মানিকগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, রাজবাড়ী, পাবনা ইত্যাদি জেলার বিভিন্ন গ্রামে শোভাযাত্রামূলক জারি গান পরিবেশিত হয়ে থাকে। এতে দলবদ্ধভাবে একদল দোহার-খেলোয়াড় ঢোল, নাকাড়া, করতাল ইত্যাদি সহযোগে মহররমের চাঁদ দেখা দেবার পর বিভিন্ন গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন এবং স্থানে স্থানে থেমে নৃত্য-গীতের মাধ্যমে আহাজারিমূলক জারি পরিবেশন করে পুনরায় সামনে এগিয়ে যেতে থাকেন। এ ধরনের জারি নৃত্য-গীতের শোভাযাত্রার সঙ্গে শিয়াদের তাজিয়া মিছিলের সাদৃশ্য আছে। এর সঙ্গে কোথাও কোথাও ঘোড়া নাচ যুক্ত হতে দেখা যায়। আবার কোথাও কোথাও তরবারি যুদ্ধ দেখা যায়। এভাবে বিভিন্ন গ্রাম প্রদক্ষিণের পর মহররমের দশম চাঁদে দলটি নির্ধারিত স্থানে ফিরে এসে চূড়ান্তভাবে নৃত্যগীত প্রদর্শনের মাধ্যমে এক বছরের শোভাযাত্রামূলক জারি সমাপ্ত করে থাকে।

১০. লোকায়ত মুসলমান পির ও তাদের কাল্পনিক জীবনীর মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান

বাংলাদেশে ইসলাম একটি বহিরাগত ধর্ম। এখানে এই ধর্মমত কখনো স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং এদেশীয় বিশ্বাস, সংস্কার ও আচারই এই বহিরাগত ধর্মমতের প্রলেপে বিকাশ ও বিস্তার লাভ করেছে এবং একই সঙ্গে যুগ যুগের অনুশীলনে ও বহু মননের পরিচর্যায় সূক্ষ্ম ও সুমার্জিত হয়ে আমাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধতর ঔজ্জ্বল্যের অধিকারী হয়েছে। শরিয়তি ইসলাম যেখানে গান-বাদ্যকে অধর্মের চোখে দেখে সেখানে এই দেশে সাধারণ মানুষের মাঝে ইসলামের বিস্তারই হয়েছে গান-বাদ্যের আশ্রয়ে আল্লা-রাসুলের বন্দনায়। এই লৌকিক ইসলামের একটি প্রধানতম ধর্মবিশ্বাস হচ্ছে পিরবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

পিরবাদের প্রভাব বাংলার মুসলমানদের মধ্যে বিস্তৃত, সম্মানিত ও আদৃত হয়ে পড়ায় তা এদেশের হিন্দুদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়ে পড়েছে। অসংখ্য হিন্দুকে পিরের আস্তানায় সালাম ঠুকতে ও পিরের নামে মানসিক (মানত) করতে দেখা যায়।

বাংলাদেশে ষোড়শ শতকের দিকে লোকায়ত মুসলিম বীর, আধ্যাত্মিক সাধক, মহানবী ও তাঁর পরিবারবর্গের জীবনকাহিনি অবলম্বনে এক ধরনের পুঁথি রচনা এবং তার পরিবেশনা শুরু হয়। ধারণা করা হয়, এ ধরনের পুঁথি রচনা-পরিবেশনা অনেকটা মঙ্গলকাব্যের প্রেরণাজাত। মঙ্গলকাব্যসমূহের আখ্যান-পরিবেশনা যেখানে ছিল অনার্য হিন্দু দেবদেবীর জীবননির্ভর সেখানে মুসলিম কবিদের রচিত পুঁথি-পরিবেশনা হয়ে উঠল কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার উপর। কারবালা-বিষয়ক পুঁথি সাধারণভাবে 'জঙ্গনামা' নামে পরিচিতি লাভ করে। যার আদি রচয়িতা মুহম্মদ খান ও উজির বাহরাম খান। ষোড়শ শতকের পূর্ব থেকেই এই পুঁথিগুলি মৌখিকভাবে অস্তিত্বশীল ছিল এবং তা বৈঠকী-রীতিতে পরিবেশিত হত।

অষ্টাদশ শতকে বৈঠকীরীতির পরিবেশনা জনপ্রিয়তা লাভ করলে এদেশের পুঁথিসাহিত্য এই ধারার অনুষ্ঠান কাঠামোকে আত্মীকৃত করে নেয়। ফলে পির মাহাত্ম্য-প্রকাশক একটি স্বতন্ত্র নাট্যধারা 'গাজীর গান', 'মাদার পিরের গান', 'মানিক পিরের গান', 'একদিল পির' ইত্যাদি জন্ম নেয়, যা অদ্যাবধি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায় নিয়মিতভাবে পরিবেশিত হয়ে থাকে। এই পির মাহাত্ম্য বিষয়ক আখ্যানের মধ্যে গাজীর অধিক জনপ্রিয়, অধিক প্রচারিত। এ পর্যায়ের বিভিন্ন পির মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যানের কাহিনি-সংক্ষেপ প্রদান করা হল।

১০.১ গাজী পির ও গাজীর গান

বাংলাদেশের মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে যে সকল পরম পূজ্য হিসেবে সপ্তদশ শতক থেকে প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে তাদের মধ্যে গাজী পির উল্লেখযোগ্য। এই পির কখনো গাজী জিন্দাপীর, কখনো বড় খাঁ বা গাজী সাহেব হিসেবে বিভিন্ন স্থানে পরিচিতি পেয়েছে। তবে, বাঘের দেবতা হিসেবে এই গাজী পির হিন্দু-মুসলমান সকল ধর্মের লোকের কাছেই সমানভাবে পূজ্য। আর গাজী পিরের আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হচ্ছে—তার নামের পাশাপাশি একই সঙ্গে কালু এবং চম্পাবতীর নামটি জড়িত রয়েছে। বাংলার অন্য কোনো পিরের দোসর হিসেবে দু'একজন পুরুষের নাম যুক্ত থাকলেও কোনো নারী চরিত্রের নাম তেমনভাবে যুক্ত থাকতে দেখা যায় না। গাজী পিরের আখ্যানটি সে দিক দিয়ে ব্যতিক্রম।

এদেশের ঢাকা, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, সিলেট, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ইত্যাদি অঞ্চলে গাজীর গানের অসংখ্য দলের অস্তিত্ব রয়েছে। অনেকের ধারণা, গাজী পিরের আখ্যান বিশেষত এদেশের সুন্দরবন সংলগ্ন সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলেই বেশি প্রচলিত। কিন্তু মাঠ সমীক্ষণে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের বৃহত্তর সিলেট জেলাতেও এই পিরের আখ্যান পরিবেশনের সন্ধান পাওয়া গেছে।

গাজীর গানের আখ্যানে জানা যায়—বৈরাট নগরের রাজা সেকেন্দার যুদ্ধে বলিরাজকে হারিয়ে কন্যা অজুপাকে বিয়ে করেন। তাঁদের ঘরে জন্ম নেয় সন্তান জুলহাস। জুলহাস চলে যায় পাতালপুরে। অজুপা

Dhaka University Institutional Repository

আর এক পুত্রের জন্য আল্লার দরবারে কাঁদতে থাকেন এবং আল্লাহ কবুল করেন। জন্ম হয় গাজীর। গাজীর রূপ দেখে প্রথম পুত্রের শোক ভুলে যান। গাজীর বয়স দশ বছর হলে পিতা সেকেন্দার তাঁকে রাজ্যভার নিতে বলেন। কিন্তু গাজী অস্বীকার হলে ক্রুদ্ধ পিতা গাজীকে হত্যার জন্য নির্দেশ দেয়। গাজী শরণাপন্ন হয় কোরআন শিক্ষাগুরুর কাছে। অতি অলৌকিক ক্ষমতার বলে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের পরও গাজীর সামান্য ক্ষতি হয় না। রাজা অবশেষে স্ব-স্বাক্ষরিত 'সুই' দরিয়ার পানিতে ফেলে দিয়ে গাজীকে সেই 'সুই' খুঁজে রাখার নির্দেশ দেয়। গাজী খোয়াজ খিজিরের সাহায্যে তাও এনে দেন। গাজী এক রাত্রে গোপনে মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে ভাই কালুসহ ফকির হয়ে যায়।

নানা দেশ দেশান্তরে ঘুরে গাজী কালু সুন্দর বনে এসে উপস্থিত হন। এখানে সুন্দর বনের বাঘ গাজীর মুরিদ হয়ে যায়। তারপর গাজী ও কালু 'আশা' ভর করে নদী পার হয়ে আসে শ্রীরামপুরে। ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত দুই ভাই অন্ন লাভের আশায় শ্রীরাম রাজার দরবারে উপস্থিত হলেন। রাজা মুসলমানের হাক শুনে তাদেরকে রাজ্য থেকে বের করে দেন। কালুর অলৌকিক ইচ্ছা শক্তিতে রাজপুরীতে আগুন লাগে। দিশেহারা শ্রীরাম রাজা গত্যান্তর না পেয়ে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যান।

ভক্তগণের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাজী কালু চলে আসেন সাত কাঠুরিয়ার বনে। গরিব কাঠুরিয়াদের দুর্দশা মুক্ত করার জন্য গাজী কালু গঙ্গীর কাছে স্বর্ণের আবেদন জানায়। স্বর্ণ পেলে শাহ্ পরী ও বায়ান্ন হাজার পরীকে দিয়ে বনের মধ্যে বন কেটে সহস্র দালান ও একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং নাম রাখেন সোনাপুর। পরীরা চলে যায়। দুই ভাই পুরীটা ঘুরে ঘুরে এর নাম রাখেন সোনাপুর শহর।

এই সোনাপুর শহরে মসজিদে দুই ভাই পালঙ্কে ঘুমাচ্ছিলেন। 'কুকাফ' থেকে ছয় পরী ঘুরতে আসে সোনাপুর শহরে। গাজীর রূপ দেখে তারা মোহিত। পরীগণ বহু বাগ-বির্তকের পর গাজীর জন্য যোগ্য নারী হিসেবে মনোনীত করল ব্রাহ্মণ্য নগরের মুকুট রাজার কন্যা চম্পাবতীকে। কথাতো কাজ, পরীরা গাজীর পালঙ্ক নিয়ে উড়াল দিল ব্রাহ্মণ্যনগরে। চম্পাবতীর পাশে গাজীকে ঘুমিয়ে রাখল। ঘুমের ঘোরে গাজীর হাত পড়ে চম্পাবতীর বুকে। চম্পাবতীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। প্রথম দর্শনেই গাজীর রূপ দেখে চম্পাবতী বিমোহিত হয়ে যায়। পরিচয় হয় তাদের দুজনের। চম্পাবতী, ভাগ্য শুনে দেখে গাজীই তার স্বামী। মুখের পান বদল ও হাতের আংটি বদল করে তাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। দুজনে আবার নিদ্রায় গেলে পরীরা গাজীকে নিয়ে সোনাপুর চলে আসে। ঘুম ভেঙ্গে গেলে গাজী চম্পার জন্য পাগল হয়ে যায়। কালুকে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে পাঠায়। কালু বন্দি হয় মুকুট রাজার হাতে। গাজী জানতে পেয়ে বনের বাঘ নিয়ে যুদ্ধে নেমে যায় দক্ষিণ রায়ের সাথে।

শুরু হয় পির আর দেবতার লড়াই। বাঘ ও কুমিরের লড়াইয়ে মুকুট রাজের শক্তির কাছে গাজী প্রায় সর্বশান্ত হয়ে যায়। গাজী গো-মাংস দিয়ে মুকুট রাজার 'মৃত্যুজীব কূপ' ধ্বংস করে। আর 'আশা' ও 'খড়ম' দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে গাজী মুকুট রাজাকে পরাজিত করে। পরাজিত রাজা ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে এবং

Dhaka University Institutional Repository

গাজী চম্পাবতীর বিয়ে দেয়। রাজপুরীতে কিছুদিন অতিবাহিত করার পর গাজী, কালু ও চম্পাবতী পাতালপুরে জুলহাসকে নিয়ে রৈবাট নগরে চলে আসে পিতা মাতার কাছে। তাদের সুখের মিলন হয়।

গাজীর গানের এই মূলপালার পাশাপাশি গাজীর পির-মাহাত্ম্য-প্রকাশক আরো সাতটি পালা যথা—১. বিয়ের পালা, ২. দিদার বাদশার পালা, ৩. ধর্ম বাদশার পালা, ৪. এরং বাদশার পালা, ৫. তাজুল মুলুকের পালা, ৬. তারা ডাকাইতের পালা ও ৭. জামাল বাদশার পালা অভিনীত হয়ে থাকে। এর মধ্যে বিয়ের পালাতে সাধারণত গাজী পিরের মূলকাহিনি বর্ণিত হয়। যার কাহিনি-সংক্ষেপ উপরে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১০.১:২ গাজীর পালা

টাঙ্গাইল অঞ্চলে *গাজীর পালা* নামে দোহার-বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গাজীর গানের এক ধরনের একক অভিনয় প্রচলিত। এ ধরনের পরিবেশনে সাধারণত চারটি পালা পরিবেশিত হয়, যথা—১. জামাল-কামালের পালা, ২. তাজের মল্লুকের পালা, ৩. হাবিল-কাবিলের পালা এবং ৪. ইমাম হাসান-ইমাম হোসেনের পালা।

গাজীর পালা পরিবেশনের শুরুতে মূলগায়েনকে গাজীর আশা ও চামর হাতে আসরে আসতে দেখা যায়। তার পিছে পিছে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে দোহার-বাদ্যকরগণ এসে আসরে বিছানো পাটি বা কাঁথার উপর বসে যান। আর মূলগায়েন তার সঙ্গে আনা 'আশা'কে মঞ্চের সম্মুখভাগের মাটিতে পুঁতে দাঁড় করিয়ে দেন। মূলগায়েন কর্তৃক আশা পুঁতে ভক্তি প্রদর্শন করা হতেই আসরে বসা বাদ্যযন্ত্রী ও দোহারগণ সম্মিলিত বাদ্য-বাদন শুরু করেন।

বাদ্যযন্ত্রী-দোহারদের সম্মিলিত বাদ্য বাদন এক সময় মূলগায়েনের হাতের ইশারায় থেমে যায়। সাথে সাথে আসরে দাঁড়িয়ে মূলগায়েন ভক্তিভাবে দর্শক-শ্রোতাদের মত নিয়ে পালার সূচনা করেন।

গাজীর পালা পরিবেশনের শুরুতেই থাকে বন্দনাগীত ও গাজীর স্মরণগান। এরপর থাকে আখ্যানের বর্ণনাত্মক অভিনয়। সাধারণত মূলগায়েন এককভাবেই চামর হাতে উত্তরীয় কাঁধে এ ধরনের পালায় অভিনয় করেন। তবে, তার বর্ণনাত্মক অভিনয়ে অধিকাংশক্ষেত্রে গীতি ও নৃত্য প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। মূলগায়েনের অভিনয় বা গীতি-নৃত্য পরিবেশনের সময় বাদ্যযন্ত্রী-দোহারগণ বিভিন্ন ধরনের ধুয়া টেনে টেনে মূলগায়েনকে সহায়তা প্রদান করেন। লক্ষ করা যায়—গাজীর এই পালাভিনয়ের সময়ে এক একটি গানে দোহারদের ধুয়া শেষ হতেই মূলগায়েন বর্ণনায় প্রবেশ করেন এবং সে বর্ণনার পর আবার নতুন আরেকটি ধুয়ার সূচনা করেন। যেমন, গাজীকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার মুহূর্তে ধুয়াগীত করা হয়—'আরে দয়াল গুরু মোরে নিস্তার করো রে। অসহায়ে পড়িয়া ডাকি তোরে ॥' এই ধুয়াটি শেষ হতেই মূলগায়েন আখ্যান বর্ণনায় বলেন—"অগ্নিতেও যখন গাজীকে পুড়তে পারলো না তখন বাদশা হুকুম দিয়েছেন যে—'আমার গাজীকে দশ মনা লোহার ঢিলার সাথে হস্ত-পদ বন্ধন করে তোমরা অগাধ দরিয়ার ভেতর ছেড়ে দাও।'

যখন অগাধ দরিয়ার মধ্যে হস্ত-পদ বন্ধন করে লোহার ঢিলাসহ যখন দরিয়ার মধ্যে ছেড়ে দিয়েছে দরিয়ার মধ্য পড়ে গাজী আবার পিরকে কেমন করে স্মরণ করতেছে।" এ পর্যায়ে মূলগায়েন আবার নতুন

Dhaka University Institutional Repository

ধুয়ার সূচনা করেন এবং তা দোহারদের কণ্ঠে বারবার গীত হতে থাকে—'আরে গুরুর নাম লইয়া বাঁচিয়া ছিলাম রে দরিয়ার মাঝারে ॥' এ ধরনের ধুয়াগীতির মধ্যেই মূলগায়েন বর্ণনাত্মক গীতে আখ্যান ও চরিত্রের আবেগ, ভাব, রস, আনন্দ, যন্ত্রণা ইত্যাদিকে প্রকাশ করে কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন।

এ ধরনের নাট্য পরিবেশনে ব্যবহৃত গানের সুর ও তালে তেমনি বৈচিত্র্য লক্ষ করা না গেলেও ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করা সম্ভব। সুরে পুঁথির ঢঙ প্রত্যক্ষ করা গেলেও তা পুঁথি পাঠের থেকে মাধুর্যময় আর সে সুরে গান পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য আরোপ করায় অপূর্ব দ্যুতিময় দৃশ্য সম্ভব হয়। অনেক সময় যাত্রাপথের গতিকে দৃশ্যে রূপ দিতে মূলগায়েন নৃত্যকেই অবলম্বন করে থাকেন। যেমন, মূলগায়েন গাজী চরিত্রের নদী পথে অলৌকিক নৌকা পারের বর্ণনাত্মক গানের মধ্যে ধুতির খোলা কোণাটি উঁচু করে ধরে বৃত্তাকারে ঘূর্ণন-নৃত্য করতেই ধুতি ফুলে-ফেপে আখ্যানে বর্ণিত অলৌকিক নৌকার প্রতিরূপ হয়ে ওঠে।

গাজীর পালা পরিবেশনের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ পালার প্রধান চরিত্র গাজীর বিভিন্ন যাত্রাপথের বৈচিত্র্য ও গতি আরোপের জন্য মূলগায়েনকে তার নাচের মধ্যে বৃত্তাকারে ঘূর্ণন করেন। শুধু তা-ই নয়, সেই নৃত্য-গীতের পর পর মূলগায়েন প্রতি বার নতুন নতুনভাবে পালার কাহিনি বর্ণনা করেন এবং সেই বর্ণনার ভেতরেই এক সময় কোনো একটি প্রশ্ন উত্থাপন করে নতুন আরেকটি গান ও নাচের সূচনা করেন। এ সময় মূলগায়েনের গান ও নাচের সঙ্গে বাদ্যকর-দোহারগণকে সম্মিলিতভাবে বাদ্য ও কণ্ঠের সমন্বয় ঘটাতে দেখা যায়।

গাজীর পালার একটি অংশের উদ্ধৃতির ভেতর দিয়ে উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যেতে পারে :

এমন সময় রাজা এক পণ্ডিতকে ডাক দিয়ে বলছেন—'পণ্ডিত তুমি গুণা-বাছা করে দেখো আমার পুরীর মধ্যে কেনো আগুন লাগল? আর আমার রানী কোথায় গেল?' পণ্ডিত বলছে :

শুনো রাজা বলি যে তোমারে। মুসলমান দুই ফকির এসেছে তোমারে দুয়ারে।
গর্দান ধরে দিছো বাহিরও করিয়ে। এই কাজ করিয়াছে সেই মহাজনে।
অমোঘ কাননে আছে ভাই দুইজন। রক্ষা যদি চাও হে রাজা কর হে গমন।
গলে বসন দিয়া রাজা দৌড়াইয়া যায়। কালু-গাজী যে স্থানে সেখানে পৌঁছায়।
হস্ত ভরে ধরছে গাজীরও চরণ।

গাজী বলছে : ওরে ব্যাটা বল বিবরণ।

কালু বলছে : আগুনে জ্বলে পুরী হয়ে গেছে ছাই। কোথায় গেছে রাজা-রানী খুঁজিয়া না পাই।

গাজী বলছে : আমি যে একটু ঘুম এসেছিলাম—আমার মিয়া ভাই তো জাগানা ছিল। আমার মিয়া ভাই রাগের মাথায় কোন কাজ করে থাকতে পারে। আইচ্ছা তুমি আমার মিয়া ভাইর চরণ ধরে দেখো তো সে কি বলে।' আরে হস্ত বাড়াই ধরছে সে কালুরও চরণ।

Dhaka University Institutional Repository

কালু বলছে : ওরে ব্যাটা বল বিবরণ।

গাজী বলছে : আগুনে জ্বলিয়া পুরী হয়ে গেছে ছাই। কোথায় গেছে রাজ-রানী খুঁজিয়া না পাই।

কালু বলছে : ব্যাটা আগে তুই হ'রেই মুসলমান। শেষেতে বলিয়া দিবো রানীরও সন্ধান।শুনিয়া শ্রীরাম রাজা স্বীকারও করিল।"

মূলগায়েন যখন পয়ার ছন্দে সুর করে টেনে টেনে সংলাপাত্মক এ বর্ণনাটি দিয়ে চলছেন তখন বাদ্যকর-দোহারেরা ছিলেন নীরব। তবে মূলগায়েনের বর্ণনা এ পর্যন্ত আসতেই দোহারগণ সুরের মাঝখানে হঠাৎ তাল বেঁধে দিয়ে সম্মিলিত কণ্ঠের সুর-তালে বেশ নাটকীয়ভাবে গেয়ে ওঠেন :

তবে তো কলেমা গাজী পড়াইয়া দিল। হারে ও ও ও ও।[৬২]

এখানে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে যে, একই সঙ্গে এক একটি নৃত্য-গীতের পর পর মূলগায়েন নতুন নতুন ঘটনার বর্ণনা করেন এবং সেই বর্ণনার ভেতরেই এক সময় নতুন একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় আর নতুন একটি গীতি-নৃত্যে আখ্যান সামনে এগিয়ে যেতে থাকে। সকল ক্ষেত্রেই মূলগায়েনের গীতি-নৃত্যের সঙ্গে বাদ্যকর-দোহারগণকে সম্মিলিতভাবে বাদ্য ও কণ্ঠের সমন্বয় ঘটাতে দেখা যায়।

টাঙ্গাইল অঞ্চলে গুরু পরম্পরার ভিত্তিতে *গাজীর পালা* পরিবেশিত হয়ে আসছে। বর্তমানে উক্ত জেলার মির্জাপুর থানার মীরদেওহাটা গ্রামের লিয়াকত সরকার *গাজীর পালার* সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গায়ক। এ ধরনের পরিবেশনে তার গুরু হচ্ছেন–কবি শের আলী সরকার এবং মুনসুর আলী।

১০.১:৩ গাজীর যাত্রা

উঠান যাত্রার আঙ্গিকে লোকায়ত মুসলমান পির গাজীর কৃত্যাচারমূলক পরিবেশনের মিশ্রণে মানিকগঞ্জ অঞ্চলে *গাজীর যাত্রা* পরিবেশিত হয়। সাধারণত বাড়ির ভেতরে উঠানে চারটি খেঁজুর পাটি বিছিয়ে গাজীর যাত্রার জন্য অভিনয় স্থান বা মঞ্চ নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে অভিনয় স্থানের চারদিকে একটু ফাঁকা রেখে দর্শকদের বসার জন্য আরও কয়েকটি পাটি বিছিয়ে দেওয়া হয়।

অধিকাংশক্ষেত্রে এই যাত্রার শিল্পী-কুশীলবগণ চরিত্রানুগ সাজ ও পোশাক গ্রহণ করেন। গাজীর যাত্রাতে নারী চরিত্রের অভিনয়ে পুরুষ অভিনেতাগণ সাধারণত নারী সেজে অভিনয় করে থাকেন। মূলত সংলাপাত্মক চরিত্রাভিনয়ের মাধ্যমেই *গাজীর যাত্রা* পরিবেশিত হয়ে থাকে। এ ধরনের পরিবেশনের মূল প্রবণতা সংলাপাত্মক হলেও তার সঙ্গে অধিকাংশ সময় বর্ণনাত্মক গীত ও নৃত্যাভিনয় প্রযুক্ত হয়।

গাজীর যাত্রা পরিবেশনের শুরুতে থাকে বন্দনাগীত। সাধারণত অভিনয় স্থানে দাঁড়িয়ে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে পালার সকল কুশীলব বন্দনাগীত পরিবেশন করে থাকেন। বন্দনার পর সম্মিলিত বাদন করা হয়।

মূলপালার অভিনয়ের প্রথম দৃশ্যেই বলি রাজ ও তার মন্ত্রীর আগমন ঘটে। এক্ষেত্রে আগে থেকেই বলি রাজের বসার জন্য অভিনয় স্থানে একটি কাঠের চেয়ার পেতে রাখা হয়। বলি রাজ এসে কখনো সে চেয়ারে

Dhaka University Institutional Repository

বসে এবং কখনো দাঁড়িয়ে তার মন্ত্রীর সঙ্গে সংলাপাত্মক অভিনয় উপস্থাপন করেন। দ্বিতীয় দৃশ্যে সিকান্দার বাদশার আবির্ভাব ঘটে। তিনি এসে বর্ণনাত্মক অভিনয় করে আপনার পরিচয় জ্ঞাপন করে অভিনয় স্থান ত্যাগ করেন। তৃতীয় দৃশ্যে পুনরায় বলি রাজ ও মন্ত্রীর আগমন ঘটে। এ পর্যায়ে তারা মায়ের পূজা করে, এতে করে অভিনয় স্থানে তাদের দেবী মাতার আবির্ভূত হন। দেবী এসে চেয়ার উঠে দাঁড়ায়।

গাজীর যাত্রা পরিবেশনে একটি বিশেষ বিষয় লক্ষ করা যায়, আর তা হচ্ছে প্রম্পটার ও একই সঙ্গে পরিচালক অভিনয় মুহূর্তে চরিত্রের আগমন এবং নির্গমনের প্রয়োজন হলে রেফারির মতো বাঁশি বাজিয়ে থাকেন। তার বাঁশির নির্দেশ অনুযায়ী চরিত্রগণ অভিনয় স্থানে এসে অভিনয় করেন এবং প্রয়োজন অনুসারে অভিনয় করে তার বাঁশির নির্দেশেই অভিনয় স্থান ত্যাগ করেন। এমনকি তার বাঁশি ইঙ্গিতে চরিত্রের আঙ্গিক অভিনয় হাঁটা-চলা বা চেয়ারে ওঠা-বসাও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। একই সঙ্গে পরিচালক অভিনয় মুহূর্তে চরিত্রের আগমন এবং নির্গমনের প্রয়োজন হলে রেফারির মতো বাঁশি বাজিয়ে থাকেন। তার বাঁশির নির্দেশ অনুযায়ী চরিত্রগণ অভিনয় স্থানে এসে অভিনয় করেন এবং প্রয়োজন অনুসারে অভিনয় করে তার বাঁশির নির্দেশেই অভিনয় স্থান ত্যাগ করেন। এমনকি তার বাঁশি ইঙ্গিতে চরিত্রের আঙ্গিক অভিনয় হাঁটা-চলা বা চেয়ারে ওঠা-বসাও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। একই সঙ্গে পরিচালক অভিনয় মুহূর্তে চরিত্রের আগমন এবং নির্গমনের প্রয়োজন হলে রেফারির মতো বাঁশি বাজিয়ে থাকেন। তার বাঁশির নির্দেশ অনুযায়ী চরিত্রগণ অভিনয় স্থানে এসে অভিনয় করেন এবং প্রয়োজন অনুসারে অভিনয় করে তার বাঁশির নির্দেশেই অভিনয় স্থান ত্যাগ করেন। এমনকি তার বাঁশি ইঙ্গিতে চরিত্রের আঙ্গিক অভিনয় হাঁটা-চলা বা চেয়ারে ওঠা-বসাও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।[৬৩]

মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া, ধামরাই প্রভৃতি অঞ্চলে বর্তমানে প্রায় নিয়মিতভাবে *গাজীর যাত্রা* পরিবেশিত হয়ে থাকে। এই অঞ্চলে গাজীর যাত্রার বেশ কিছু দল রয়েছে।

১০.১:৪ গাজীর গান

গাজীর গান এক ধরনের মিশ্ররীতির পরিবেশনশিল্প। গীতি, নৃত্য, সংলাপ এবং আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয়ের সংমিশ্রণে গাজীর গান পরিবেশিত হয়। সাধারণত সাতটি স্বতন্ত্র পালায় এ ধরনের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের আসর অনুষ্ঠিত হয়, যথা–১. বিয়ের পালা, ২. দিদার বাদশার পালা, ৩. ধর্ম-বাদশার পালা, ৪. এরেঙ বাদশার পালা, ৫. তাইজুল বাদশার পালা, ৬. তারা ডাকাতের পালা, এবং ৭. জামাল-বাদশার পালা। তবে, গাজীর গানের যে কোনো পালা শুরুর আগে গাজীর স্মরণ ডাকা উপলক্ষ্যে এক প্রকার আবশ্যিকভাবেই 'ফোকরে পালা' অভিনীত হয়ে থাকে। 'ফোকরে পালা'তে মূলত গাজী ও কালুর ফকির হবার কাহিনি ব্যক্ত হয়।

গাজীর গান পরিবেশনের শুরুতেই থাকে বাঁশি, হারমোনিয়াম, জুড়ি (মন্দিরা/করতাল) ও ঢোলের সম্মিলিত বাদ্য বাদন। প্রচলিত ও জনপ্রিয় কোনো লোকসংগীতের সুরে এই সম্মিলিত বাদ্য বাদন চলে।

Dhaka University Institutional Repository

আসলে, অভিনয়শিল্পীদের প্রস্তুতি এবং আসরের দিকে দর্শক মনোযোগ কেন্দ্রিভূত করাই হচ্ছে সম্মিলিত বাদ্য বাদনের প্রধান উদ্দেশ্য। এরপর পরমেশ্বর বা আল্লার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনমূলক একটি সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। এ ধরনের ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশনের পর মূলগায়েন বন্দনাগীত পরিবেশন করেন। সাধারণত বিভিন্ন পির-দরবেশ-আউলিয়া, হিন্দু দেব-দেবীর মধ্যে সরস্বতী এবং সব শেষে গাজী পিরের নামে বন্দনাগীত পরিবেশন করা হয়। আসরে বন্দনাগীতের পর পরিচিত ও জনপ্রিয় কোনো লোকসংগীতের সুরে একটি ছুকরি নৃত্যটি পরিবেশিত হয়। ছুকরির নৃত্যের পর মূলগায়েন এবার আখ্যান পরিবেশনের জন্যে আসরে উপস্থিত হন এবং একটি বর্ণনাত্মক গীতের মাধ্যমে আখ্যান পরিবেশনের সূচনা করেন।

গাজীর গানের যে কোনো পালা শুরুর আগেই গাজী পিরের স্মরণমূলক বা মাহাত্ম্য-প্রকাশক 'ফোকরে পালা' পরিবেশিত হয়। 'ফোকরে পালা' পরিবেশনের ক্ষেত্রে মূলগায়েন তার সহযোগী অভিনেতা (কালু) ও ছুকরিদেরকে নিয়ে মঞ্চের সম্মুখভাগে পোতা গাজীর আশা'কে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে তিনবার ঘুরে ভক্তি প্রদর্শন করেন। তারপর বর্ণনাত্মক অভিনয়ে গীত, নৃত্য এবং চরিত্রাভিনয়ে গদ্য-পদ্য-গীত সংলাপ ও নৃত্য সহযোগে ফোকরে পালা পরিবেশনের মাধ্যমে রাত্রীব্যাপী গাজীর গানের অন্য কোন পরিবেশন করেন।

গাজীর গানের সমগ্র আখ্যান সাধারণত বর্ণনাত্মক এবং সংলাপাত্মক অভিনয়ের সমন্বয়ে পরিবেশিত হয়ে থাকে। সংলাপাত্মক অভিনয়ে মূলগায়েন ও তার সহযোগী অভিনেতা (কালু) ছাড়াও ছুকরিগণ এবং কখনো কখনো বাদ্যযন্ত্রীদের মধ্য থেকে অনেকে অংশগ্রহণ করে থাকেন। বর্ণনাত্মক অভিনয়ে কাহিনি বর্ণনা মূলগায়েন করলেও কখনো কখনো বর্ণনাত্মক গীতে ছুকরিদের অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। গাজীর গানের আসরে মূলগায়েন সার্বক্ষণিকভাবে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন না। অনেক সময় মূলগায়েনকে বর্ণনাত্মক ও সংলাপাত্মক অভিনয় চলাকালে বিশ্রাম নিতে বা ধুয়া গাইতে দেখা যায়।

আখ্যানের গৌণ বা কম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনেতাগণ বাদ্যযন্ত্রী-দোহারদের আসনে বসে থেকেই উক্তি-প্রত্যুক্তি প্রদানের মাধ্যমে মূলগায়েন ও তার সহ-অভিনেতার সাথে সংলাপাত্মক অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। এ সময়ে মূলগায়েন বা সহ-অভিনেতা অভিনয় স্থানের বৃত্তে আবর্তন করে চরিত্রাভিনয় করেন।

আখ্যানের বিশেষ বিশেষ কিছু মুখ্য চরিত্রের ক্ষেত্রেই কেবল অভিনেতা আসন ছেড়ে উঠে এসে সংলাপাত্মক অভিনয় পরিবেশন করেন। আসলে, সংলাপাত্মক অভিনয়ে চরিত্রের উঠে আসার জন্য মূলগায়েন তার বর্ণনাত্মক গদ্য বা গীতের মাধ্যমে এমন একটি ক্ষেত্র রচনা করেন যেখানে চরিত্রাভিনয়ের উক্ত এক বা একাধিক চরিত্র আসনে বসে থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এই প্রস্তুতি গ্রহণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিনয় উপকরণের ব্যবহার লক্ষণীয়—ওড়না বা উত্তরীয়, লাঠি, চামর, গামছা প্রভৃতি ব্যবহার করে চরিত্র নির্মাণ করেন। অতঃপর মূলগায়েন বর্ণনা ছেড়ে দিয়ে চরিত্র হয়ে সংলাপ প্রদান করলে উক্ত এক বা দুইজন কুশীলব উঠে এসে সংলাপাত্মক অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। সংলাপাত্মক অভিনয়কালীন এক চরিত্র থেকে অন্য চরিত্রে বা নতুন কোনো চরিত্রের অভিনয়ের প্রয়োজন হলে—সংক্ষিপ্ত গদ্য বর্ণনার মাধ্যমে মূলগায়েন

Dhaka University Institutional Repository

নিজে অথবা তার বর্ণনা অনুযায়ী তার সহ-অভিনেতা অর্ধ পরিক্রমন করে পরস্পর বিপরীত অবস্থানে গিয়ে নতুন চরিত্র ধারণ করে পুনরায় সংলাপাত্মক অভিনয় করেন।

সংলাপাত্মক অভিনয়েও মূলগায়েন কখনো কখনো অভিনয় ক্রিয়া থেকে প্রস্থান করে দোহারের অবস্থানে গিয়ে বিশ্রাম করেন। বিশেষ করে আখ্যানের প্রাসঙ্গিক এবং হাস্যরসাত্মক অভিনয়ে কখনো কখনো মূলগায়েন অংশগ্রহণ করেন না। আসলে, ছুকরিগণ অথবা সহ-অভিনেতা (কালু) এই ধরনের সংলাপাত্মক অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। বর্ণনা থেকে সংলাপে পরিবর্তনের উল্লেখিত নিয়মানুসারে মূলগায়েন প্রস্থান করেন। এই সময়ে সংলাপাত্মক অভিনয়ে আখ্যান বহির্ভূত তাৎক্ষণিক সৃষ্ট সংলাপ প্রক্ষেপণ লক্ষণীয়। দর্শকদের হাস্য-রসাত্মক বিনোদন প্রদানের লক্ষেই এই ধরনের দৃশ্যের পৌনঃপুনিক অভিনয় হতে দেখা যায়। সংলাপাত্মক অভিনয়ে আখ্যান বর্ণিত সকল নারী চরিত্রে সাধারণত ছুকরিগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন। এক্ষেত্রে কখনো কখনো মূলগায়েন প্রম্পট্ করে পরিবেশনের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। আবার কখনো বিশেষত সংলাপাত্মক গীত এবং বর্ণনাত্মক গীত-এর চরিত্রভিনয়ে মূলগায়েন ছুকরিদের সাথে যৌথভাবে সম্মিলিত কণ্ঠে চরিত্রটির গীতাভিনয় পরিবেশন করেন।

গাজীর গানের পরিবেশনরীতিতে সংলাপাত্মক গীত বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আখ্যান প্রাসঙ্গিক হাস্য-রসাত্মক অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশন করতে দেখা যায়। আর হাস্য-রসাত্মক অভিনয়ে সহ-অভিনেতা (কালু) এবং ছুকরিদের অংশগ্রহণই অধিক প্রত্যক্ষ করা যায়। আখ্যানের কোনো বিশেষ মুহূর্তে মূলগায়েনকেও সংলাপাত্মক গীতাভিনয় করতে দেখা যায়। বিশেষত বিচ্ছেদ বা করুণ-রসাত্মক দৃশ্যাভিনয়ে মূলগায়েন এবং ছুকরি অংশগ্রহণ করে থাকেন। মূলগায়েন সাধারণত শুধু তার অভিনীত স্বীয় চরিত্রের গীত সংলাপ পরিবেশন করেন না—কখনো কখনো অপর চরিত্র বা ছুকরিদের অভিনীত চরিত্রটির গীত সংলাপও তিনি ছুকরিদের সাথে সম্মিলিত কণ্ঠে অভিনয় করেন।

গাজীর গান পরিবেশনে সংলাপাত্মক গীত থেকে গদ্য অভিনয়ে প্রবেশের ক্ষেত্রে মূলগায়েনকেই প্রধান ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। আসলে, তিনি তার ইচ্ছা অনুযায়ী কখনো গীত থামিয়ে গদ্য সংলাপে আবার কখনো গীত থেকে গদ্যে আখ্যান বর্ণনা করে থাকেন। এক্ষেত্রে মূলগায়েন তার হাতের ইশারায় বাদ্যযন্ত্রীদেরকে নিয়ন্ত্রণ করেন। আর বাদ্যযন্ত্রীগণ তার হাতের নির্দেশেই সমন্বিত তেহাই দিয়ে গীত সমাপন করতেই মূলগায়েন গীত থামিয়ে গদ্যাভিনয় উপস্থাপন করার পথ পেয়ে যান।

চরিত্র পরিবর্তনে অথবা বর্ণনাত্মক অভিনয় থেকে সংলাপাত্মক অভিনয়ে পরিবর্তনে অভিনয় উপকরণের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই পরিবর্তন ক্রিয়ার বিশেষভাবে সহ-অভিনেতা কালুই অংশহগ্রহণ করে থাকেন। উত্তরীয়, লাঠি, কাপড়, চশমা, ঝোলা ব্যাগ, চামর প্রভৃতি অভিনয় উপকরণ ব্যবহার করে চরিত্র নির্মাণ করেন। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি দোহার বৃত্তে বসে থেকে দর্শক সম্মুখেই করে থাকেন। মূলগায়েনের পরিবেশনে পোশাকের পরিবর্তন বা অভিনয় উপকরণের কোনো ব্যবহার লক্ষ করা যায় না। তবে তিনি তার অভিনয়ে সার্বক্ষণিক ভাবে একটি চামর ব্যবহার করেন। নারী চরিত্রের সংলাপাত্মক

Dhaka University Institutional Repository

অভিনয়ে ছুকরিদের অভিনয় উপকরণের ব্যবহার বা পোশাক পরিবর্তন তেমন লক্ষণীয় নয়। কখনো কখনো মা অথবা বৃদ্ধা'র অভিনয়ে মাথায় শাড়ির আঁচল টেনে দেয়া ছাড়া বিশেষ কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না। তাদের চরিত্রাভিনয়ে বিশেষ যে পরিবর্তনটি লক্ষণীয় তা হচ্ছে-আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয়। শরীর ছন্দ এবং বচনে উভয় ক্ষেত্রেই নিখুঁত লাস্যময় সংলাপাত্মক এবং বর্ণনাত্মক অভিনয় বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে প্রাসঙ্গিক কিছু দৃশ্যের নৃত্যাভিনয়ে উল্লেখিত নান্দনিক মাত্রাকে ছাপিয়ে বর্তমান সময়ের প্রচলিত যাত্রায় পরিবেশিত নৃত্যের প্রভাবও লক্ষ করা যায়।

মূলগায়েনের পরিবেশনে গদ্য ও গীতাভিনয়ে একটি সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করতে দেখা যায়, কণ্ঠকে হারমোনিয়ামের একটি নির্দিষ্ট স্বরে বা স্কেলের সাথে সমন্বিত করে নেয়া। পরিবেশনের শুরুতেই গায়েন হারমোনিয়ামের একটি নির্দিষ্ট স্কেলের সাথে তার কণ্ঠের স্বর সমন্বয় করেন। স্বর নির্দিষ্টকরণের ফলে গদ্য থেকে গীত আবার গীত থেকে গদ্য অভিনয় পরিবর্তনে কণ্ঠস্বরের কোন বাড়তি প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। দ্রুত ও স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে পরিবেশিত আখ্যানকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী গদ্য বা গীতাভিনয়ে পরিবর্তন করতে পারেন। সংলাপাত্মক গদ্য অভিনয়ে মূলগায়েন নির্দিষ্ট স্কেলের মধ্যে থেকেই স্বরের বিভিন্ন ব্যবহার করে সংলাপ প্রক্ষেপণ করেন। গাজীর গানের আখ্যান পরিবেশনে দু'টি ভিন্ন দৃশ্য বা ঘটনার মধ্যে সংযোগ সম্পর্ক স্থাপনে মূলগায়েন বর্ণনাত্মক গদ্য ব্যবহার করেন। এক্ষেত্রে সংযোগ স্থাপনকারী মধ্যবর্তী বর্ণনাত্মক গদ্যাভিনয়ে মূলগায়েন বৃত্তাকারে আসর পরিক্রমণ করে থাকেন। অর্থাৎ তিনি গদ্য বর্ণনার সাথে সাথে আসর পরিক্রমার মধ্যে দৃশ্য বা চরিত্র পরিবর্তন করেন।

গাজীর গান পরিবেশনে বর্ণনাত্মক অভিনয় থেকে সংলাপাত্মক অভিনয় পরিবর্তনে বর্ণনাত্মক গদ্যের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এ সময়ে মূলগায়েন যে সকল এক বা একাধিক চরিত্রের এবং দৃশ্যের বর্ণনা করেন সহ-অভিনেতা অথবা ছুকরি অথবা বাদ্যযন্ত্রীদের মধ্য থেকে কেউ গায়েনের বর্ণনার মধ্যেই দোহার বা বাদ্যযন্ত্রীদের বৃত্তে বসে সংলাপাত্মক চরিত্রাভিনয়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এ ধরনের অভিনয়ে তারা কখনো অভিনয় উপকরণ ব্যবহার করে একটি দৃশ্য বা চরিত্র রূপায়ণ করে থাকেন। এক্ষেত্রে মূলগায়েন বর্ণনাত্মক গদ্য প্রয়োগের মাধ্যমে একটি ক্ষেত্র রচনা করে সংলাপাত্মক অভিনয় উপস্থাপনের সুযোগ দেন। আর মূলগায়েনের একটি প্রশ্নবাচক উক্তির উত্তর প্রদানের মধ্য দিয়ে সংলাপাত্মক অভিনয় শুরু হয়। এ সময়ে কখনো কখনো বাদ্যযন্ত্রে জোরালো আওয়াজ করা হয়ে থাকে। বর্ণনাত্মক গদ্য প্রয়োগের মাধ্যমে সংলাপাত্মক অভিনয় সূচনার এই কৌশল প্রয়োগে মূলগায়েনকে কখনো কখনো একটি বিশেষ সুবিধা গ্রহণ করতে দেখা যায়। যেমন–আখ্যান পরিবেশনের যে সকল অংশে প্রাসঙ্গিক অথবা লঘু হাস্য-রস-প্রযুক্ত সংলাপাত্মক অভিনয় পরিবেশিত হয় সে সকল অংশে মূলগায়েন বিশ্রামের সুযোগ গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, এক্ষেত্রে মূলগায়েন কখনো কখনো বর্ণনাত্মক গদ্য প্রয়োগে আখ্যানের অন্তর্গত কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন এবং কখনো আবার প্রয়োজন অনুসারে আখ্যানবস্তুকে সংক্ষিপ্ত করণে ভূমিকা রাখেন।

গাজীর গানের আখ্যান পরিবেশনে যে সকল অংশে সমস্যার জটিল আবর্তে কোনো চরিত্র পতিত হয় বা বিয়োগ বিচ্ছেদে পতিত হয় তখন অধিকাংশক্ষেত্রে মূলগায়েন বর্ণনাত্মক গীত পরিবেশনের মাধ্যমে এক

Dhaka University Institutional Repository

ধরনের ভাবারোহী বেগ তৈরি করেন। কখনো কখনো এ সময়ে সহ-অভিনেতা বা দোহাদের মধ্য থেকে কোনো কোনো কুশীলবকে গীত অভ্যন্তরে দু'একটি গদ্য উক্তি-প্রত্যুক্তি করে এক ধরনের সংলাপাত্মক আবহ তৈরি করতে দেখা যায়। বর্ণনাত্মক গীতের মাধ্যমে সংলাপাত্মক অভিনয়ের ক্ষেত্রে মূলগায়েন অথবা ছুকরি বর্ণনাত্মক গীতের ভেতর দিয়েই কোনো একটি চরিত্রের অভিনয় উপস্থাপন করে থাকেন। বর্ণনাত্মক গীত অভিনয়ে মূলগায়েন কখনো কখনো প্রস্থান করেন। আখ্যানের কোনো কোনো অংশের নারী চরিত্রের বর্ণনাত্মক অভিনয়ে মূলগায়েন প্রথমে গদ্যে চরিত্রটির বর্ণনা করেন। এ সময়ে ছুকরিদের মধ্য থেকে কোনো একজন নিজেকে গীতাভিনয়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। অতঃপর মূলগায়েন গীত শুরু করলে দোহার-বাদ্যযন্ত্রীদের ভেতর থেকে একজন ছুকরি উঠে এসে মূলগায়েনের কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গীতাভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে মূলগায়েন এক পর্যায়ে সে গীতাভিনয় থেকে প্রস্থান করে দোহার দলে স্থান গ্রহণ করেন, এটা একই সঙ্গে মূলগায়েনের বিশ্রাম নেবার একটা কৌশল এবং চরিত্রাভিনয়ে সুনির্দিষ্ট একটি দৃশ্য রচনারও শিল্পিত বিষয়। তবে, এ সময় দোহার দলে বসা মূলগায়েনকে কখনো কখনো গীত চরণের কিছু কিছু বাক্য প্রম্পট্ করতে দেখা যায়, কখনো আবার তাকে জুড়ি (মন্দিরা) বাজিয়ে ধুয়া গেয়ে দোহার দলকে সহায়তা করতে দেখা যায়। এ সময়ে ছুকরি গীতাভিনয়ের মাধ্যমে চরিত্রের বর্ণনাত্মক অভিনয় পরিবেশন করেন।[৬৪]

গাজীর গানের এ ধরনের পরিবেশনরীতির সমৃদ্ধ এলাকা হচ্ছে খুলনা বিভাগ। এই বিভাগের সকল জেলাতে প্রায় এর একই রকম পরিবেশনরীতি প্রচলিত। তবে, এ বিভাগের বিভিন্ন জেলার পরিবেশনে শিল্পী-কুশীলবদের অংশ গ্রহণে কিছু রকমফের প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন, ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া অঞ্চলের গাজীর গান মূলত পুরুষ গায়েনদের পরিবেশনা, এমনকি নারীর ভূমিকাতেও পুরুষেরা ছুকরি সেজে অভিনয় ও নৃত্যগীত পরিবেশন করেন। আর যশোর অঞ্চলের গাজীর গান পরিবেশনে নারী ও পুরুষ উভয়কে অংশ নিতে দেখা যায়।

১০.১:৫ গাজী পিরের মাহাত্ম্য-প্রকাশক অন্যান্য পরিবেশনা

বাংলাদেশের মুসলমানদের লোকায়ত পির গাজী ও তার জীবনী-মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান পরিবেশনা সম্পর্কে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, এ ধরনের পরিবেশনা সাধারণত দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে বেশি দেখা যায়। কিন্তু, এই ধারণাটি সম্পূর্ণরূপে সঠিক নয়। কারণ, সারা বাংলাদেশেই প্রায় একই রকমভাবে এ ধরনের পরিবেশনা প্রচলিত আছে বলে জানা যায়। এদেশের উত্তরাঞ্চলে বহু জেলাতেই বিভিন্ন আঙ্গিকে পির গাজীর মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান পরিবেশিত হয়। বৃহত্তর রাজশাহী ও সিলেট জেলায় বেশ ভালোভাবেই গাজীর আখ্যান প্রচলিত।

গাজীর পাইল : বৃহত্তর সিলেট জেলার শ্রীমঙ্গল থানার মাইজদিহি গ্রামের সরল মিয়া ও তাঁর ভাই লাল মিয়া-এর একটি গানের দল আছে। এই দলটি সারা বছরের অধিকাংশ সময় সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, এমনকি নেত্রকোনা অঞ্চলে 'গাজীর পাইল' নামে গাজী পিরের মাহাত্ম্য-প্রকাশক এক

Dhaka University Institutional Repository

ধরনের আখ্যান পরিবেশন করে থাকে। এ দলের মূলগায়েনকে ওস্তাদ বলা হয়। সরল মিয়া এই দলের মূলগায়েন বা ওস্তাদ। তিনি গুরু পরম্পরার ভিত্তিতে গাজীর পাইলের শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করেছেন হবিগঞ্জের বানিয়াচঙের সুরত জামালের কাছে। গুরু পরম্পরায় সুরত জামালের গুরু ছিলেন গফুর আলী। এই গফুর আলীর গুরু ছিলেন আব্দুল হক, যাঁর গুরু ছিলেন ইদ্রিস আলী এবং এই ইদ্রিস আলী গাজীর পাইলের শিক্ষা নিয়েছিলেন ফরহাদ আলীর কাছ থেকে। এক্ষেত্রে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে প্রচলিত গাজীর পাইল পরিবেশনের পাঁচ পুরুষের ইতিহাস জানেন বর্তমান ওস্তাদ সরল মিয়া। সরল মিয়ার দল সাধারণত সাতটি পালায় *গাজীর পাইল* পরিবেশন করেন, যথা—১. গাজী-কালু-চম্পাবতী, ২. হলেক বাদশা শাহ পরী, ৩. তাজের মুলুক-গুলে বাকালী, ৪. সূর্যলাল ধর্মমালিক, ৫. কামাল-জামাল, ৬. আলমাস-গুলজান পরী এবং ৭. গুলে হরমুজ। শ্রীমঙ্গল অঞ্চলে গাজীর পাইল-এর অপরাপর গায়কদের মধ্যে রাজনগর গ্রামের উম্মর খলিফা, খাওফলা গ্রামের উন্দা খলিফা, আগুনশি গ্রামের সাজিদ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৬৫]

গাজীর গীত : নেত্রকোনা জেলার বিভিন্ন গ্রামে গাজীর গীতের বেশ কিছু দল বর্তমান রয়েছে। এই সকল দল সারা বছর ধরে প্রায় নিয়মিতভাবে বিভিন্ন মানতে গাজীর গীত পরিবেশন করে আসছে। এ ধরনের আসর শুরুর আগে অভিনয় স্থানের সম্মুখভাগে একটি গাজীর আশা স্থাপনের পর তার পাশে একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখা হয়। তারপর বাদ্যযন্ত্রীগণ সম্মিলিত বাদ্য বাদন করেন। যন্ত্রসঙ্গীতের সেই ঐক্যতানের পর শুরু হয় বন্দনাগীত। বন্দনাগীত পরিবেশনের সূচনায় মূলগায়েন দোহার-বাদ্যযন্ত্রীদের সঙ্গে বসে থাকলেও পরবর্তী সময়ে তিনি উঠে দাঁড়ান এবং দোহারদের ধুয়ার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নৃত্য সহযোগে বন্দনা সমাপ্ত করেন। গাজীর গীতের মূল পালা পরিবেশনের অভিনয়ে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন, মূলগায়েন আখ্যান বর্ণনার মধ্যে সিকান্দার বাদশার চরিত্রাভিয়ে ঢোলকের কাঁধকে সিংহাসন হিসেবে ব্যবহার করেন এবং তার কাঁধে বসেই বাদশা চরিত্রের সংলাপ ও বর্ণনা প্রদান করেন। এছাড়া, জুলহাস চরিত্রের ঘোড়া চড়ে শিকারে যাবার প্রসঙ্গ এলে একজন কুশীলব পিঠের উপর একটি শাল বিছিয়ে দিয়ে পিঠটাকে ঘোড়ার পিঠের মতো মেলে ধরতেই মূলগায়েন সেখানে বসে 'আমার পাগলা ঘোড়া রে, তুমি কইর মানুষ কই লইয়া যাও' গানটি পরিবেশন করেন। উল্লেখ্য, গাজীর গীতের আখ্যান গদ্যভাষ্যের বর্ণনায় মূলগায়েন তেমন কোনো আঙ্গিক অভিনয়ের আশ্রয় নেন না। তবে, গীত বর্ণনায় তিনি অধিকাংশক্ষেত্রে আঙ্গিক অভিনয় করেন। যেমন, গাজী জন্মের পর 'মায় কান্দে রে জাদুয়া লইয়া' এই বর্ণনাত্মক গীতটি পরিবেশনে মূলগায়েন তার কাঁধে ঝোলানো উত্তরীয় পেঁচিয়ে তা সন্তানের মতো কোলে নিয়ে আঙ্গিক অভিনয় করে থাকেন। নেত্রকোনা অঞ্চলে প্রচলিত গাজীর গীত বর্তমানে বেশ সমৃদ্ধ। উক্ত অঞ্চলে এ ধরনের পরিবেশনরীতি বিখ্যাত শিল্পী-কুশীলবদের মধ্যে কেন্দুয়া থানার তারাকান্দি-রাজীবপুরে আব্দুল জব্বার বয়াতী, রাজীবপুরে মনসুর বয়াতী এবং কুনিহাটি গ্রামে দিলু বয়াতী উল্লেখযোগ্য।[৬৬] এছাড়া, ঢাকার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর মধ্যে গাজীপুর ও নরসিংদী জেলার বহু গ্রামে গাজী পিরের মাহাত্ম্য-প্রকাশক কিছু পরিবেশনরীতি প্রচলিত রয়েছে। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো উক্ত এলাকাতেও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা কিছু পির-মুর্শিদ ভক্ত মুসলমান বিভিন্ন মানতে প্রচলিত পরিবেশনরীতিসমূহের আয়োজন করে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

১০.২ মানিক পিরের গান

বাংলাদেশের অনৈতিহাসিক পিরদের মধ্যে মানিক পিরের প্রভাব অতি ব্যাপক। এদেশের মানুষ এই পিরকে কেন্দ্র করে "মানিক পিরের গান" নামে এক ধরনের ভক্তিমূলক নৃত্য-গীত পরিবেশন করেন। মৌখিকরীতির এই ভক্তিমূলক পরিবেশনের পাশাপাশি এর লেখ্যরীতির পুঁথিসাহিত্য জন্ম লাভ করেছে।[৬৭]

এদেশের উত্তরবঙ্গের জেলা রাজশাহী, নাটোর, রংপুর, দিনাজপুর; দক্ষিণবঙ্গের যশোর, খুলনা ছাড়াও ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মানিকগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে নানা আঙ্গিকে বা রীতিতে এই গান পরিবেশিত হয়।

সাধারণত চারটি পালায় মানিক পিরের গান পরিবেশন করা হয়। পালাগুলো হচ্ছে—১. জন্মপালা, ২. বিদায় বা ফকরে পালা, ৩. জাহিরি বা ভিক্ষে করা পালা এবং ৪. মৃত্যু ও জিলানে পাল।

১০.৩ মাদার পিরের গান

মাদার পিরকে গবেষকগণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসেবে শনাক্ত করে বলেছেন—মাদার পিরের আসল নাম বদি আল দীন, শাহ মাদার তাঁর উপাধি। তিনি ১৩১৫ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল আবু ইসহাক শামী। বলা হয়ে থাকে তিনি হজরত মুসার ভাই হযরত হারুনের বংশধর। তিনি অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। লোকে তার মুখশ্রী দেখে বিভোর হয়ে যেতেন। এ কারণে তিনি না-কি মুখোশ পরে থাকতেন। ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে তিনি পশ্চিম এশিয়া ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন এবং সুলতান ইব্রাহিম শর্কির রাজত্বকালে তিনি ১৪৩৭ খ্রিষ্টাব্দে কানপুরের মকনপুরে দেহত্যাগ করেন।[৬৮] তাঁর অলৌকিক মাহাত্ম্য নিয়ে এদেশের সাধারণ মানুষ প্রচুর সাহিত্য সৃজন করেছে। শুধু তাই নয়, এদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে তার স্মরণে নানা ধরনের উৎসব-পার্বণ বা লোকাচার, কৃত্যানুষ্ঠান ও নাট্যগীতের অভিনয় পরিবেশিত হয়ে থাকে। মাদারপীরের গানের আসরে ফকিরি জাহিরী নিয়ে মোট সাধারণত ৯টি পালা পরিবেশিত হয়ে থাকে। পালাগুলোর নাম ও বিষয়বস্তু হল—১. 'জন্ম পালা' বা 'ফকিরা পালা', এই পালায় মাদার ও জুমলের জন্ম হয় ও তাদের ফকির হবার কাহিনি প্রকাশ করা হয়। ২. 'বড় পির সাহেবের পালা', এই পালায় বড় পির আব্দুল কাদের জিলানীর সাথে ধর্ম ও আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে মাদারের তীব্র মতবিরোধিতার কাহিনি প্রকাশ করা হয়। ৩. 'বিবি কুসুমের পালা', এই পালাটিতে মাদারের আশীর্বাদে নিঃসন্তান রানী কুসুমের গর্ভে সন্তান জন্মের কাহিনি প্রকাশ করা হয়। ৪. 'রাক্ষস-বিভীষণের পালা', এই পালাতে একটি নিষ্পাপ শিশুর কলেরায় মৃত্যু এবং আজরাইল কর্তৃক শিশুটির জান কবজ করাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ এবং মাদারপীরের মধ্যে তীব্র সংঘাত প্রকাশ করা হয়। এই পালাতে দেখা যায় মাদারপীর আল্লাহর অভিশাপে পতিত হয়। আর মা ফাতেমা এসে আল্লাহ এবং মাদারের মধ্যের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটান। সবশেষে মাদার আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চান। আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দেন যে মাদারপীরের ভক্তকুলের মাঝে আর কখনো বিভীষণ (কলেরা) প্রবেশ করবেন না। ৫. 'নৌকা বিলাস পালা', পাথর দিয়ে নৌকা নির্মাণের কাহিনি রয়েছে এই পালাতে। ৬. 'ধনা রাখালের পালা', এই পালাতে মাদারের অলৌকিক শক্তি দেখে ধনা

রাখালের মনে মাদারকে হেদায়েত করার বাসনা জাগে ও তার ইচ্ছা পূরণ ঘটে। ৭. 'গুঞ্জর বিবির পালা'। ৮. 'গৌরা চাঁন্দের পালা'। ৯. 'পুণ্যের পালা'।[৬৯] এছাড়া, খাকপত্তনের পালা নামে আরেকটি পালা মাদার পিরের গানের আসরে পরিবেশিত হয়ে থাকে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে পালাটির পরিবেশনা নিয়ে গায়ক-শিল্পীদের মধ্যে লোকবিশ্বাসজনিত কিছু ভীতি সক্রিয় থাকায় এটি খুব একটা অভিনীত হয় না।[৭০]

১০.৩.১ মাদারপীরের গানের নাট্য পরিবেশনা

বাংলাদেশের গ্রামের নিম্নবর্গের মুসলমানদের বিশ্বাস, মাদার পির বিভিন্ন বিপদ-আপদ থেকে তাদেরকে আসান বা উদ্ধার করে থাকেন। এই বিশ্বাসে গ্রামের সাধারণ মুসলমান সারা বছরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে মাদার পিরের মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান পরিবেশন করেন। এমনকি কোথাও কোথাও তাঁর প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের নিমিত্তে উৎসবের আকারে কিছু কৃত্যাচার পালন করে থাকেন।

মাদার পিরের গান পরিবেশনে বর্ণনাত্মক ও সংলাপাত্মক অভিনয়ের মিশ্র প্রয়োগে আখ্যান বা কাহিনির সামগ্রিক গতি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখেন একমাত্র মূলগায়েন। সাধারণত তিনি উপস্থিত দর্শকদের চাহিদা অনুযায়ী আখ্যানের ভাব-রস ও তার ঘটনাংশ বিস্তার বা সংক্ষিপ্ত করে থাকেন। আর আসরে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য কুশীলবদের মধ্যে বায়েন ও সহ-অভিনেতাগণ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এক বা একাধিক চরিত্রের সংলাপাত্মক অভিনয়ে; এমনকি নাচিয়া বা ছুকরিগণও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এক বা একাধিক চরিত্রের বর্ণন্মক ও সংলাপাত্মক অভিনয় করে থাকেন। এছাড়া, বাকি কুশীলবগণ আখ্যানের কতিপয় গৌণ চরিত্রের সংলাপাত্মক অভিনয় ব্যতীত সার্বক্ষণিকভাবে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে এবং ধুয়াগীত করে মূলগায়েনকে সহযোগিতা করেন।

আসরের শুরুতে বাদ্যকর ও দোহারগণ মিলে সম্মিলিত বাদ্যবাদন করেন। এরপর মূলগায়েন মঞ্চে এসে বাদ্যযন্ত্রের ঝংকারিত ধ্বনির মধ্যে সুরে সুরে 'আছসালামু আলাইকুম ওরে...ও...ও...ও' গীত পরিবেশনের মাধ্যমে সালাম ফিরান। আসরে উপস্থিত সকল দর্শক-ভক্ত এবং সকল কুশীলবের মঙ্গলকামনার্থে আল্লাহ, রাসূল, পির, দরবেশদের উদ্দেশ্যে মূলগায়েন ও দোহারগণ সমন্বিতভাবে এই সালাম ফিরানের পর্বটি পরিবেশন করেন। এরপর আসে আসর বন্দনা।

মূলগায়েন সাধারণত করতাল ও খোল বাদ্যের তালে তালে অন্তমিলযুক্ত বর্ণনাত্মক পদ্যের ছন্দে বন্দনা পরিবেশন করেন। যেমন :

> এক অক্ষর দুই অক্ষর যে জানে কালাম। তিনার চরণে আমার হাজার সালাম।
> এক অক্ষর দুই অক্ষর যে শিকালো মোরে। ভক্তি ভাবে তাহার চরণ আমার মস্তকের উপরে।
> আমি অধম দশের কদম বাবা সগোল কিছু নাহি জানি। কেবল ভরসা আমার দশের আঙ্গাচরণ খানি।
> দীক্ষা গুরু বন্দে গাবো শিক্ষা গুরুর পা। গানের গুরু বন্দে গাবো স্বরসাতি মা।
> দেশ মাতা জ্ঞান দাতা শিক্ষারও প্রধান। তোমার সাধনা করছে মাগো হিন্দু মুসলমান।...

Dhaka University Institutional Repository

এ ধরনের বন্দনা তালযন্ত্রের তালের সাথে মূলগায়েন একাই পরিবেশন করলেও সে মুহূর্তে তার দুই পাশে দুইজন নাচিয়া অবস্থান করে নৃত্য প্রদর্শন করেন। তবে, বন্দনার তাল ও লয়ের পরিবর্তন ঘটলে নাচিয়াদ্বয় এক পর্যায়ে মূলগায়েনের দুই পাশ থেকে সরে গিয়ে মঞ্চের কেন্দ্রীয় অবস্থানে বসা দোহার-বাদ্যকরদের বৃত্তকে নৃত্য সহযোগ আবর্তনের মাধ্যমে বন্দনার ধুয়া পরিবেশন করেন। এ ধরনের বন্দনায় সাধারণত প্রতি ছয় বা আট চরণ পরে সমন্বিত বাদ্যযন্ত্রের সাথে টানা সুরের ধুয়াগীত পরিবেশিত হয়।

মাদার পিরের গানের আখ্যান পরিবেশনে সাধারণত বর্ণনাত্মক পদ্য, বর্ণনাত্মক গীত, সংলাপাত্মক পদ্য ও গদ্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে মূলগায়েনকে বর্ণনাত্মক গীত, পদ্য এবং সংলাপাত্মক পদ্য ব্যবহার করতে দেখা যায়। তবে, তিনি আখ্যানের প্রায় সকল চরিত্রের বর্ণনাত্মক অভিনয় করলেও কেবল মাদার এবং শেরশাহ বাদশার চরিত্রে সংলাপাত্মক অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু সহ অভিনেতা বা বাদ্যযন্ত্রীদের কাউকে কখনোই চরিত্রের বর্ণনাত্মক অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় না। অন্যদিকে আখ্যানের সকল নারী চরিত্রের বর্ণনাত্মক অভিনয়ে মূলগায়েন এবং নাচিয়া উভয়কেই বর্ণনাত্মক গীত ব্যবহার করতে দেখা যায়।

মাদার পিরের গান পরিবেশনের মধ্যে দৃশ্য পরিবর্তনের জন্য গরান প্রয়োগ করা হয়। আসলে, আখ্যানের একটি ঘটনা থেকে আরেকটি ঘটনায় গমনের কালে গরান করা হয়। এক্ষেত্রে মূলগায়েন তার হাতে ধরা চামর নিয়ে দোহার ও বাদ্যযন্ত্রীদেরকে কেন্দ্র রেখে বৃত্তাকারে দৌড়াতে থাকেন আর তখন অন্যান্য চরিত্র, নাচিয়া-সখিরা ছুটে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকেন। এই বৃত্তাকারে ঘোরার সময়ে মূলগায়েন ও অন্যান্য চরিত্র বা নাচিয়াদেরকে সময় সময় বিপরীতমুখী হয়ে দৌড়াতে দেখা যায়। এই দৌড়ের পর নতুন একটি ঘটনার সূত্রপাত করেন মূলগায়েন। পুরো এই প্রক্রিয়াটিকে মাদার পিরের গানের আসরে গরান নামে অভিহিত করা হয়।

এ ধরনের পরিবেশনে একাধিক কুশীলবের একাধিক অভিনয় উপাদানের মিশ্র প্রয়োগ থাকলেও একমাত্র মূলগায়েন বর্ণনাত্মক অভিনয় উপাদান প্রয়োগে আখ্যান পরিবেশনাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখেন। অন্যান্য কুশীলব বিশেষত নাচিয়া ও সহঅভিনেতা তাদের অভিনয়ের যেখানে বর্ণনাত্মক অভিনয় রয়েছে মূলগায়েন সেখানে উক্ত অভিনয় পরিবেশন করেন এবং নতুন দৃশ্য রচনায় অভিনয় উপাদান পরিবর্তনের মাধ্যমে পুনরায় তাদের হাতে তুলে দেন। ফলে এই পরিবেশনে মূলগায়েন সংলাপাত্মক অভিনয়ে প্রধানত মাদার এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আখ্যানে বর্ণিত বাদশার চরিত্রে অভিনয় করলেও বর্ণনাত্মক অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি অন্যান্য প্রধান চরিত্র যেমন রানী, জুমল, দাসী প্রভৃতি চরিত্রের অভিনয় করে থাকেন।

এ পর্যায়ে মাদার পিরের গানের পরিবেশনরীতির প্রামাণ্য হিসেবে 'বিবি কুসুম পালা'র একটি অংশের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা যায়। এই পালার শুরুতে দোহার-বাদ্যকরদের দল থেকে সহ-গায়েন উঠে দাঁড়ান এবং শেরশাহ বাদশার চরিত্র ধারণ করেন। অন্যদিকে মূলগায়েন ফকির মাদার চরিত্র ধারণ করেন। এবার তারা উভয়ে সংলাপাত্মক অভিনয়ে অংশ নেন।

Dhaka University Institutional Repository

মাদার : আল্লার সালাম-বাবা চোখের পানি মোছ, তুমি সোনার যাদুমণি-মিছা কেনো কাঁদছো, কেনো তাই বলো তো শুনি?

শেরশাহ : বাপরে, ধনে ভরা মাল, মাল ভরা ধন। ধনে মালে বাড়ি আমার সত্তর কুড়া—আল্লা মোরে করেছে তবু বেজায় হাটকুড়া। তাই মনের দুঃখে কান্দাকাটি করে আপনার সামনে এসেছি।

মাদার : তোমার ঘরে সুসন্তান কিছু নাই

শেরশাহ : একটিও না।

মাদার : তুমি সেই রুমনমা শহরের শেরশাহ বাদশা

শেরশাহ : জে জে

মাদার : তুমি সাত মুল্লুকের বাদশা- আচ্ছা বাদশা বল দেখি সত্য করে, তুমি বিয়া শাদি কিছু করেছো?

শেরশাহ : হ্যাঁ, আমি বিয়াও করেছি শাদিও করেছি। একে একে সাত সাতটা করছি শাদি, তবু পুত্র সন্তান দেয়নি দারুন বিধি।

মাদার : আচ্ছা তোমার বেগমকে তুমি ডাক্তার কবরেজ ফকির ফকরে দিয়ে কোনো চিকিৎসা করেছো?

শেরশাহ : হ্যাঁ, সাত বেগমেরে আমি চিৎকরে উপুর করে দুই রকমেই...

মাদার : এই বদ... চিকিৎসার কথা বলছো।

শেরশাহ : চিকিৎসা করিছি বহু করিছি কিছুতেই কিছু হইনি।

মাদার : তুমি আমাকে চেনো?

শেরশাহ : জে না আপনাকে কোনো দিন দেখিনি। পরশুদিন রাতের এশার নামাজের পরে আল্লার কাছে হাত তুলে কাঁদলি—হে আল্লা দুনিয়ার ডাক্তার কবিরাজ ফকির ফকরা দিয়ে চিকিৎসা করলাম কিন্তু আমার ঘরে সন্তানাদি হল না, তবে নাম শুনেছি পাগল মাদার, চোখে দেখিনি—ফাতেমার পালিত পুত্র জিন্দা শাহ মাদার, ওই ফকিরের সাথে যদি আমার সাক্ষাৎ করে দেও তার হাতের কিছু দাওয়া পানি লিয়ে ছেলে পেলে হত কি-না একটু দেকমাম।

মাদার : দম... দম... দম... আমি সেই মাদার

শেরশাহ : সালাম বাপ, সালাম

Dhaka University Institutional Repository

মাদার : আমি তোমার বাড়িতে ধলফুল লিয়ে এসেছি, এই ধলফুল খেলে নিশ্চয় তোমার সন্তান হবে।

শেরশাহ : ছেলে হবে?

মাদার : হ্যাঁ, হবে।...

শেরশাহ : ঠিক আছে চলো ওই ফকিরের কাছে তুমাদের নিয়ে যাই।

অতঃপর মাদার পিরকে দেখে বিবিরা ধলফুল খেতে সম্মতি জানায়। মাদার বাদশার স্ত্রীদের মধ্যে ধলফুল প্রদান করে। সেই ফুল খেয়ে কেবল কুসুম বিবির গর্ভে সন্তান আসে।[৭১]

এ ধরনের পরিবেশনা মূলত বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতিকে অনুসরণ করে থাকে। তবে, এর সঙ্গে হাস্যরসাত্মক চরিত্রাভিনয় প্রত্যক্ষ করা যায়। আর সকল অংশের নিয়ন্ত্রণ এবং নতুন দৃশ্য রচনা আবার পুরাতন দৃশ্যের ইতি সংগঠন ইত্যাদি সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

সম্প্রতি নাটোর জেলার কমরপুর গ্রামের এই বিচ্ছাদ আলী আলাদাভাবে দল গঠন করে মাদার পিরের গান পরিবেশন করে থাকেন। এছাড়া, একই জেলার চানপুর গ্রামের নাজির গায়েন ও গুরুদাসপুর থানার নাজিরপুর গ্রামের দুদু গায়েন মাদার পিরের গানের অপর দুই বিখ্যাত শিল্পী। রাজশাহী অঞ্চলে মাদার পিরের গানের বিখ্যাত গায়েন হলেন—পুঠিয়া থানার তারাপুর গ্রামের আমজাদ হোসেন এবং সাতবাড়িয়া গ্রামের গাফ্ফার। এর বাইরে সারাদেশে মাদার পিরের গানের বহু আঙ্গিকের পরিবেশনরীতি বর্তমান রয়েছে। কুষ্টিয়া, রাজশাহী, নাটোর, মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা অঞ্চলে *মাদার পিরের গান* ও মাদার বাঁশের জারি প্রচলিত রয়েছে।

১০.৩:২ মাদারপীরের কৃত্যানুষ্ঠান : মাদার বাঁশের জারি

মুসলমানদের লৌকিক পির মাদারের মাহাত্ম্য প্রচারের লক্ষে বিভিন্ন ধরনের নাচ, গান ও পালা পরিবেশনের যে ধারা বাংলাদেশে প্রচলিত রয়েছে তার মধ্যে মাদার বাঁশের জারি অবশ্য উল্লেখযোগ্য। মানিকগঞ্জের বিখ্যাত লোকশিল্পী সাইদুর রহমান বয়াতী বলেন—মাদার কথাটির অর্থ দমের কর্তা। আবার আদিতে লোকায়ত মুসলমানদের এই পির মাদার গাছে রক্ষিত ছিলেন বলে লোকবিশ্বাস রয়েছে।

মাদার বাঁশের জারির পরিচালক হচ্ছে এই গানের বয়াতী। সাধারণত পৌষসংক্রান্তিতে বয়াতী ও মাদারী ফকিরের নেতৃত্বে গ্রামের সেরা বাঁশের ঝাড়ে ঢুকে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গানের সঙ্গে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এক কোপে একটি বাঁশ (মাকড়া বাঁশ) কাটা হয়। তারপর সেই বাঁশটি নিয়ে যাওয়া হয় নদীর পাড়ে। নদীতে নামিয়ে বাঁশটিকে স্নান করানো হয় এবং তেলাই করে বা তেল মালিশ করে চুল, কাপড় পরিয়ে দেওয়া হয়। এবার তেলাই বাঁশটি নিয়ে টানা সাতদিনের জন্য শুরু হয় গান-নাচের ভেতর দিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ। এই সাতদিন বয়াতী ও দোহারদের হাত থেকে মাদার বাঁশটিকে মাটি স্পর্শ করতে দেওয়া হয়

Dhaka University Institutional Repository

না। বয়াতী ও দোহারগণ মাদার বাঁশের জারি গাওয়ার সময় মাদার বাঁশটিকে উচ্চে তুলে ধরে রাখে এবং যখন তারা বিশ্রামে যায় তখন বাঁশটিকে মাচার উপরে তুলে রাখে।

টানা সাতদিন সাতরাত বাঁশটিকে নিয়ে বয়াতীর নেতৃত্বে একদল দোহার বাড়ি বাড়ি ঢুকে নৃত্য সহযোগে এই গান করে থাকে। মাদার বাঁশের জারির নাচ অনেকটা মহররমের নাচের মতো। এক্ষেত্রে ভিন্নতা যা থাকে তা হচ্ছে মাদার বাঁশের জারিগানের নাচে মহররমের মতো বুকে-পিঠে আঘাত করা কোনো প্রকার আহাজারি থাকে না। সাধারণত মাদার বাঁশের জারির জন্য বাঁশ নিয়ে একটি বাড়িতে ঢোকার আগে বয়াতী 'গাজী মাদার–শাহ মাদার।' বলে ধ্বনি তোলেন। আর দোহারগণ সে ধ্বনির সাথে উচ্চারণ করেন–'দম দম' ধ্বনি। তিন তিনবার এমন দমের ধ্বনি দেবার পর বয়াতী ও দোহারগণ বাড়িতে ঢোকেন। তারা বাড়িতে ঢুকতেই বাড়িওয়ালা পানির ছিটা দিয়ে মাদার বাঁশের জারির জন্য উঠান পবিত্র করে দেন। উঠান পবিত্র করা হলে বয়াতী সুরে টান দিয়ে মাদার পিরের জারি-কাহিনির গান শুরু করেন। সাথে সাথে তার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে দোহারগণ নেচে নেচে ধুয়া গাইতে থাকেন। এক একটা বাড়ির উঠানে মাদার পিরের জীবনের অলৌকিক ঘটনার এক একটা অংশ গানের সঙ্গে নেচে অভিনয় করা হয়। অভিনয় শেষে বাড়ির মালিক টাকা-পয়সা কিংবা চাল-ডালের বকশিস প্রদান করলে বয়াতী ও দোহারগণ অন্য বাড়ির দিকে রওনা দেন। এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি যাবার আগে বয়াতী ও দোহারগণ সাধারণত গেয়ে থাকেন–'এমনও মাদারমুণি যে বাড়িতে যায়। কুলাভরা ধান সিন্দুক ধানদুব্বা পায়। মাদারমুণির জারি শুনে দিল করিবে সাফ। আড়াই দিনের গুনা আল্লাহ তারে করে মাপ ॥'

এরপর দমের ধ্বনি দিয়ে তারা এক বাড়ির জারি শেষ করে অন্য বাড়িতে যায় আবারও দমের ধ্বনি দিয়ে। সাধারণত মাদার বাঁশের জারির জন্য বাঁশ নিয়ে একটি বাড়িতে ঢোকার আগে বয়াতী 'গাজী মাদার–শাহ মাদার।' বলে ধ্বনি তোলেন। আর দোহারগণ সে ধ্বনির সাথে উচ্চারণ করেন–'দম দম' ধ্বনি। তিন তিনবার এমন দমের ধ্বনি দেবার পর বয়াতী ও দোহারগণ বাড়িতে ঢোকেন। তারা বাড়িতে ঢুকতেই বাড়িওয়ালা পানির ছিটা দিয়ে মাদার বাঁশের জারির জন্য উঠান পবিত্র করে দেন। উঠান পবিত্র করা হলে বয়াতী সুরে টান দিয়ে মাদার পিরের জারি-কাহিনির গান শুরু করেন। সাথে সাথে তার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে দোহারগণ নেচে নেচে ধুয়া গাইতে থাকেন। এক একটা বাড়ির উঠানে মাদার পিরের জীবনের অলৌকিক ঘটনার এক একটা অংশ গানের সঙ্গে নেচে অভিনয় করা হয়। অভিনয় শেষে বাড়ির মালিক টাকা-পয়সা কিংবা চাল-ডালের বকশিস প্রদান করলে বয়াতী ও দোহারগণ অন্য বাড়ির দিকে রওনা দেন।

বাংলাদেশে মাদার বাঁশের জারির জৌলুস কিছুটা ম্লান হয়ে গেলেও এখনও নাটোর, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, কেরানিগঞ্জ, কুষ্টিয়া, নেত্রকোনাসহ আরো কয়েকটি অঞ্চলে মাদারের বাঁশ তোলা ও মাদার বাঁশের জারি প্রচলিত আছে।[৭২]

১০.৪ একদিল পিরের গান ও একদিল পির

বাংলাদেশের প্রচলিত কাল্পনিক পিরদের মধ্যে একদিল পিরেরও একটি স্থান রয়েছে। এই পিরের মাহাত্ম্য-প্রকাশক পরিবেশনা কোথাও 'একদিল পিরের গান', কোথাওবা 'একদিলা' নামে পরিচিতি পেয়েছে। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা পুস্তকে এই পির সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে, গ্রামের মানুষের কাছে এই পির অন্যান্য মুসলমান পিরদের মতো প্রায় সমানভাবে পূজিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের টাঙ্গাইল, কুষ্টিয়া, মানিকগঞ্জ প্রভৃতি জেলাতে একদিল পিরের গানের সন্ধান পাওয়া যায়।

একদিল পিরের প্রচলিত আখ্যান থেকে জানা যায়—শাহ নীল নামে নিঃসন্তান বাদশা ছিল। তাঁর স্ত্রী আশেক নূরী সন্তানের আশায় সব সময় কান্নাকাটি করতো। একদিন তাঁর কাঁদনে জিবরাইল ফেরেশতা আসে এবং বলে যায়—কান্নাকাটির বদলে ১২ বছর নামাজ-রোজা করলে তাঁর সন্তান হবে। জিবরাইলের কথা শুনে আশেক নূরী এবার নামাজ-রোজা শুরু করে। বারো বছর চলে যায়। বারো বছর পর জিবরাইল এসে আশেক নূরীকে আরো বারো বছর এবাদত করতে বলে। আশেক নূরী আবারও তাই করে। আরো বারো বছর চলে যায়। এবার আবারও জিবরাইল এসে তাকে আরো বারো বছর এবাদত করতে বলে।

আশেক নূরী বলে—'বারো বারো চব্বিশ বছর এবাদত করেছি আমি। আমাকে আরো বারো বছর এবাদত করতে হয় তো করবো।' এইভাবে আশেক নূরীর এবাদত ৩৬ বছর পূর্ণ হয়। এবার জিবরাইল আল্লাহর কাছে অনুমতি নিয়ে আশেক নূরীর জন্য বেহেস্ত থেকে একটি ফুল নিয়ে আসে।

ফুলটা সে আশেক নূরীর হাতে দিয়ে বলে—'এই নাও স্বর্গেও ফুল। এই ফুল পবিত্র শরীরে খেলে একটা সন্তান জন্ম নেবে। তবে, শর্ত হচ্ছে—সন্তানের জন্ম হলে আড়াই দিনের মাথায় একজন গরীবের ঘরে সেই সন্তানকে দিয়ে আসতে হবে।' সেই ফুল খেয়েই আশেক নূরীর গর্ভে একদিল পিরের জন্ম হয়। কিন্তু জিবরাইলের কথা অনুযায়ী একদিল পিরের বয়স যখন আড়াই দিন সেই সময় একদিল পিরকে দূরের কোনো এক গরিবের বাড়িতে দিয়ে আসে এবং সেখানেই সে বড় হয়।

একদিল পিরের আশীর্বাদে গরিবের অবস্থা ভালো হয়ে যায়। কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা অঞ্চলে প্রচলিত একদিল পিরের গানের এই পালার সঙ্গে যুক্ত থাকে আরো ২টি পালা, যথা—রঞ্জনা পালা ও নবীর মেরাজ পালা।[৭৩]

১১. খ্রিষ্টীয় ধর্মপ্রবর্তক ও ধর্মপ্রচারকদের জীবন-ইতিহাস ও তাঁদের মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান

বাংলাদেশে ইসলামের মতো খ্রিষ্টান ধর্মও বহিরাগত ধর্ম। খুব সম্ভবত ষোড়শ শতকে পর্তুগিজদের মাধ্যমে এদেশে এই ধর্মমত প্রথম প্রচারিত হয়। পরবর্তী দু'শ বছর প্রধানত দু'টি রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় জেশিট ও অগাস্টিনিয়ানদের মাধ্যমে এর প্রচার কাজ চলে। তবে, বাংলায় খ্রিষ্টধর্মীয় কর্মকাণ্ডের প্রধান ভূমিকা পালন করে অগাস্টিনিয়ানরা। তারা ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে হুগলিতে একটি গির্জা স্থাপন করে এবং সেখান থেকে ঢাকাসহ বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করে।[৭৪]

পর্তুগিজরা আরাকানরাজের সহায়তায় ষোড়শ শতকে চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করে। অগাস্টিনিয়ানরা সেখানে ১৬২১ খ্রিষ্টাব্দে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে এবং গাঙ্গেয় ব-দ্বীপে দস্যুতাকালে ধৃত কয়েক হাজার লোককে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষা দেয়। পরে সপ্তদশ শতকে নগরী তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। এর আগে ভূষণার (যশোর) রাজপুত্র খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে অ্যান্টেনিও ডি রোজারিও নাম গ্রহণ করেন এবং প্রধানত নিম্নবর্ণের ২০,০০০ হিন্দুকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন।[৭৫]

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটির উইলিয়াম কেরী এদেশে আসার পর ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে প্রটেস্টানদের কর্মকাণ্ড চলতে থাকে। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে কেরীর শ্রীরামপুরের ডেনিশ বসতিতে জগুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ডর যোগদান করেন। শ্রীরামপুরের এই পাদ্রি ত্রয়ী খ্রিষ্টধর্ম প্রচারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তাঁরা প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন, যার পাঠ্যসূচিতে আধুনিক বিজ্ঞান, ভূগোল ও ইতিহাসের প্রাথমিক পাঠ অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁরা এসব স্কুলের জন্য বাংলায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও নিজেদের প্রেস থেকে সেসব প্রকাশ করেন।...বাংলা ভাষার উন্নয়নে অভিধান, ব্যাকরণ, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশে তাদের অবদানের কথা অবশ্য গুরুত্বের দাবি রাখে।[৭৬]

১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ব্যাপ্টিস্টরা ঢাকা-চট্টগ্রামসহ সারা বাংলায় মিশন স্থাপন করেন। তখন গণধর্মান্তর ছিল একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার; তবে ব্যতিক্রমী একটি ঘটনা ঘটে উনিশ শতকের তিরিশের দশকের শেষ দিকে। অর্থনৈতিক ও পারিপার্শ্বিক সমস্যায় আক্রান্ত কৃষ্ণনগর অঞ্চলের কর্তাভজা সম্প্রদায়ের লোকেরা পাদ্রিদের প্রচারিত খ্রিষ্টধর্মে সহজেই আকৃষ্ট হন। আসলে, ১৮৩৮-৩৯ খ্রিষ্টাব্দের দিকে কৃষ্ণনগর জেলার (চার্চ মিশনারি সোসাইটির আবাসস্থল) জলঙ্গি নদীর এক বন্যায় আক্রান্ত হলে প্রায় ৩,০০০ কর্তাভজ স্বেচ্ছায় খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। একই সময়ে ১৮৪০-এর দশকে বরিশাল ও যশোর (ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটির আবাসস্থল) থেকে বৃহৎ সংখ্যক কর্তাভজ খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় এটা ছিল খ্রিষ্টান ধর্মের প্রতি সাধারণ জনতার পরিবর্তনের প্রথম ও সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা। লক্ষ করার বিষয় এই যে, চার্চ ও ব্যাপ্টিস্ট মিশনসমূহের সর্বাধিক ধর্মান্তরিত জনসাধারণ এসেছেন কর্তাভজদের (ঈশ্বর পূজারী) মধ্য থেকে, যারা 'নিম্নতম' পদমর্যাদার হিন্দু, যেমন—চণ্ডাল ও নমঃশূদ্রদের মাঝে গড়ে উঠতে থাকা একটি হিন্দু, সমতাবাদী ধর্মসম্প্রদায়।[৭৭]

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারত বিভাগের পর ঢাকা রোমান ক্যাথলিক আর্চবিশপ এবং অ্যাংগলিকান বিশপের কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হয়। এরপর ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হয় তখন অ্যাংগলিকান ও যাজক সম্প্রদায়ের সম্মিলনে চার্চ অব বাংলাদেশ গঠিত হয়। ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে এর দুজন বিশপ এবং প্রায় ১৪,০০০ জন সদস্য ছিল। বাংলাদেশে ব্যাপ্টিস্টদের সংখ্যা মোট ১,৩৬,০০০ জন। বাংলাদেশে বৃহত্তম খ্রিষ্টান সম্প্রদায় হচ্ছে রোমান ক্যাথলিক, যাদের সংখ্যা বাংলাদেশে মোট পাঁচ লক্ষ খ্রিষ্টান জনসংখ্যার মধ্যে দুই লাখেরও বেশি।[৭৮]

প্রথম থেকেই খ্রিষ্টধর্ম প্রচারকদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করে বাংলার মানবগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধন করা। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে, খ্রিষ্টধর্ম প্রচারকগণ নিজেরাই বাংলার মূল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন বলে তাদের সে উদ্দেশ্য অদ্যাবধি তেমনভাবে সার্থক হয়ে উঠেনি। একই কারণে বাংলার ভাব-রসে নিমগ্ন ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টানদের সাংস্কৃতিক পরিচয় মূলত এদেশের ঐতিহ্যবাহী ধারাই সম্প্রসারণ, ধর্মান্তরিত হবার ফলে যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীচৈতন্য ইত্যাদি দেবতা-অবতারের পরিবর্তে ঈশ্বরপুত্র যিশু বা তাঁর ধর্ম প্রচারকদের নিয়ে নামগান ও নাট্যপরিবেশন করে থাকেন। খ্রিষ্টান ধর্ম প্রবর্তকদের মাহাত্ম্য-প্রকাশক নাট্যপালার হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন গানের উপরে সুর পরিচয় হিসেবে 'নিমাই', 'গৌর নিতাই এসো আমার', 'কৃষ্ণ যায় রে কুঞ্জবনে মন জানি কেমন করে' ইত্যাদি উল্লেখ দেখে একথা অনুমান করতে বাধা থাকে না যে, খ্রিষ্টানদের নাট্যঐতিহ্য মূলত এদেশীয় হিন্দু-বৈষ্ণবদের বিভিন্ন গান ও নাটকের আসর থেকেই উৎসারিত।[৭৯]

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাস থেকেও জানা যায়, আজ থেকে প্রায় ৩০০ বছর আগে হিন্দুধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান আন্তইন দা রোজারিও হিন্দুদের মধ্যে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারক সাধু আন্তনির জীবন মাহাত্ম্য-প্রকাশক পালা রচনা পরিবেশন করতেন।৪৪ এছাড়া, বৃহত্তর বরিশাল জেলার খ্রিষ্টানদের মাঝে প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা 'রামুর পালা'র মূল রচয়িতা হিসেবে হিন্দুধর্ম অনুসারী কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তীর নাম জানা যায়। এই কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী গত শতকের প্রথম দিকে বরিশাল অঞ্চলে হিন্দুধর্মীয় পূজা উপলক্ষে কীর্তন পরিবেশন করতে এসে উক্ত এলাকায় বসবাসরত খ্রিষ্টানদের সংস্পর্শে এসে জানতে পারেন—খ্রিষ্টানদের মধ্যে নিজস্ব কোনো সাংস্কৃতিক পরিচয় নেই। অথচ খ্রিষ্টানদের অনেকেই গান-বাজনার সমজদার। তিনি উদ্যোগী হয়ে 'মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিষ্ট' নামে যিশু খ্রিস্টের জীবনী নির্ভর একটি খ্রিষ্টীয় পালা রচনা করেন এবং পালাটি খ্রিষ্টান ধর্মভক্ত রামুয়েল গোমেজকে শিক্ষা দেন।[৮০] পরে খ্রিষ্টানদের মধ্যে সেই পালাটি নিয়মিতভাবে রামুয়েল গোমেজ পরিবেশন করতে থাকেন। অল্পদিনের মধ্যে পালাটি উক্ত এলাকায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং রামুয়েল গোমেজের নাম অনুসারে এর পরিবেশনরীতির নাম হয়ে যায় 'রামুর পালা'। জানা যায়, যিশুর জীবনের আরো দু'একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা শিক্ষাকে উপজীব্য করে একই সময়ে আরো দু'একটা পালা পরিবেশিত হয়ে থাকলেও শুধু রামুর পালাই একটি উত্তম পদাবলিতে রূপ নেয়। বাংলাদেশে খ্রিষ্টীয় পদাবলির যতোগুলোর সন্ধান পাওয়া যায়, তার মধ্যে এখনও এই পদাবলিখানা উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। বর্তমানে বরিশালসহ ঢাকা অঞ্চলে রামুর পালার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ন রয়েছে।

বাংলাদেশের খ্রিষ্টানদের নাট্য পরিবেশনা আখ্যানের ভক্তিবাদী উপস্থাপনে ও আঙ্গিকের দুটি ক্ষেত্রেই বৈষ্ণবদের পদাবলি কীর্তন, কৃষ্ণলীলা, কৃষ্ণযাত্রা ইত্যাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা প্রত্যক্ষ করা যায়। অবস্থানগতভাবেও হিন্দু-বৈষ্ণব প্রধান এলাকা বরিশাল, ঢাকা, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, মেহেরপুর প্রভৃতি অঞ্চলে খ্রিষ্টীয় রামুর পালা, সাধু অন্তনীর পালা, মুক্তিদাতা যিশু বা যিশুর যাতনা ভোগের পালা, সাধ্বী আগ্নেশ, বৈঠকী গান প্রভৃতি নাট্যপালা প্রচলিত। এ পর্যায়ে খ্রিষ্টান ধর্মীয় নাট্যপালাসমূহের কাহিনি-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হল।

১১.১ রামুর পালা

এটি মূলত একখানা খ্রিষ্টীয় পদাবলি কীর্তন। যিশুর প্রায় সমগ্র জীবন এ কীর্তনে স্থান পেয়েছে। যিশুর জীবনের কোন বিশেষ ঘটনা এ কীর্তনে স্থান পায়নি। এর পথিকৃৎ গায়ক র‍্যামুয়েল গোমেজ রামু এই কীর্তন একই আসরে একই সময়ে সম্পূর্ণটা খুব কমই গাইতেন। পরিবেশনের সুবিধার্থে তিনি খণ্ড খণ্ড বা পালা করে এ কীর্তন গাইতেন, যা এখনও করা হয়। তাই এটি খ্রিষ্টীয় পালা নামেই সমধিক পরিচিতি পায়।

শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুসারে কারো জীবনের সামগ্রিক ঘটনা নিয়ে পদাবলি কীর্তন রচিত হয়। সে বিবেচনায় রামুর পালায় যেহেতু যিশুর জীবনের প্রায় সমগ্র ঘটনা স্থান পেয়েছে সেহেতু একে খ্রিষ্টীয় পদাবলি কীর্তন বলে সনাক্ত করা যায়। যদিও এতে যিশুর স্বর্গারোহণ সম্পর্কে কয়েকটি কথা ছাড়া কোনো পূর্ণাঙ্গ পালা বা পর্ব রচিত হয়নি, তারপরও রামুর পালাতে যিশুর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমগ্র কাহিনি সুবিন্যস্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাই একে পরিপূর্ণ একটি খ্রিষ্টীয় পদাবলি কীর্তন হিসেবে উল্লেখ করতে গবেষকের কোনো দ্বিধা থাকে না।[৮১]

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণত ১১ টি পর্বে রামুর পালা আসরে পরিবেশিত হয়ে থাকে। পর্বগুলো হচ্ছে—এই কাহিনিতে ১. যিশুর জন্ম পালা, ২. যিশুর কর্ম জীবন আরম্ভ, ৩. লাজারের জীবন লাভ, ৪. যাতনা ভোগ আরম্ভ, ৫. যুদাসের বিলাপ, ৬. বিচার পালা, ৭. ক্রুশের পথের কিছু অংশ পালা, ৮. মারিয়ার বিলাপ পালা, ৯. যিশুর ক্রুশীয় মৃত্যু পালা, ১০. কবর দান পালা এবং ১১. যিশুর পুনরুত্থান।[৮২]

১১.২ মুক্তিদাতা যিশু বা যিশুর যাতনা ভোগের পালা

গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানায় বসবাসরত খ্রিষ্টানদের মাঝে প্রচলিত এই পালার মূল রচয়িতা ও পালাকার হচ্ছেন পিটার ডমিনিক রোজারিও। এই পালাটি শুরু হয় বন্দনাগীতের মাধ্যমে। যিশু চল্লিশটি দিবারাত্রি মরুপ্রান্তরে অনাহারে অনিদ্রায় ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। ক্ষুধার্ত পরিশ্রান্ত যিশুকে পরীক্ষার জন্য শয়তান আবির্ভূত হয়ে বলে—'ওহে যিশু তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হয়ে থাকো তবে কেন ক্ষুধায় না খেয়ে মরো! তুমি যদি সত্যি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে এই পাথরগুলোকে রুটিতে পরিণত করে আহার করো।'

উত্তরে যিশু থাকে জানান—'দেখো, মানুষ শুধু রুটিতেই বেঁচে থাকে না, ঈশ্বরের বাক্যতেও মানুষ বেঁচে থাকে।'

এমন উত্তর পেয়ে শয়তান এবার প্রসঙ্গ বদলে বলে—'তাহলে চলো ওই মন্দিরের চূড়াতে যাই। আর মন্দিরের চূড়া থেকে তুমি লাফিয়ে পড়বে। যদি তুমি সত্যি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে শাস্ত্রমতে স্বর্গের দেবদূতগণ তোমাকে ধরবে যেন কোনো শরীরে কোনো আঘাত লাগে।'

এবারে যিশু বললেন—'ওহে শয়তান শাস্ত্রে তো একথাও লেখা আছে যে, তোমরা তোমাদের প্রভু পরমেশ্বরকে কখনো পরীক্ষা করো না।'

শয়তান বলল—'তবে চলো পর্বতের চূড়ায়।'

শয়তান একথা বলে যিশুকে সঙ্গে করে পর্বতের চূড়ায় গিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে বলল—'দেখো পৃথিবীটা কী চৎকার! তুমি যদি আমাকে প্রণাম করো তাহলে তোমাকে পৃথিবীর সব কিছু দান করে দেবো।'

শয়তানের এমন প্রস্তাবে যিশু রেগে গিয়ে বললেন—'ওরে দূরাত্মা শয়তান, শাস্ত্রে লেখা আছে, তুমি কেবল তোমার পরমেশ্বরকেই পূজা করবে। দূর হয়ে যা ওরে শয়তান।' অগত্যা শয়তান দূর হয়ে যায়। আর স্বর্গের দূতগণ এসে যিশুর পূজা করতে শুরু করে। এরপর যিশু তাঁর প্রিয় শিষ্য পিতর ও যোহনের কাছে নিস্তারপর্বের শেষ ভোজনের আগ্রহ প্রকাশ করেন। পিতর ও যোহন তখন যিশুর আজ্ঞা মতো জেরুজালেম নগরে একটি সাধারণ কুটিরে ভোজনের আয়োজন করেন।

ভোজনের টেবিলে বসার আগে যিশু স্পষ্টভাবে বলেন—'আজি আমার শেষ ভোজন তোমাদেরই সনে। আর না করিব ভোজন এই ত্রিভুবনে।'

Dhaka University Institutional Repository

শিষ্যগণ সকলে ভোজনের জন্যে টেবিলে বসে গেলে যিশু নিজের গায়ের আলখেল্লা খুলে কোমরে একটি তোয়ালে বন্ধন করলেন এবং একটি পাত্রে পানি নিয়ে পিতরের পায়ের কাছে বসে বললেন–'শিষ্যগণ, তোমাদের পা বাড়িয়ে দাও। আজ আমি তোমাদের পা ধোয়ায়ে দেবো।'

পিতর বললেন–'গুরু এ হয় না। গুরু হয়ে শিষ্যের পা ধরা চলে না। আমি আমার পা আপনাকে কিছুতে স্পর্শ করতে দিতে পারি না।'

যিশু বলেন–'আমি যা করতে চাই তা আমাকে করতে দাও পিতর। পরে বুঝবে আমার এ কার্যের কারণ।' পিতর তবুও রাজি হতে চান না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যিশুর যুক্তির কাছে পরাস্ত হয়ে শিষ্যগণ সকলে তাকে পা ধুতে দেন। যিশু একে একে সকল শিষ্যের পা ধুয়ে দিয়ে বলেন–'শিষ্যগণ, আমি তোমাদের প্রতি কী করলাম তা কী তোমরা বুঝতে পেরেছো?'

পিতর বললেন–'গুরু, আপনার মহিমা আমরা কিছু বুঝতে পারলাম না।'

যিশু বললেন–'তোমরা আমাকে গুরু ও প্রভু বলে সম্মান করো। কিন্তু গুরু হয়ে আমি যা করলাম তোমরাও পরস্পর তাই করো। জেনে রাখো, যে নিজেকে নত করে সে আসলে নিজে উন্নত করে।'

তারপর যিশু মূল ভোজনপর্বে প্রবেশ করে আপন শরীরের রক্ত শিষ্যদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন–'আমি সত্য বলছি তোমাদের আমার শরীরের এই রক্ত সেবন করার পরও তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে শত্রু হস্তে ধরিয়ে দেবে।'

একথা শুনে শিষ্য পিতর ও যোহন উদ্বিগ্ন হয়ে বলেন–'প্রভু কে সেই পাষণ্ড?'

'কে সেই পামর?'

এমনকি শিষ্য যুদাস বললেন–'গুরু আমি কী সেই ব্যক্তি? যে আপনাকে শত্রু হাতে ধরিয়ে দেবে?'

যিশু বলেন–'শিষ্যগণ, যে আমাকে শত্রু হাতে সমর্পণ করবে সে ব্যক্তির জন্ম না হাওয়াই ভালে ছিল।' একথা বলে যিশু অন্তর্হিত হন লোকচক্ষুর আড়ালে।

এদিকে মহাযাজক কাইফার সভাকক্ষে চলতে থাকে যিশুকে হত্যার পরিকল্পনা। ম্যালকম নামক এক সৈন্য যিশুর শিষ্য যুদাসকে টাকার লোভ দেখিয়ে যিশুকে আটক করার কৌশল বের করে। এক সময় যুদাসের সহযোগিতায় ম্যালকম ও তার সৈন্যরা যিশুকে বন্দি করে। যিশু বন্দি হবার পর যুদাসের বোধোদয় হয়।

যিশুকে ধরিয়ে দেবার বিনিময়ে পাওয়া টাকার দিকে তাকিয়ে যুদাস চিৎকার দিয়ে কাইফার কাছে গিয়ে বলেন–'কাইফা তুমি তোমার টাকা ফিরিয়ে নাও। আমার প্রভুকে মুক্তি দাও।' কিন্তু কাইফা তার কোনো কথা শোনে না। শুরু হয় বন্দি যিশুর বিচার। যাজক কাইফার সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সাজানো সেই বিচারে যিশুকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। অত্যাচারে অপমানে যিশুর শরীর ভূলুণ্ঠিত করা হয়। কিন্তু তারপরও যিশুর শির থাকে উন্নত।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর কাইফার ভবন থেকে বিচারে জন্য যিশুকে স্থানান্তরিত করা হয় পিলাত ভবনে। সেখানে পিলাতের নিকট থেকে হেরোদ রাজার কাছে যিশুকে দোষী সাব্যস্ত করতে নিয়ে গিয়ে সৈন্যরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। সৈন্যদের মিথ্যা সাক্ষীতে ঈশ্বরপুত্র যিশু আবার অপরাধী সাব্যস্ত হয়। শাস্তি হিসেবে যিশুর কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয় ভারি ক্রুশ। তেত্রিশ বছরের যিশু ঐ ভারি ক্রুশ নিয়ে কালভেরীর অমসৃণ পথে গমন করে। রক্তাক্ত যিশুকে দেখতে জনগণের ভিড় ঠেলে মা মারিয়াম ও মেরী ম্যাগডেলিন। মা মারিয়াম পুত্রের দুর্দশা দেখে সজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। কালভেরীর চূড়ায় যিশুকে দাঁড় করিয়ে সৈন্যরা তাঁর শরীরে ক্রুশ বিদ্ধ করে। মৃত্যু হল যিশুর। মৃত্যুর তৃতীয় দিনে সৈন্যরা ইহুদি সমাজে যিশুর পুনরুত্থানের কথা প্রচার করে। ইহুদি সমাজ তাদের ভুল বুঝতে পারে এবং মানুষেরা মনেপ্রাণে ঈশ্বরপুত্র যিশুর মহান বাণী গ্রহণ করে।[৮৩]

১১.৩ সাধ্বী আগ্নেশের পালা

যিশু খ্রিস্টের মৃত্যুর পর খ্রিষ্টধর্ম প্রচারক ও বিশ্বাসীদের জীবনে সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। রোমনগরে যখন খ্রিষ্টধর্মের গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যাচ্ছিল তখন রোম সম্রাটরা নিজেদের অস্তিত্ব বিলীনের সংকটজনক মুহূর্তে নানাদিক অত্যাচারে লিপ্ত হয়ে ওঠে। সামাজিক সকল সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে খ্রিষ্ট বিশ্বাসীদের। শত শত মানুষ অত্যাচারীদের দ্বারা ক্লিষ্ট হয়। এই শাসক শ্রেণির হাতে শোষিত এক উজ্জ্বল নারী চরিত্রের নাম আগ্নেশ। শাসক আম্পাসিউসের ঘাতক আগ্নেশকে হত্যা করে। জীবনের শেষ পাদে দাঁড়িয়ে আগ্নেশ মধুর মৃত্যুকে গ্রহণ করে নিজের আত্মাকে যিশুর সকাশে সপে দেন। শেষ দৃশ্যে আগ্নেশের পিতা এসে কন্যার রক্তাক্ত দেহটা আগলে ধরে কাঁদতে থাকেন।[৮৪]

১১.৪ সাধু আন্তনির পালা

এগারো শতকে পর্তুগালে সাধু আন্তনির জন্ম হয়। পর্তুগালে শত শত বছর ধরে খ্রিষ্টান ধর্মাচারী জনগণ সুখে শান্তিতে ধর্মীয় কার্যাদি করছিলেন। বিধর্মীয় নানা জাতীয় গোষ্ঠীর প্রবল আক্রমণে খ্রিষ্টান জাতি জর্জরিত হয়। অত্যাচারে অত্যাচারে খ্রিষ্টান জাতির মহাদুর্দশার কাল আসে। সেই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সাধু আন্তনির আবির্ভাব। শিশুকাল থেকেই আন্তনি মহৎ গুণের অধিকারী হন। বাকমাধুর্য দিয়ে মানুষের মন জয় করবার অপূর্ব ক্ষমতা ছিল তার। এক সময় সে মহাসাধু ফ্রান্সিস আসিসির শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। সাধু ফ্রান্সিস পরমাত্ম তত্ত্ববিদ্যা আলোচনা করার জন্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে আন্তনি যোগ দান করেন। তারপর থেকে তিনি জ্ঞান পিপাসু মানুষের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করতে থাকেন। ১২১৫ খ্রিষ্টাব্দে ইতালির টুলুস নগরে ধর্ম বিপ্লব ঘটলো, আন্তনি সেখানে গেলেন। সাধু আন্তনির আহ্বানে সকল জ্ঞানীগুণী মানুষ যোদ্ধা হয়ে ধর্মের পক্ষে লড়াই করেন। চারিদিকে আন্তনির গুণগান ধ্বনিত হতে থাকলো। ভক্তবৃন্দ আন্তনির মধুরবাক্য বিমোহিত হয়ে মানব কল্যাণে খ্রিষ্টধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে একত্রিত হন। বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে আন্তনি মানুষের সেবা-সহায়তা করতে থাকেন। ইতালি স্বাধীন হবার পর নাগরিকরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হলে প্রজাতন্ত্রের আইন-কানুন বিপর্যস্ত হয়ে দেশ রসাতলে চলে যাচ্ছিল, আন্তনির মানব জাতির পরিত্রাতা হয়ে আবির্ভূত হয়ে সেখানে শান্তি ফিরিয়ে আনেন। দ্বিতীয়

Dhaka University Institutional Repository

ফেডারিকের শাসন আমলে অত্যাচারিত খ্রিষ্টানদের মুক্তিতে আন্তনি অবদান রাখেন। ১২৩১ খ্রিষ্টাব্দে আন্তনির মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পর মৃত পাঁচজন অলৌকিকভাবে জীবন ফিরে পান।[৮৫]

১১.৫ বৈঠকী গান

যিশু খ্রিস্টের জন্ম, বেড়ে ওঠা, কর্ম ও ধর্ম জীবন ইত্যাদি সুর, ছন্দ ও গীতের আশ্রয়ে বৈঠকী গানের আসরে পরিবেশন করা হয়ে থাকে। এ ধরনের আসরের শুরুতে যে বন্দনা গীত হয় তাতে সাধারণত পরমেশ্বরের সৃষ্টির সৌন্দর্য বর্ণনা করে পরমেশ্বরের গুণগান প্রকাশ করা হয়। বন্দনা শেষে বৈঠকী গানের আসরের জগৎ সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কিত দুটি গানে জানানো হয়, নিরাকার ঈশ্বর সম্পূর্ণ নিজস্ব পরিকল্পনায় এই ধরাধাম সৃজন করেছেন; যার মধ্যে জীব ও জড়ের যথাযথ ভারসাম্য বিদ্যমান রয়েছে। আর আদি পিতা-মাতা আদম-হাওয়ার নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের মাধ্যমেই জগৎ-সংসারের সকল লীলার শুরু। কিন্তু জগতে জীবের যাত্রা শুরুর পর যখন নানাবিধ অসংগতি, অনিয়ম, অবাধ্যতায় মানবিকতা বিপর্জিত হয়ে পড়ে তখন স্বর্গীয় দূত গ্যাব্রিয়েল এসে মারিয়ামের নিকট যিশুর জন্মবার্তা ব্যক্ত করেন।

আসলে, 'মা মারিয়ামের নিকট দূত সংবাদ' থেকে বৈঠকী গানের মূল নাট্যগীত বা আখ্যান পরিবেশনা শুরু হয়। এরপর 'শ্রী মারিয়ামের ভগ্নি দর্শন', 'শ্রী শ্রী খ্রিস্টের জন্ম', 'পূর্বদেশীয় তিন রাজার খ্রিষ্ট পূজা', 'হেরোদ কর্তৃক শিশু বধ', 'শিশুসহ যোসেফ ও মারিয়ামের পলায়ন', 'বালক যিশু হারান', 'যিশুর প্রচার আরম্ভ বা কান্না নগরে বিবাহের ভোজ', 'শয়তান দ্বারা যিশু পরীক্ষিত', 'শ্রী যোহন ব্যাপ্তিস্তার জন্ম', 'শ্রী যিশুর অগ্রদূত', 'যোহন কর্তৃক যিশুর ব্যাপ্তিস্ত', 'নায়িমবাসীর বিধবা পুত্রের জীবন দান', 'যিশু সমুদ্রে তুফান থামান', 'প্রভু যিশু রুটি বৃদ্ধি করেন', 'পাঁচখানা রুটি দিয়ে প্রভু পাঁচ হাজার লোক খাওয়ান', 'মৎস্য ধরা', 'অন্তিম বিচারের বিবরণ', 'লাজারেশের জীবন দান', 'জন্মান্ধকে চক্ষু দান', 'যিশু রাত্রি ভোজের উপকথা', 'রাজপুরুষের পুত্রের ব্যাধি নিরাময়', 'যিশুর শেষ ভোজন', 'উদ্যানে যিশুর মর্মভেদী দুঃখ', 'যিশু শত্রুর হস্তে ধৃত', 'যাজক কাইফার নিকট যিশুর বিচার', 'পিলাতের নিকট যিশুর বিচার', 'যিশুর ক্রশ বহন', 'যিশুর ক্রুশে বিদ্ধ ও মৃত্যু', 'যিশুর মৃতদেহ কবর দান', 'যিশুর পুনরুত্থান', 'পবিত্রাত্মার অবতরণ', 'যিশুর স্বর্গারোহণ' ইত্যাদি পর্বে বৈঠকী গানের আসরে যিশুর জীবন-আখ্যান পরিবেশন করা হয়।

কাহিনির সূচনায় কুমারী মা মারিয়াম এক ঐশ্বরিক আয়োজনের মধ্যে অন্তঃসত্ত্বা হন এবং তাঁর গর্ভ থেকেই বেথেলহেমের মাঠে জগতের সবচেয়ে বিতর্কিত ও আলোচিত পুরুষ যিশুর জন্মর জন্ম হয়। আর এদিকে বাথানে জন্ম নেওয়া জ্যোতির্ময় ঈশ্বরপুত্র যিশুকে হত্যার জন্য হেরোদ রাজা চক্রান্ত আটতে থাকেন। কিন্তু স্বর্গীয় দূতের সহায়তায় যিশু রক্ষা পেয়ে যান এবং দিনে দিনে শিশু যিশু বেড়ে উঠতে থাকেন। আঠারো বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগী হয়ে সন্ন্যাস জীবন শুরু করেন। দিকে দিকে ঘুরে ঘুরে মানব জাতির মধ্যে তিনি ঈশ্বরের মহিমা ছড়াতে থাকেন। অবহেলিত, অসুস্থ, অসহায় মানুষের কল্যাণে নিজের জীবন ব্যস্ত করে তোলেন। শত শত মানুষ খ্রিষ্টধর্মের ভক্ত হয়ে ওঠে। এতে ইহুদি সাম্রাজ্য তাঁর উপর ভীষণভাবে ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন চক্রান্ত করে অত্যাচারী শাসকরা যিশুকে আটক করে।

Dhaka University Institutional Repository

যাজক কাইফা ও পিলাত প্রহসনের বিচারে যিশুকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং শাস্তি হিসেবে যিশুর কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয় ভারি ক্রুশ। যিশুকে বাধ্য করা হয় সে ক্রুশ বহন করে কালভেরী পর্বতে নিয়ে যেতে। অগত্যা যিশু সে ক্রুশ বহন করে জেরুজালেমের পথ দিয়ে কালভেরী পর্বতে নিয়ে যান। ক্রুশ বিদ্ধ যিশুর রক্তাক্ত বস্ত্র দেখে যিশুর মাতা মারিয়াম সজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। অবশেষে যিশুর মৃত্যু হয়। পর্বতের গায়ে গো সমাধির পাশে যিশুর সমাধি দেওয়া হয়। মৃত্যুর তৃতীয় দিনে প্রচণ্ড ভূমিকম্পের মাধ্যমে যিশুর আত্মা স্বর্গে স্থানান্তরিত হয়। বৈঠকী গানের আসরে যিশুর জীবনাখ্যানকে এভাবেই উপস্থাপন করা হয়ে থাকে।[৮৬]

১১.৬ মেহেরপুর জেলার খ্রিষ্টীয় কীর্তন

বাংলাদেশের মেহেরপুর অঞ্চল খ্রিষ্টানদের সাংস্কৃতিক চর্চার আরেক উর্বর ক্ষেত্র। এ জেলার মুজিবনগর থানায় ধর্মান্তরিত বাঙালি খ্রিষ্টানগণ তাদের পূর্ববর্তী ধর্মমত হিন্দুধর্মীয় কীর্তন গানের আঙ্গিকে খ্রিষ্টধর্মীয় কীর্তন প্রবর্তন করেন। মেহেরপুর অঞ্চলের খ্রিষ্টানদের খ্রিষ্টধর্মীয় সেই কীর্তন সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত প্রচলিত রয়েছে।

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর থানার বল্লভপুর গ্রামে ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে রেভ. জে. সি. লিনকে নামক একজন জর্মন মিশনারী খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেন। তিনি দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর ঐ অঞ্চলে প্রচারকার্য চালান। ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে বল্লভপুরে গির্জা নির্মিত হয়। সেটা মিশনারী সোসাইটি কর্তৃক পরিচালিত হত।

১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ইতালিয়ান ফাদার অ্যান্ড সিস্টার অব চেরিটি কর্তৃক ভবেরপালায় রোমান কাথলিক মিশন স্থাপিত হয়। ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁরা ভবেরপাড়ায় একটি হাসপাতাল স্থাপন করেন। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে রেভ. ফাদার চুরিয়নি কর্তৃক একটি তিন অংশ বিশিষ্ট গির্জা রোমকরীতি (থ্রি নাভ চার্চ) নির্মিত হয়। পাদ্রীরা মিশনের আশপাশে স্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপন করেন।...একসময় লোকগণনায় এই অঞ্চলে প্রায় তিন হাজার খ্রিষ্টান ছিল।[৮৭]

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলাধীন ভবেরপাড়া ও বল্লভপুর খ্রিষ্টান পল্লিতে বসবাসরত প্রায় ১০০০ ঘর ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট গোত্রের খ্রিষ্টানদের মধ্য প্রচলিত খ্রিষ্টীয় কীর্তন সাধারণত ৬টি পালায় পরিবেশিত হয়ে থাকে। পালাগুলো হল—১. জন্মপালা, ২. লাসারকে মৃত্যু থেকে জীবিত করার পালা, ৩. অপব্যয় পুত্রের পালা, ৪. সমরীয় পালা, ৫. জীবন পালা ও ৬. মৃত্যু পালা। আসলে, ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কিত আখ্যানের মতো খ্রিষ্টান ধর্মগুরুদের আখ্যান ও চরিত্রসমূহের কেউই এদেশীয় না হলেও চরিত্রের ভাব ও অভিব্যক্তিতে এদেশীয় রীতিনীতির সম্মিলন প্রত্যক্ষ করা একেবারে দুসাধ্য নয়।

১২. বৌদ্ধধর্ম-প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ ও অন্যান্য বৌদ্ধধর্মীয় চরিত্রের মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ আদিবাসী জনগোষ্ঠী চাকমারা বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের জীবন মাহাত্ম্য-প্রকাশক নাট্যপালা 'বুদ্ধকীর্তন' পরিবেশন করেন। বুদ্ধকীর্তনের ধারায় চাকমারা গৌতম বুদ্ধের মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য একদিকে 'সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ' ও 'অঙ্গুলিমান' পালা পরিবেশন করেন; অন্যদিকে বৌদ্ধ ধর্মীয় চরিত্র 'রাজা আশোক'-এর পালা অভিনয় করেন।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে বসবাসরত অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে জনসংখ্যার দিক থেকে চাকমা নৃগোষ্ঠী বৃহত্তর। এ নৃগোষ্ঠীর ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাংলাদেশের বসবাসরত অপরাপর নৃগোষ্ঠীর চেয়ে অনেকটাই সমৃদ্ধ এবং স্বতন্ত্র। দীর্ঘদিন ধরে নিজস্ব ভাষায় এই জাতিগোষ্ঠীর সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য চর্চিত হয়ে আসছে। চাকমা নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের রয়েছে দুটি ধারা—একটি মৌখিক এবং অন্যটি লিখিত।

চাকমা নৃগোষ্ঠীর মৌখিকরীতির নিজস্ব পরিবেশনের মধ্যে 'গেংখুলী গীদ' অন্যতম। এ-রীতিতে চাকমা ভাষায় একাধিক পালা, যেমন—'রাধামন-ধনপুদি', 'সান্দবীর বারমাসী' ইত্যাদি পরিবেশিত হয়ে থাকে। মূলত একজন গায়ক কর্তৃক বর্ণনাত্মক সংগীতের আকারে চাকমাদের 'গেংখুলী গীদ'-এর পালাগুলো বিভিন্ন উৎসব-আমোদে দর্শক-শ্রোতাদের মাঝে উপস্থাপিত হয়। অপরপক্ষে চাকমাদের মধ্যে একাধিক নাট্যশিল্পী কর্তৃক আঙ্গিক-অভিনয়, নৃত্য, গীত ও সংলাপ আকারে বাংলা ভাষায় 'সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ' নামে 'বুদ্ধ কীর্তনে'র ধারায় 'বুদ্ধ নাটক'-এর এক ধরনের নাট্যপালার পরিবেশনা প্রচলিত। এ ধরনের নাট্যের পরিবেশনা সাধারণত কৃত্যমূলক এবং তা সচারাচার শ্রদ্ধার অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়।

'বুদ্ধ কীর্তন'-এর ধারায় চাকমা সমাজে সবচেয়ে জনপ্রিয় নাট্যপালা হল—'সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ'। এ পালাতে সাধারণত গৌতমবুদ্ধের জীবন-কাহিনি ও জীবন-দর্শন দর্শক-শ্রোতাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। বাংলাদেশের চাকমা নৃগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত 'বুদ্ধ কীর্তন'-এর পালা 'সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ'-এর প্রধান প্রবণতা হল, এটি মূলত এক ধরনের গীতিনাট্য। আর এর মঞ্চ ভূমি সমতলে বা কাঠের পাটাতন দিয়ে উঁচুও হতে পারে। এ ধরনের নাট্যপালার আসরের শুরুতে থাকে—বাদ্যযন্ত্রীদের সমবেত বাদ্যবাদন। তবে, মঞ্চে ওঠার আগেই এর অভিনয়শিল্পীরা চরিত্র অনুযায়ী সাজ গ্রহণ করে থাকেন। সাজ গ্রহণের জন্য কোনো স্থায়ী গ্রিনরুম বা সাজঘরের প্রয়োজন হয় না, কোনো বাড়ির উঠান বা মঞ্চের পেছনভাগ অথবা সাধারণ ব্যবহৃত কোনো ঘরে বসেই শিল্পীরা সাজ গ্রহণ করে থাকেন। অভিনয়শিল্পীদের সাজ গ্রহণের পর সমবেত বাদ্যযন্ত্র বাদনের মধ্যে পরিবেশনাস্থান ঘিরে বিভিন্ন বয়সী দর্শক-শ্রোতারা এসে বসেন। এরই মধ্যে চার-পাঁচজন কুশীলব এসে একটি প্রার্থনা গান পরিবেশন করেন। যেমন :

নম নম দয়াময় বুদ্ধ ভগবান
অহিংসা প্রচারিতে জন্ম লও অবনীতে
দয়া অবতার প্রভু কর না নিদান
জ্বরা ব্যাধি ভরা মৃত্যু দুঃখ হতে
মুক্ত কর আজি পতিত পাবন।
কর্ম রূপে ধর্ম শেখাতে জগতে
দেখাতে মানবে সুখময় নির্বাণ॥

এই প্রার্থনা গানের ভেতর দিয়ে চাকমাদের কৃত বুদ্ধ নাটকের সামগ্রিক দর্শন প্রকাশিত হয়েছে। চর্যায় বর্ণিত 'বুদ্ধ নাটকে'র স্বরূপ বিবেচনায় একথায় বারবার প্রকাশিত হয়েছে যে, 'বুদ্ধ নাটক'-এর আসরে

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণত বৌদ্ধ ধর্মের সাধনার পদ্ধতি, গৌতম বুদ্ধের জীবন আখ্যান বা তার মুখ নিঃসৃত বিভিন্ন বাণী আভিনয় আকারে নৃত্য-গীত-অভিনয় আকারে পরিবেশিত হত।

সমসাময়িক কালে প্রচলিত চাকমাদের 'সিদ্ধার্থের গ্রহত্যাগ' নাট্যপালাতে গৌতম বুদ্ধের জীবনাভিজ্ঞতা ও মানব জীবনের মুক্তির লক্ষ্যে জ্ঞান অন্বেষণে তার সংসার ত্যাগ তথা সন্ন্যাস গ্রহণের কাহিনি বর্ণিত হয়।

এই নাট্যপালার কাহিনিতে দেখা যায়—ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু ও বরুণ এসে বোধিসত্ত্বের কাছে বলেন :

> প্রভু আসিয়াছি দেবলোক থেকে জানাইতে মর্তের বার্তা। জীবগণ হিংসায় পরস্পরে ভাসে মহা দুঃখের সাগরে, মিছে সুখ আজি কোটি কোটি প্রাণী বধ করিতেছে দেবতার নামে।
>
> যাগ যজ্ঞ বিশ্বধরা প্লাবিত হইল
> ধর্ম কর্ম মনুষ্যত্ব লোকে ভুলে গেল।
> ধর্ম প্রচারিতে লোকে জ্ঞান হারাইল
> অহিংসা পরম ধর্ম লোকে ভুলে গেল
> পশুত্ব পাইল ধরা, দেবত্ব ভুলিল
> যজ্ঞ ধর্মে জীব রক্তে পৃথিবী ছাইল।
>
> প্রভু, জীব দুঃখ দূর করবার জন্য শুভ সময় উপস্থিত। আপনি এ সময়ে মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হয়ে ধরার দুঃখ দূর করুন। প্রাণীগণ জ্বরা, ব্যাধি, মৃত্যু, দুঃখ সহ্য করতে না পেরে আপনার করুণা ভিক্ষা করিতেছে।

তাদের কথার উত্তরে বোধিসত্ত্ব বলেন :

> দেবগণ, বাস্তবিক জীব দুঃখ বিমোচনের শুভ সময় উপস্থিত। কিন্তু আমি নৃসিংহ রাম ও পশুরামের মতো অস্ত্রের সাহায্যে পৃথিবী জয় করবো না। আমি কেবল ভিক্ষা দেব প্রেম, প্রেমের দ্বারাই আমি পৃথিবী জয় করবো।
>
> রাম আদি অবতারে ধনু অস্ত্র ধারন করে
> দৈত্য দানব করিল নাশন।
> আমি কভু অস্ত্র না ধরিব, প্রাণে কারে না মারিব
> প্রেমে করবো জগৎ উদ্ধার।
> প্রেমে জগৎ জয় করিব।
>
> কিন্তু দেবগণ মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হওয়ার আগে আমাকে পাঁচটি বিষয় চিন্তা করতে হবে।

কিন্তু সেই পাঁচটি বিষয়? চর্যার প্রথম পদে আছে, 'কায়া তরু বর পাঞ্চ বি ডাল/চঞ্চল চিএ পইঠ কাল।' অর্থাৎ 'শরীর গাছে পাঁচখানি ডাল/অধীর মনে ঢুকে পড়ে কাল।' চাকমাদের কৃত 'বুদ্ধ কীর্তন'-এর পূর্ণাঙ্গ নাট্যপালা 'সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ' শীর্ষক 'বুদ্ধ নাটকে'র সমকালীন আসরে বোধিসত্ত্ব সেই দেহতত্ত্বের ইঙ্গিত দিচ্ছে না তো?

Dhaka University Institutional Repository

আসলে, 'সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ' নামে চাকমাদের এই বুদ্ধ কীর্তন বা 'বুদ্ধ নাটক'-এর পরিবেশনা প্রত্যক্ষ করলে প্রতীকী অর্থে চর্যার পদে বর্ণিত দেহতত্ত্বের সাক্ষ্য মেলে। কেননা, সিদ্ধার্থ রাজপুত্র হয়ে মানবদেহের অসারতাকে প্রত্যক্ষ করে নির্বাণ তথা জ্ঞান লাভের দিকে ধাবিত হয়েছেন এবং সংসার ত্যাগের মাধ্যমে তিনি সেই গন্তব্যে পৌঁছেন। চাকমা জনগোষ্ঠীর শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে 'সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ' নাট্যপালাটি পরিবেশনের দুটি কারণ থাকতে পারে, যার একটি হল—এটি বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের পবিত্র জীবন কাহিনি, আর দ্বিতীয় কারণটি হল—কেউ তিরোধান করেন, চাকমাদের ধারণায় তার মূলত দুই ধরনের গৃহান্তর ঘটে—এক. দেহ থেকে তার আত্মার গৃহত্যাগ ঘটে, এবং দুই. স্ত্রী-পুত্র-পরিবার বেষ্টিত সংসার থেকে তার গৃহতাগ ঘটে। তাই হয়তো গৌতম বুদ্ধের গৃহত্যাগ ঘটনার সাথে 'বুদ্ধ কীর্তন' নামের এই নাট্যপালা পরিবেশনের একটি গূঢ় ও কৃত্যমূলক সম্পর্ক যুক্ত করা হয়।

চাকমাদের 'বুদ্ধ নাটক' পরিবেশনরীতির মধ্যে গীত চরিত্রের সংলাপাত্মক গানের কোনো বাণীর সাথে অর্থগত দিক থেকে প্রাচীন চর্যার বেশ কিছু পদের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করা যায়, অন্যদিকে মধ্যযুগের বাংলা বৈষ্ণব পদাবলিরও সাদৃশ্য পাওয়া যায়। তাই নিশ্চিতভাবেই বলা চলে, অনেকটাই বাঙালিদের লোকচক্ষুর আড়ালে অবাঙালি চাকমাদের মাঝে এই নাট্যধারা (বুদ্ধ নাটক) বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্যিক অভিযাত্রা চর্যা ও বৈষ্ণব গীতিকাবিতার গীতল ধারাকে ধারণ করে নবরূপে উদ্ভাসিত হয়েছে।[৮৮]

১৩. লোককথা, রূপকথা ও স্থানীয় ইতিহাস-আশ্রিত মানবীয় প্রেম-মাহাত্ম্য-প্রকাশক আখ্যান

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসমাজে প্রচলিত লোককথা, রূপকথা, উপকথা ও স্থানীয় ইতিহাস আশ্রয়ী বহু লৌকিক চরিত্রকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ঐতিহ্যবাহী নাট্যধারা পরিবেশিত হয়ে থাকে। এরমধ্যে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে 'কিচ্ছা গান' বা 'পালাগান', কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ-নাটোর-রাজশাহী-বগুড়া অঞ্চলে 'নছিমন গান' প্রচলিত রয়েছে। এছাড়া, এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত 'যাত্রা' বা 'যাত্রা গান', 'পুতুল নাচ' ইত্যাদি পরিবেশনরীতিকেও বিষয়বস্তুগত দিক থেকে ঐতিহ্যবাহী নাট্যের এই শ্রেণির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কেননা, এ দু'টি পরিবেশনরীতিতে লোককথা-রূপকথা যেমন মঞ্চস্থ হয়ে থাকে তেমনি স্থানীয় ইতিহাসের বিভিন্ন চরিত্রের জীবনী-কিংবদন্তী নির্ভর আখ্যান উপস্থাপিত হয়ে থাকে। তবে, কখনো কখনো স্থানীয় চাহিদা বা নতুনধারা সমাজ গঠনের প্রেরণায় কিংবা সমাজ বিপ্লবের তাগিদে কিছু আন্তর্জাতিক চরিত্রের জীবনীকেও যাত্রার আসরে উপস্থাপন করতে দেখা যায়। এবারে এ শ্রেণিকরণের অন্তর্ভূক্ত পরিবেশনরীতির আখ্যানবস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

১৩. ১ যাত্রা

বাংলা ভাষায় 'যাত্রা' শব্দের অর্থ গমন। এই অর্থের সাযুজ্য ধরে এসেছে 'যাত্রাগান' বা 'যাত্রাপালা'। দূর অতীতে তিথি বা নক্ষত্রযোগে কোথাও গমন অর্থে 'যাত্রা' শব্দটির প্রচলন ছিল এবং সেই যাত্রার ধরন ছিল অনেকটা শোভাযাত্রার মতো। তবে, প্রাচীনকালে নাট্যরীতি 'যাত্রাগান' বা 'যাত্রাপালা' হয়তো ছিলো না, কিন্তু গীতবহুল এক ধরনের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের প্রচলন ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

নাট্যরীতি হিসেবে 'যাত্রা'র প্রথম উপক্রম লক্ষ করা যায় মধ্যযুগে চৈতন্যদেবকৃত নাট্যাভিনয়ের মধ্যে। বৃন্দাবন দাস রচিত চৈতন্যভাগবত-এ প্রাপ্ত বর্ণনা অনুযায়ী বলা যায়, আনুমানিক পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়ির আঙিনায় চৈতন্যদেব ও তার পার্ষদদের করা লীলানাট্যের আঙ্গিকের ভেতর দিয়ে নাট্যধারা যাত্রা'র উৎপত্তির বীজ রোপন হয়েছিল মাত্র। উল্লেখ্য, চৈতন্যদেব অভিনীত সেই নাট্যের বিষয়বস্তু আহরিত হয়েছিল রাধাকৃষ্ণের লোককথা বা কৃষ্ণলীলার আখ্যানবস্তু হতে। তবে, তখন পর্যন্ত "নৃত্যগীত সংলাপযুক্ত অভিনয়কে 'যাত্রা' বলার প্রথা প্রচলিত হয় নি।'[৮৯] এমনকি চৈতন্যভাগবতের কোথাও সেই অভিনয়কে 'যাত্রা' বলা হয় নি, 'তবু পরবর্তীকালের যাত্রাগানের অভিনয়রীতির সঙ্গে বহুলাংশে সাযুজ্য থাকায় অনেকেই এই অভিনয়রীতিকে যাত্রা বলেই অভিহিত করেছেন।'[৯০]

নাট্যরীতি অর্থে যাত্রার ব্যবহার খুব বেশি দিনের নয়। আসলে, অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে 'যাত্রা' কথাটি নাট্যরীতি অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করে এবং ঊনিশ শতাব্দীতে এসে যাত্রা বিশিষ্ট শিল্পরীতি রূপে আত্মপ্রকাশ করে।[৯১] উৎপত্তির প্রথম থেকে যাত্রার আসরে সাধারণত লোককথা, ধর্মীয় পুরাণ কাহিনি ও পৌরাণিক চরিত্রের আখ্যান অভিনীত হতে থাকে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের চাহিদা অনুযায়ী যাত্রার আসরে লোককথা, রূপকথা, পুরাণকাহিনির পাশাপাশি সামাজিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক চরিত্র নির্ভর আখ্যান মঞ্চস্থ হতে শুরু করে এবং বিংশ শতাব্দীতে অনেক আন্তর্জাতিক ঘটনা ও চরিত্র বাংলাদেশের যাত্রা মঞ্চে স্থান করে নেয়। শুধু তাই নয়, এই সময় থেকে যাত্রার আসরে দু'টি স্বতন্ত্রধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যার একটি বর্ণনাত্মক গীতিনাট্যের ধারা এবং অপরটি সংলাপাত্মক চরিত্রাভিনয়ের ধারা।

গীতিনাট্য ধারার যাত্রাপালা মঞ্চায়নের পথিকৃৎ হলেন চারণ কবি মুকুন্দ দাস। তিনি বিংশ শতাব্দীর শুরুতে গীতি প্রধান যাত্রাপালার প্রচলন করেন। দেশাত্মবোধক যাত্রাপালা পরিবেশনের মাধ্যমে তিনি ব্রিটিশবিরোধী ভূমিকায় জনগণকে বিপুলভাবে উদ্দীপ্ত করেন। এছাড়া, আধুনিক চেতনা ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শের জায়গা থেকে সমাজতান্ত্রিক দর্শন ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথিকৃৎ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের জীবন ও কর্ম নির্ভর যাত্রাপালা মঞ্চায়নে এদেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন অমলেন্দু বিশ্বাস।

এভাবেই যুগের প্রবহমান ধারায় এদেশের জনপ্রিয় নাট্যরীতি যাত্রা নতুন নতুন বিষয়কে গ্রহণ করেছে। সময়ের পরিবর্তনে যাত্রার আসর থেকে কোনো কোনো বিষয়বস্তু হয়তো তার আবেদন ও গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে, আবার অনেক বিষয়বস্তু সময়ের তাগিদে নতুনভাবে যাত্রার আসরে গৃহীত হয়েছে এবং ভবিষতে নতুন এ রকম আরো বহু বিষয় নিশ্চয় যাত্রার আসরে অনুপ্রবেশ করবে।

১৩.২ কিচ্ছা গান

বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত একটি ঐতিহ্যবাহী নাট্যের নাম 'কিচ্ছা গান'। এ ধরনের পরিবেশনরীতিতে সাধারণত বিভিন্ন লোককাহিনি, রূপকথা, উপকথা ইত্যাদি দোহার-বাদ্যকরদের সহযোগিতা একজন গায়ক একক অভিনয়ের মাধ্যমে আসরে উপস্থাপন করে থাকেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিবেশনরীতিতে কখনো স্থানীয় ইতিহাসের বিভিন্ন চরিত্র নির্ভর আখ্যানও অভিনীত হয়। তবে,

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের স্বভাবজাত কাল্পনিক মনের সৃজন বিভিন্ন মানবিক প্রণয়মূলক লোককাহিনিকে আশ্রয় করেই কিচ্ছা গান বেশি পরিবেশিত হয়। কিচ্ছা গানের আখ্যানসমূহের জনপ্রিয় কয়েকটি আখ্যান হচ্ছে মহুয়া, মলুয়া, সয়ফুলমলুক বদিউজ্জামাল, কমলারানীর সাগরদিঘি, মধুমালা, উতলাসুন্দরী কাকাধরের খেলা, চন্দ্রাবতী, তাজের মুলুক, গুলে হরমুজ, সুন্দরমতি ইত্যাদি। এই সকল কিচ্ছার আখ্যান গ্রামের সাধারণ মানুষের কাল্পনিক মনের সৃজন হলেও এর মূল উপজীব্য হল মানবিক প্রেম। যেমন, একটি আখ্যানের বস্তুর সার উল্লেখ করা যায়।

ময়মনসিংহ জেলার একটি জনপ্রিয় কিচ্ছা গানের পালা হচ্ছে—উতলাসুন্দরী ও কাকাধরের খেলা। এই পালাটির কাহিনিতে জানা যায়, এক বাদশার ছেলে সুনাহরের বিয়ের জন্য পাত্রী দেখতে যায় বাদশার ছেলের বন্ধু এক উজির পুত্র মুনীর। কিন্তু বন্ধু সুনাহরের জন্য পাত্রী দেখতে যেয়ে উজির পুত্র মুনীর নিজেই পাত্রী উতলার প্রেমে পড়ে যায়। একথা গোপন রেখে সে উতলার সঙ্গে বন্ধু সুনাহরের বিয়ের প্রস্তাব দেয়। শেষ পর্যন্ত সুনাহরের সঙ্গে উতলার বিয়ে হয়। তারা বাসর শয্যায় ঢোকে। আর এদিকে মুনীর বাসর ঘরের বেড়ার সাথে কান লাগিয়ে বসে থেকে শুনতে পায় যে, উতলা তার নববিবাহিতা স্বামী সুনাহরকে বলছে, কাল তাকে নিয়ে যাবার সময় তার বাবা সুনাহরকে অনেক কিছু দিতে চাইবে। কিন্তু সে তো বাদশার ছেলে তার তো কোনো কিছু অভাব নেই। অতএব সে যেন কিছু না নেয়। তবে, সে যেন তার বাবার কাছ একটা মন্ত্র শিখে নেয়, যে মন্ত্রের বলে মানুষ ইচ্ছে মতো পাখি বা অন্য কোনো প্রাণীর শরীর ধারণ করতে পারে। সুনাহর যেন এই মন্ত্রটা তার বাবার কাছ থেকে চেয়ে নেয়।

পরদিন সকালে সুনাহর তার শ্বশুরের কাছে সেই কাকাধরের মন্ত্র শিখতে চাই। শ্বশুর প্রথমে মন্ত্রটি না দিতে চাইলেও সুনাহরের জেদাজেদিতে মন্ত্রটা তাকে শিখিয়ে দেয়।

মুনীর এবার মন্ত্রটা শিখে নেবার কৌশল ভাবতে থাকে এবং তারা যখন নতুন বউ নিয়ে ফিরে আসছে, জাহাজে উঠেও বসেছে তখন সে বন্ধু সুনাহরকে বলে, বন্ধু তোমার রুমাল কই? এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে সুনাহর তার রুমাল খুঁজতে থাকে। কিন্তু পায় না। কেননা, রুমালটি আগে থেকেই মুনীর লুকিয়ে রেখেছিল। এবার মুনীর বলে, বন্ধু নতুন বিয়ে করে বাড়ি যাচ্ছে হাতের রুমাল শ্বশুর বাড়ি ফেলে গেলে অমঙ্গল হবে। তার চেয়ে তোমরা জাহাজে একটু অপেক্ষা করো আমি তোমার শ্বশুর বাড়ি গিয়ে রুমালটা নিয়ে আসছি। এরপর এক দৌড়ে সে উতলার বাবার কাছে এসে বলে, তিনি তার নতুন জামাইকে যে মন্ত্রটা শিখিয়ে দিয়েছেন সেটা জামাই ভুলে গেছে তাই মন্ত্রটা আমাকে শিখিয়ে দিতে বলেছে।

উতলার বাবা মুনীরের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস না করে মন্ত্রটা তাকে না শিখিয়ে একটা কাগজে লিখে দেয়। কিন্তু মুনীর কাগজটা লুকিয়ে রেখে ফিরে এসে বন্ধু সুনাহরকে রুমাল ফিরিয়ে দেয়।

এবার বাড়ি ফিরে কয়েকদিন পর বন্ধুকে নিয়ে শিকারে গিয়ে মুনীর বলে, বনধু তোমার শ্বশুর তোমাকে একটা মন্ত্র দিয়েছে সেই মন্ত্র দিয়ে কাকাধরের খেলাটা দেখাতে বলে। সুনাহর তার অনুরোধে শেষ পর্যন্ত কাকাধরের খেলা দেখায় এবং নিজের রুহটাকে কাকের শরীরে স্থাপন করে। সঙ্গে সঙ্গে মুনীর কাকাধরের

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রপুত পানিটা ফেলে দিয়ে নিজে মন্ত্র পাঠ করে নিজের রুহটা বন্ধু সুনাহরের শরীরে স্থাপন করে এবং দ্রুত উতলাকে ভোগ করার জন্য ছুটে আসতে থাকে।

এর মধ্যে কাক হয়ে যাওয়া সুনাহরে উড়ে গিয়ে উতলার বারান্দা, জানালা, ঘরে গিয়ে বসে। উতলা অবাক হয় এবং ভাবে কাকাধরের খেলাটা করে বন্ধু মুনীর তাকে এই কাক করে ফেলে নি তো।

এরপর উতলা বহু কৌশলে নিজেকে মুনীরের কাছ থেকে রক্ষা করে। সবশেষে সে স্বামীকে আবার মানুষরূপে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। স্বামী-স্ত্রীর এই অমর প্রেম গাঁথার লোককাহিনি কিচ্ছা গানের আসরে প্রায় নিয়মিতভাবে মঞ্চস্থ হয়ে থাকে।[৯২] এছাড়া, সাম্প্রতিককালে কিচ্ছা গানের আসরে কিশোরগঞ্জের ইসলাম উদ্দিন তাঁর আত্মজীবনী উপস্থাপন করে বেশ আলোচিত হয়ে উঠেছেন। এর বাইরে বেশ কিছু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উৎসাহে ও আর্থিক সহযোগিতা প্রাপ্তির ভিত্তিতে ময়মনসিংহ অঞ্চলের অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল কিছু কিচ্ছা গানের শিল্পী সামাজিকভাবে গণসচেতনামূলক কাহিনি রচনা করে তা নিজেরাই কিচ্ছা গানের আঙ্গিকে গ্রামের আসরে উপস্থাপন করেন বলে জানা যায়।

১৩.৩ নছিমন গান বা নছিমন যাত্রা

বিগত শতকের নব্বইয়ের দশকে ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া অঞ্চলের কৃষক ও গ্রামের শ্রমজীবী মানুষের মাঝে 'নছিমন গান' বা 'নছিমন যাত্রা' নামে এক ধরনের নাট্যপালার প্রচলন শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে এই গান উত্তরবঙ্গের রাজশাহী, নাটোর, বগুড়া অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

নছিমন গানের মূল চরিত্র বা নায়িকা হচ্ছে নছিমন। আর এর কাহিনিতে জানা যায়–টুংগী শহরে জালিম নামে এক নিঃসন্তান বাদশা ছিলেন। একজন ঝাড়ুদারনী প্রতিদিন তার রাজদরবার ঝাড়ু দেবার পর জালিম বাদশা ঘুম থেকে উঠতেন। ঝাড়ুদারনী রাজদরবারে ঝাড়ুদিলেও সংসারে তার অভাব যায় না। সে একদিন এক জ্যোতিষীকে তার অভাবের কথা বললে জ্যোতিষী ঝাড়ুদারনীকে বলেন–তোমাদের বাদশা আটকুড়ে-নিঃসন্তান, প্রতিদিন সকালে তার মুখ দর্শন হয় বলে তোমার সংসারে সুখ আসে না। জ্যোতিষীর মুখে এমন কথা শুনে ঝাড়ুদারনী তার প্রতিকার জানতে চায়। জবাবে জ্যোতিষী জানান–বাদশার মুখ না দেখে রাজদার ঝাড়ু দিতে হবে।

ঝাড়ুদারনী তাই করে। এদিকে প্রজারা নিঃসন্তান বাদশার মুখ না দেখার কথাটা কানাকানি করতে থাকে। এক সময় এই কথা বাদশার কান পর্যন্ত পৌঁছায়। বাদশা তখন রাজ্য ছেড়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে জঙ্গলে যান। সেখানে বাদশার পায়ের আঘাতে এক সন্ন্যাসীর ধ্যান ভঙ্গ হলে সন্ন্যাসী তাকে পুত্র শোকের অভিশাপ দেন।

সেই অভিশাপের শুনে বাদশা বলেন–তার কোনো পুত্র সন্তান নেই।

সন্ন্যাসী তখন সন্তান পাবার জন্যে আশীর্বাদ দেয় এবং শর্ত দিয়ে বলে–পুত্র জন্ম নেবার বারো বছর পর পুত্রকে বিবাহ দিতে হবে আর নতুন পুত্রবধূকে বাসরঘরে রেখে সেই পুত্রকে বারো বছরের জন্যে লংকা শহরে বাণিজ্যে যেতে হবে। বাদশা দেশে ফিরে এলে তার ঘরে একটি পুত্রসন্তান জন্ম নেয়। বাদশা তার

Dhaka University Institutional Repository

নাম রাখেন আলমসাধু। এই আলমসাধু জন্ম নেবার পর বাদশা বেগম-রানীকে সন্ন্যাসীর শর্তগুলো মনে করিয়ে দিয়ে আকস্মিকভাবে মৃত্যু মুখে পতিত হন এবং মারা যান।

বাদশার বলে যাওয়া কথামতো বেগম-রানী আলমসাধুকে লেখাপড়া শেখাতে পাঠশালাতে পাঠান। সেখানে নছিমনের সঙ্গে আলমসাধুর পরিচয় ও প্রণয় হয়। এরপর আলমসাধু নছিমনের বাড়িতে ঘটক পাঠিয়ে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। প্রস্তাবে নছিমনের বাবা-মা রাজি হয়ে গেলে তাদের বিয়ে হয়। নছিমনকে সঙ্গে নিয়ে আলমসাধু বাড়িতে আসে। কিন্তু আলমসাধুর মা বেগম-রানী বাদশার বলে যাওয়া কথা অনুযায়ী সন্ন্যাসীর শর্ত মেনে পুত্রবধূ নছিমনকে বাসরঘরে রেখে আলমসাধুকে লংকা শহরে বাণিজ্যে পাঠান। অনেক দূরে সেই লংকা শহর।

এদিকে বাণিজ্যে যাবার পথে এক রাতে আলমসাধু স্বপ্নে দেখে সেই রাতে যদি সে তার স্ত্রী নছিমনের সাথে মিলনে যায় তবে তার ঘরে এক ভাগ্যবান সন্তান জন্ম নেবে। আলমসাধু তাই নছিমনের সাথে মিলনের জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে এবং পর্যায়ে অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যে নছিমনের ঘরে আসে। সবার অগোচরে সে নছিমনের সাথে মিলিত হয়। আর রাত্রি শেষ হবার আগেই সে আবার অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যে আগের স্থানে চলে যায়। তাদের এই মিলনের কথাটি নছিমন কাউকে বলতে পারে না।

এরমধ্যে প্রকৃতির নিয়মে নছিমনের গর্ভধারণের বিষয়টা সকলের চোখে পড়ে। আলমসাধুর মা তখন নছিমনকে কলংকিনী ভেবে বাড়ি থেকে বাহির করে দেন।

নছিমন নিরুপায় হয়ে এক জঙ্গলে প্রবেশ করে। সেখানে এক কাঠুরিয়া তাকে আশ্রয় দেয়। কাঠুরিয়ার ঘরে নছিমনের সন্তান জন্ম লাভ করে। সন্তানের নাম রাখা হয় লালচান বাদশা। কাঠুরিয়া ঘর থেকে এক সময় সে সন্তান চুরি হয়ে যায়। এরপর থেকে লালচান বাদশা অন্যের ঘরে বড় হতে থাকে। আর এদিকে সন্তান হারা হয়ে নছিমন পাগলিনীর বেশে তার সন্তান খুঁজতে থাকে।

ইতোমধ্যে আলমসাধুর বাণিজ্য করার বারো বছর পূর্ণ হয়ে যায়। তাই আলমসাধু বাণিজ্য শেষ করে দেশে ফিরে আসে এবং মায়ের কাছে নছিমনের কথা জানতে চায়। আলমসাধুর কথার জবাবে বেগম বলেন—তার স্ত্রী নছিমন কলংকিনী। তাই তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মায়ের মুখে এমন কথা শুনে আলমসাধু সব বুঝতে পারে এবং মাকে তাদের মিলনের বিষয়টা খুলে বলে এবার নছিমনকে খুঁজতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে।

এদিকে নছিমনের সঙ্গে তার চুরি হয়ে যাওয়া সন্তান লালচান বাদশার পরিচয় হয়। এক পর্যায়ে আলমসাধু তাদের খুঁজে পায় এবং স্ত্রী-পুত্র নিয়ে দেশে ফিরে আসে।[৯৩]

উপর্যুক্ত আখ্যানবস্তু সম্পর্কে ঝিনাইদহ জেলার নছিমন গানের পরিচালক ও দলপ্রধান আকবর আলী জোয়ারদার জানান, 'রূপবান গানের এক অংশ আর কমলার বনবাসের এক অংশ মিলে নছিমন গান সৃষ্টি হয়েছে।'[৯৪] তবে, আখ্যানে উদ্ধৃতি বিভিন্ন স্থান-নাম থেকে একথাও বলা চলে যে, এর আখ্যানবস্তুর উপর চলমান সময়কাল ও হিন্দু পুরাণের সম্মিলন রয়েছে। স্থান নাম যখন হয় 'টুংগী শহর' তখন তো গাজীরপুর

Dhaka University Institutional Repository

জেলার 'টঙ্গী' নামটির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে, অন্যদিকে স্থান নাম যখন হয় 'লংকা শহর' তখন তো হিন্দু পুরাণ রামায়ণের 'লঙ্কা'র সাথেও মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

এক্ষেত্রে বলা যায়, টুংগী নামটি গৃহীত হয়েছে সম্ভবত ধর্মীয় ও পেশাগত উভয় কারণে। কেননা, সারা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো কুষ্টিয়ার ধর্মপ্রাণ গ্রামীণ মুসলমানেরাও যেমন টঙ্গীর তুরাগ নদী তীরবর্তীতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ইস্তেমায় শরিক হতে যায় তেমনি কিছু নিম্নবর্গের মানুষ উক্ত অঞ্চলে পেশাগতভাবে অবস্থান করেন বা উক্ত অঞ্চলের সাথে পেশাগতভাবে গভীর যোগাযোগ রাখেন।

গাজীপুর জেলার টঙ্গী শিল্পপল্লীতে অবস্থিত বিচিত্র শিল্প-কারখানা ও গার্মেন্টসের সঙ্গে কুষ্টিয়ার বেশ কিছু মানুষ শ্রমিক হিসেবে সংযুক্ত রয়েছে বলে জানা যায়। সম্ভবত সেই সূত্রে টুংগী শহর নামটি নছিমন গানে ব্যবহৃত হয়েছে। অপরদিকে কুষ্টিয়া অঞ্চলে রামায়ণের কাহিনিটি অতিশয় জনপ্রিয় বলে লঙ্কা নামটি গৃহীত হতে পারে।

১৩.৪ পুতুল নাচ

বাংলায় পুতুল নাচের প্রাচীনত্ব নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে তেমন কোনো মতবিরোধ নেই। কারণ, বাংলায় যে পুতুলনাচের অস্তিত্ব বহুপূর্ব হতেই ছিলো তার বিবরণ এবং স্বীকৃতি মিলেছে—কৃত্তিবাসী রামায়ণে, কাশীদাসী মহাভারতে, এমনকি কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে', সুকুমার সেনের মতো সুবিখ্যাত পণ্ডিত তো শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনিকেও পুতুলনাচ হিসেবে উপস্থাপিত হত বলে মত প্রকাশ করেছেন।

বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, দিনাজপুর, বগুড়া, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, ফরিদপুর, কুষ্টিয়াসহ আরো কয়েকটি জেলাতে সব মিলিয়ে প্রায় চল্লিশটির মতো পুতুল নাচের দল রয়েছে। প্রায় সারা বছর বিভিন্ন ধরণের গ্রামীণ মেলায় এ সকল দল পেশজীবীভাবে পুতুল নাচের আসর করলেও শীতের মৌসুমেই তারা বেশি আসর করে থাকে বলে জানা যায়। পুতুল নাচের সঙ্গে যুক্ত পেশাজীবীশিল্পীদের কেউ পুতুল নাচিয়ে, কেউ পুতুল নাচের কথক বা প্রোমট-মাস্টার, কেউ পুতুল নাচের গায়ক, কেউ দল-মালিক ও পরিচালক। গবেষক ভাষ্যে জানা যায়, এদেশে পুতুল নাচের চল প্রায় হাজার বছরেরও অধিক পুরানো। কিন্তু পুরানো ধারার পুতুলনাচের সঙ্গে সাম্প্রতিককালের পুতুল নাচ পরিবেশনের বিষয়বস্তু থেকে শুরু করে উপস্থাপনরীতির মধ্যেও বিস্তর ফারাক সূচিত হয়েছে। প্রাচীনকালের পুতুল নাচ সাধারণত ধর্মীয় বা পৌরাণিক চরিত্র নির্ভর আখ্যান অবলম্বনে পরিবেশিত হত, যুগের পরিবর্তনে পৌরাণিক আখ্যানের পরিবর্তে পুতুল নাচের আসরে রূপকথা, উপকথার গল্প, এমনকি বাস্তব জীবনের কিছু কিছু চরিত্র পুতুল নাচের আসরে উপস্থাপিত হতে শুরু করে। সে যাই হোক, সকল ক্ষেত্রেই পুতুল নাচে আখ্যানবস্তু একটা থাকতই থাকত। যেমন—ভারত বিভাগের পূর্বে এদেশের পুতুল নাচের আসরে যেখানে রাম-সীতা, রাধা-কৃষ্ণ, বেহুলা-লক্ষ্মীন্দর ইত্যাদি ধর্মীয় ও পৌরাণিক চরিত্র নির্ভর আখ্যান পরিবেশিত হত সেখানে ভারত বিভাগ পরবর্তীকালে এদেশের কুষ্টিয়া অঞ্চলে পুতুল নাচের আসরে ফকির লালন সাঁইয়ের পালা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। প্রায় একই সময়ে ফরিদপুর অঞ্চলের পুতুল নাচে ধর্মীয় ও পৌরাণিক

Dhaka University Institutional Repository

আখ্যানের পরিবর্তে লোককাহিনি রূপভান পালা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের পুতুল নাচে মধুমালার পালা আখ্যান হিসেবে গৃহীত হয়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

বর্তমানে এদেশের প্রায় সকল অঞ্চলের পুতুল নাচের আখ্যানভিত্তিক পরিবেশনের প্রচলন পরিবর্তিত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে পুতুল নাচের আসরে পূর্ণাঙ্গ কোনো আখ্যানের পরিবর্তে ছোট ছোট বা খণ্ড খণ্ড ঘটনা কেন্দ্রিক পুতুল নাচ পরিবেশিত হয়ে থাকে। একক ও সুনির্দিষ্ট কোনো আখ্যান বা কাহিনি এখন এদেশের কোনো পুতুল নাচেই তেমনভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না। এখনকার পুতুলনাচের খণ্ড খণ্ড ঘটনা পরিবেশনের সঙ্গে জনপ্রিয় লোক গান এবং পুরানো চলচ্চিত্রের গানের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়।

১৪. বাংলার গ্রামীণ মানুষের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনচিত্র প্রকাশক আখ্যান

এই শ্রেণিকরণের ভেতর সাধারণত সামাজিক নকশা হাস্যরসাত্মকভাবে পরিবেশন করা হয়ে থাকে, যেমন—বাংলাদেশের সমাজ জীবনের বাস্তব ঘটনা নিয়ে ব্যঙ্গ বা হাস্যরস সৃষ্টিকারী কিছু পরিবেশনা-রীতি 'সঙযাত্রা', 'আলকাপ', 'গম্ভীরা', 'সরিগান' বা 'মারাঘোড়া' অথবা 'নিখাঙ্গিয়া' ('পালাটিয়া' বা 'বান্ধানী গান'), 'ঘাটুগান' ইত্যাদি বর্তমান রয়েছে। সামাজিক নকশা ও হাস্যরসাত্মক পরিবেশনের মধ্যে 'গম্ভীরা' ও 'আলকাপ'-এর নাম আসে প্রথমে। পঞ্চদশ শতকের পূর্বকাল থেকে প্রধানত বিভিন্ন মেলা-উৎসবাদিতে এক ধরনের গীতিনাট্যধর্মী পরিবেশনে ব্যঙ্গাত্মক অভিনয়ের মাধ্যমে সামাজিক অনাচার ও পীড়নের বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরা হত। এ ধরনের পরিবেশনে বাদ্যযন্ত্রী ও দোহারদের অংশগ্রহণ থাকত। গবেষকদের ধারণা, উক্ত সঙ বা ব্যঙ্গধর্মী পরিবেশনা-রীতি থেকে পঞ্চদশ শতকের পরবর্তী সময়ে সম্ভবত 'লেটো' নাট্যরীতির উদ্ভব হয়েছে। আর সঙ বা ব্যঙ্গধর্মী পরিবেশনা-রীতি বিবর্তনের ধারাতে সর্বশেষে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় 'গম্ভীরা' হিসেবে বর্তমান।[৯৫]

১৪.১ আলকাপ

বাংলাদেশের চাপাইনবাবগঞ্জকে আলকাপের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কিন্তু আলকাপ পরিবেশনা শুধু চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, আলকাপের পরিবেশনা ছড়িয়ে আছে রাজশাহী, নাটোর অতিক্রম করে নওগাঁ পর্যন্ত। হাস্যরসাত্মক কৌশলে সাধারণত পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈষাম্য বা সমস্যাকে কেন্দ্র করে ও তা সমাধানের পথনির্দেশ করে আলকাপের বিভিন্ন আখ্যান উপস্থাপন করা হয়। এছাড়া, হিন্দু-পুরাণের অনেক বিষয় নিয়েও আলকাপ পরিবেশন করা হয়ে থাকে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে প্রচলিত আলকাপের আসরে যেসব পালা পরিবেশন করা হয়ে থাকে তা হল—'চাষা-ভদ্র', 'ডোম-ধোপা', 'চামার-কামার', 'হিন্দু-মুসলমান', 'রাধা-কৃষ্ণ', 'গৌষ্ঠ-বৃন্দা', 'দেওর-ভাবি', 'বড় ভাই-ছোট ভাই', 'ছেলে-বাবা', 'শ্বাশুড়ি-বউ', 'ননদ পূজা', 'ব্রাহ্মণের পূজা', 'রাজা হরিশচন্দ্রের আলকাপ', 'গোলাবাজ মেলার আলকাপ', 'লক্ষীর হাতে ভিক্ষার ঝুলি', 'সতী নারীর বনবাস', 'আপন-দুলাল' ইত্যাদি। আলকাপের আখ্যানে গ্রামীণ জীবনের এক একটি পারিবারিক সমস্যাকে তুলে ধরা হয় অত্যন্ত তির্যক সংলাপ, গান, নৃত্য ও অভিনয়ের মাধ্যমে।[৯৬]

Dhaka University Institutional Repository

১৪.২ গম্ভীরা

আদিতে গ্রাম বা সমাজের কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির ত্রুটি-বিচ্যুতি চিত্রিত হত। কারণ, সাধারণ গ্রামবাসী সে সমস্ত ঘটনা থেকে মজা পেত। দূরবর্তী কোনো ঘটনা বা বৃহত্তর সমাজ বা রাষ্ট্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি কখনোই তেমন মনকে আকর্ষণ করতে পারে না, তাই এইসব ক্ষুদ্র ঘটনা অধিকতর আকর্ষণীয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়বস্তু গানে জায়গা করে নেয়। এ ধারার প্রবর্তক মূলত মুসলমান গম্ভীরা গায়কগণ। কারণ, হিন্দুর ধর্মীয় চৌহদ্দির বাইরে তাঁদের যেতে অসুবিধা হয়নি। ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টি অধিকারী তাঁরা ছিলেন বলে এর প্রবর্তনে তাঁদের সুবিধা হয়েছিল। এর ধারাই আজ বেগবতী হয়ে গম্ভীরা গান সারা বাংলার জনপ্রিয় আসর হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে।

গম্ভীরা গান শেষ হয় একটা সর্বজনগ্রাহ্য সমাধানের মধ্যদিয়ে। সংলাপগুলি আগে লেখা হয় না। উপস্থিত বুদ্ধির উপর নির্ভর কুশীলবরা তা তৈরি করে। দলপতি বা অধিকারীর পরামর্শমতো বা নির্দেশমতো, কখনো বা নিজেরা আগেভাগে আলোচনা করে নিয়ে অভিনেতারা গানের আসরেই নিজস্ব উপস্থিত বুদ্ধি অনুযায়ী সংলাপ তৈরি ও রঙ্গরস পরিবেশন করে। এতে শিল্পীর নিজস্ব প্রতিভার বিকাশ ঘটে। বিশেষ ব্যঙ্গ-কৌতুকে যিনি সুনাম অর্জন করেন, তাঁর নামেই প্রধানত দলের নাম হয়।

গম্ভীরা গানের আসর শুরু হয় বন্দনা দিয়ে। এরপর ডুয়েট, পালাবন্দী গান পরিবেশিত হয়। পালাবন্দী গানের বিষয়বস্তু গৃহীত হয় সামাজিক ও রাজনৈতিক সংবাদের সূত্র থেকে। উল্লেখ্য, এই গানের রচয়িতার সাধারণ বক্তব্যের সাথে গানের মূলসুর ও শিল্পী বা পাত্র-পাত্রীর রস-রসিকতাযুক্ত উদাহরণ সমন্বয়ে তাৎক্ষণিক সংলাপ ও মূলগান যুক্ত করে সংলাপাত্মক অভিনয়ে স্থানীয় লোকায়ত উদারহণ টেনে রস-রসিকতা উপস্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রে জেলার বা স্থানীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক ত্রুটি-বিচ্যুতি, লোকশ্রুতি, স্থানীয় পত্র-পত্রিকার সংবাদ, নিজস্ব দলের অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য ব্যবহৃত হয়। তাই আসরে পরিবেশিত গম্ভীরা গান (গৌণ) হয়ে ওঠে সংলাপ, ব্যাখ্যা, উদাহরণের মাধ্যমে রস সৃজনের একটি প্রাণবন্ত পরিবেশনরীতি।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত ব্যক্তিগত কেচ্ছা বা স্থানীয় কোনো প্রতিষ্ঠানের ত্রুটি-বিচ্যুতি গম্ভীরা গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেতো, আজ সেগুলি বেশ কিছুটা স্তিমিত। বৃহত্তর ক্ষেত্রে অর্থাৎ ব্যাপক সামাজিক বা রাজনৈতিক জগতে প্রবেশ করে শিল্পীরা সমগ্র ব্যাপারটিকে কৌতুকের দৃষ্টিতে দেখেন। গম্ভীরার সঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গবেষকের অভিমত হল, এটি মূলত কীর্তন, জারি প্রভৃতি গোষ্ঠীসঙ্গীতের অন্তর্গত। এ গানের লক্ষ্য লোকশিক্ষা। অশিক্ষিত নিরক্ষর জনসাধারণ অনেক শিক্ষালাভ করে এর মাধ্যমে। যত সহজে এ-গান ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দিতে পারে, সেরকম অন্য কোনো মাধ্যম আছে, কিনা আমাদের জানা নাই।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ভোলাহাট, শিবগঞ্জ, কানসার্ট ইত্যাদি অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাম ছাড়াও রাজশাহী জেলার কিছু এলাকাতে গম্ভীরার প্রচলন রয়েছে। দেশ বিভাগের পরে সেখানে গম্ভীরা নামটি আছে বটে, কিন্তু রূপ বদলেছে। সেখানে শিব ইত্যাদি চরিত্র নেই। 'নানা' কথাটির মধ্যে মুসলমানী অনুষঙ্গ আছে সন্দেহ নেই, গম্ভীরার শিবকে স্মৃতিতে রেখে অভিবৃদ্ধ ব্যক্তি হিসেবে 'নানা' সম্বোধন করে থাকে মুসলমান গম্ভীরা কবিরা। বাংলাদেশে গম্ভীরার জনপ্রিয়তা লোকসমাজের নিকটে ব্যাপক বলে মূলত হিন্দু চরিত্রটি মুসলমানে রূপান্তিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

'নানা' আদিতে শিব এবং মালদহে এখন শিব, কিন্তু বাংলাদেশে গ্রামের এক বর্ষীয়ান চাষী বা কৃষক বা মোড়ল। এই নানার চাপদাড়ি আছে। নানা [মাতামহ] ও তার নাতিন/লাতিন [নাতি বা পৌত্র] এই দুটি চরিত্র সেখানে স্থান পায়। 'ডুয়েট' জাতীয় এই লোকনাট্য। নানা ও তার নাতির সংলাপের মাধ্যমে সমাজ ও দেশের অবস্থা বিবৃত হয়। বিষয়বস্তুর মধ্যে পৌরসভা, ইউনিয়ন বোর্ড ইত্যাদি থাকে। মালদহ অঞ্চলের মতো রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণ সেখানে অনুপস্থিত। বিভিন্ন চরিত্রের প্রবেশ বাংলাদেশের গম্ভীরাতে লক্ষ করা যায় না বলে মনোরঞ্জনের ক্ষমতা বা নাট্যিক ক্ষমতা মালদহের গম্ভীরা থেকে অনেক কম।[৯৭]

১৪.৩ আলকাপ ও গম্ভীরা

উত্তরবঙ্গের দু'টি পরিবেশনা 'গম্ভীরা' ও 'আলকাপ' প্রত্যক্ষ করলে ধারণা জন্মে যে, এই দুটি নাট্য-আঙ্গিক একে অপরের পরিপূরক। গম্ভীরাতে যে ক্ষেত্রে নানা-নাতি চরিত্র নাচে-গানে ও কথায় দেশের সমকালীন বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরে। যেমন—গম্ভীরার একটি পরিবেশনাতে নাতি চরিত্র আকাশ-সংস্কৃতির বর্তমান যুগে ডিশ অ্যান্টেনার প্রভাবে চাল-চলন, কথাবার্তা, নাচ-গান, এমনকি পোশাক-আশাকেও অন্যান্য বাঙালিদের উদ্ভট পরিবর্তনকে সমর্থন করে আর নানা চরিত্র তার সমালোচনা করে রঙ্গ-রসিকতার মধ্যে শেষপর্যন্ত প্রকৃত সত্যের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। পক্ষান্তরে 'আলকাপ'-এর বিষয়বস্তু হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে পারিবারিক। গম্ভীরায় যেখানে বৃহত্তর সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়, আলকাপে সেখানে সমাজ কাঠামোর একক (পরিবার) নিয়েই আলোচনা করা হয়।[৯৮]

১৪.৪ সঙযাত্রা বা সঙখেলা

পঞ্চদশ শতকের আগে থেকে এদেশে বিভিন্ন মেলা, উৎসব, পার্বণ ইত্যাদিতে এক ধরনের গীতিনাট্যধর্মী ব্যঙ্গাত্মক পরিবেশনা বা সঙ-এর মাধ্যমে সামাজিক অনাচার ও পীড়নের বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরা হত। এছাড়া, বহু আগে থেকে এদেশে 'জাত' বা 'যাত্রা' অর্থাৎ ধার্মিক অনুষ্ঠানমূলক শোভাযাত্রায় 'সঙ' সেজে অংশগ্রহণ করার রীতি প্রচলিত ছিল। পরে উনিশের শতকের প্রারম্ভ হইতে চড়ক গাজন প্রভৃতিতে গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে নানা প্রকার 'সঙ' সেজে উপস্থাপন করা শুরু হয় এবং এক সময় এই সকল সঙ-এর অভিনয় এতই জনপ্রিয়তা পায় যে, তা পূজানুষ্ঠানের একটি মুখ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পূজা-পার্বণ উপলক্ষে সঙ বের হতে থাকে, এমন কি বিয়ে বাড়িতে আনন্দ অনুষ্ঠান পালনের জন্য সঙের ব্যবস্থা করা শুরু হয়।[৯৯]

বর্তমানে স্বতন্ত্র একটি নাট্যধারা হিসেবে সঙযাত্রা বা সঙখেলা টাঙ্গাইল অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে। সম্প্রতি এ শ্রেণির নাট্যধারা গ্রামের নাট্যামোদী দর্শক-শ্রোতাসহ সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের নাট্যকলা ও ফোকলোর বিভাগের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

টাঙ্গাইল জেলার হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষ দলগতভাবে সঙযাত্রা পরিবেশন করে থাকে। দলের সদস্যগণ যে ধর্মেরই হোক না কেন তারা সঙের আসরে সাধারণত একই ধরনের আখ্যান পরিবেশন করে।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত অঞ্চলের সঙযাত্রার বিভিন্ন দল গুরু পরম্পরার ভিত্তিতে সঙযাত্রার যে সকল পালা পরিবেশন করে থাকে, সেগুলো হচ্ছে–'বৈরাগী' ও 'দুই বিয়াইনী'। এছাড়া, সাম্প্রতিককালে সঙের আরো যে সকল নতুন পালা পরিবেশিত হয়, সেগুলো হচ্ছে–'খাজনা', 'বিনোদিনী', 'দুই ভাই', 'এক পার উপর খাড়া', 'এক বউ দুই জামাই', 'হা করা', 'গুলপি', 'ঠাকুর বাড়ির কামলা', 'ফকির টানাটানি', 'হাটের ছেলে', 'ভিসিআর সেট', 'ধান কাটা' 'বস্তা'সহ প্রায় ৬০টি পালা। সবগুলো পালাতেই মূলত গ্রামীণ জীবনের ছোট-খাটো পারিবারিক ও সামাজিক অসংগতিকে হাস্যরসাত্মকভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়।[১০০]

একটি বিখ্যাত সঙ পালা হচ্ছে–'পিতাপুত্রের সঙখেলা'। এই পালাতে দেখা যায়, পুত্রের বিয়ের বয়স হয়েছে তবু পিতা পুত্রকে বিয়ে দেয় না। আর এদিকে পুত্র বিয়ের জন্য অস্থির। সে ইনিয়ে-বিনিয়ে বাবার কাছে বিয়ের কথা পাড়ে। বাবা এবার পুত্রের বিয়ের জন্য পাত্রী দেখতে বের হয়। কিন্তু পাত্রী দেখতে গিয়ে যখন পাত্রী তার পছন্দ হয় তখন পাত্রীর মা কৌশলে পাত্রী দেখতে আসা বাবার সাথেই কন্যার বিয়ে দিয়ে দেয়। নতুন বউ নিয়ে বাবা বাড়ি ফিরে এলে পুত্র ভাবে, বাবা তার বিয়ের জন্য পাত্রী সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। কিন্তু বাবা তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, এটা পুত্রের জন্য নির্বাচিত বিয়ের পাত্রী নয়, এটা তার নিজেরই নতুন বউ। পুত্র এবার পিতার এই অপকর্মের প্রতিবাদ করার পথ খোঁজে এবং জানতে পারে, বাবার বিয়ে করে আনা বউয়ের মা বিধবা নারী। সে মনের আনন্দে এবার বাবার নতুন শ্বশুর বাড়ি গিয়ে বাবার নববিবাহিতা বউয়ের মাকে বিয়ে করে আনে এবং তাকে বাড়ি এনে বাবা ও তার নতুন মায়ের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, বাবাকে সে স্মরণ করিয়ে দেয়, সে যেহেতু তার নববিবাহিতা স্ত্রীর মাকে বিয়ে করেছে সেহেতু সে পুত্র হলেও আজ থেকে সে কিন্তু তার শ্বশুরও।[১০১] এ রকম আরো বহু চটুল বিষয়কে নিয়ে এমনই তীর্যক ভঙ্গিতে সঙযাত্রা পরিবেশিত হয়ে থাকে। তবে, বলে রাখা ভালো, সঙ পরিবেশনে বিষয় হিসেবে সাধারণত পারিবারিক অসংগতিগুলো প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

১৫. তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের আলোকে উদার জ্ঞানতত্ত্ব প্রকাশক আখ্যান

এদেশের বিচিত্র ধর্ম অনুসারী ও বিচিত্র সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত ঐক্যের বন্ধন রচনা করেছে এখানকার মানুষের হাজার বছরের উদার মানবতাবাদী চিন্তাচর্চা। নিজের পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত ধর্মমতের চেয়ে এদেশের মানুষে মানুষে একাকার হয়ে যাবার সাধনা ও সম্মিলন কেন্দ্রিক অসাম্প্রদায়িক ধর্মমত অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। এই গ্রহণযোগ্যতার আলোকেই এদেশের মানুষ প্রচলিত ধর্মতত্ত্ব ও তার সূক্ষ্ম ও স্থূল বিষয়াবলীর আলোচনা সমালোচনায় সমাজতত্ত্বকে সমান গুরুত্ব দিয়ে কথা, গান, বির্তকের মোড়কে নিয়মিতভাবে কিছু নাট্যমূলক পরিবেশনা করে থাকে। কবিগান ও বিচারগান এই ধরনের পরিবেশনের মধ্যে পড়ে। এই পরিবেশনা দুটিতে দেখা যায়–দুই দলের গায়েন-দোহার বিতর্কধর্মী দ্বান্দ্বিক কিছু ঘটনা ধর্মীয়, পুরাণ, সামাজিক, সাহিত্যিক ও বাস্তব জীবনের আলোকে পরিবেশন করে থাকেন। এই ধরনের পরিবেশনা-রীতিতে অভিনয়ের সুযোগ তেমন না থাকলেও লোক-মানুষের চিন্তার খোরাক থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

১৫.১ কবিগান

বাংলাদেশের কবিগান এক অভিনব সৃষ্টি। দুই জন প্রতিভাবান কবিয়াল তাদের দোহার বাদ্যকরদের সমন্বয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্ট কথা ও গানে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক পালা বিতর্ক-বিশ্লেষণের ধারায় দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করে থাকেন। এ ধরনের কবিগানের আসর ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং এ ধারায় কিছু পেশাজীবী কবিয়াল জন্ম লাভ করে। কবিগানের আসরে এই কবিয়ালদের সৃজনশীলতা, কবিপ্রতিভা এবং সঙ্গীতসাধনার যে অপূর্ব সমন্বয় ঘটে তা এদেশের মানুষের কাছে গর্বিত ঐতিহ্যরূপে স্বীকৃত। এক সময় শহুরে শিক্ষিত মানুষ থেকে শুরু করে গ্রামের সাধারণের কাছে প্রায় সমানভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে এই গান।

কবিগানের উৎপত্তির ইতিহাস নিয়ে গবেষকদের মধ্যে যথেষ্ট দ্বিধাবিভক্তি রয়েছে। তথাপি এ গানের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সম্পর্কে অধিকাংশ গবেষকের অভিমত হচ্ছে, অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের কলকাতায় কবিগান উদ্ভূত হলেও ঊনবিংশ শতকের পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কবিগান বিশেষ রূপে বিকশিত ও মার্জিত রূপ লাভ করে। এ সময় কলকাতা থেকে স্থানান্তরিত এ গান যথেষ্ট পরিমাণে লোকচারিত্র অর্জন করে এবং পল্লিবাসীর সংস্কৃতি চর্চার প্রধান উপকরণে পরিণত হয়।

সাধারণত কবিগানের বিষয়বস্তু আহরিত হয় বাংলার সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক, ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার বিচিত্র ভাণ্ডার হতে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য কীর্তির শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চৈতন্যচরিতামৃত, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব পদাবলি, রামায়ণ, মহাভারত, মাইকেল মধুসূদনের সৃষ্টিকর্ম, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, এমনকি জ্ঞানসাধক লালনের গীতবাণীর অমৃত ভাণ্ডারের সকল সুধা এবং সামাজিক রীতি-নীতির পূর্বাপর কবিগানের বিষয়বস্তু হিসেবে গৃহীত হয়ে থাকে। তবে, তত্ত্বগত জ্ঞান প্রকাশে বিভিন্ন পুরাণ শাস্ত্র, ধর্মীয় গ্রন্থ ইত্যাদি থেকে তত্ত্ব অন্বেষণ করে আসরে উপস্থাপন করা হয়। কবিগানে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে গবেষক বলেন, 'যদিও কবিগান মূলত ধর্মীয় চরিত্রসম্পন্ন তথাপি বর্তমানে এটি এর অনুষ্ঠান পরিধির মধ্যে ঐতিহাসিক কল্পকাহিনিমূলক বিষয়, এমনকি সমসাময়িক রাজনৈতিক, সামাজিক বা নৈতিক বিষয়কেও অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে।'[১০২]

যুগের পরিবর্তনে কবিগানের আসরে নতুন চিন্তা ও বিষয়বস্তুর সংযোজন ঘটেছে। এ সম্পর্কে গবেষক ভাষ্যে জানা যায়, চট্টগ্রামের বিখ্যাত কবিয়াল রমেশ শীল (১৯০৭-১৯৬৭) কবিগানের আসরে নতুন ধরনের বিষয়বস্তু সংযোজন করেন। তিনি মার্কসীয় শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্ব অবলম্বনে কবিগানের বিতর্ককাঠামোর মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ বনাম সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্ব বা বুর্জোয়া সংস্কৃতি বনাম গণসংস্কৃতির দ্বন্দ্বকে আসরে উপস্থাপন করতে সমর্থ হন এবং সর্ব সাধারণের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।[১০৩]

বর্তমানে কবিগানের আসরে উপর্যুক্ত বিষয়বস্তুর মধ্যে পূর্বাপর প্রায় সকল বিষয়ই কবিগানের শাস্ত্রীয় নিয়ম বা বিতর্ককাঠামোর আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়ে থাকে। নাট্য বিশেষজ্ঞ এ ধরনের কবিগানের জ্ঞানতত্ত্বমূলক বিতর্কধর্মী পরিবেশনাকে 'মিশ্রনাট্য' বলে উল্লেখ করে জানিয়েছেন, কবিগান পরিবেশনের সাফল্যের ধারা আজও অব্যাহত এবং আমরা এটিকে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি "মিশ্রনাট্য" হিসেবে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এখনো সবিশেষ সমাদৃত হতে দেখি।[১০৪]

Dhaka University Institutional Repository

১৫.২ বিচারগান

বিচারগানে শাস্ত্রীয় কাহিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বয়াতিগণ ইসলাম ও হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্রীয় কাহিনি জানেন এবং বিচারগানের আসরে এ সকল কাহিনিকে অবলম্বন করে প্রশ্ন-উত্তরমূলক, গান রচনা ও পরিবেশন করে থাকেন। এ সবের মধ্যে কারবালার কাহিনি, নবী কাহিনি, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনিসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিচারগানের পরিবেশকে উপভোগ্য ও গুরুগম্ভীর করার জন্য অনেক সময় একজন গায়ক তার বিপক্ষের গায়কের প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না-দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে থাকেন। এটি বিচারগান পরিবেশনের একটি কৌশল। আর এই কৌশলের মাধ্যমে দর্শক-শ্রোতাকে গানের প্রতি আকৃষ্ট করে রাখা হয়। আসলে দর্শক-শ্রোতাদের আনন্দদানের জন্য বিচারগানের শিল্পীগণ এই ধরনের argument / counter argument-এর পরিবেশ সৃষ্টি করেন। এতে দর্শক-শ্রোতা গানের সঙ্গে involved হয়ে যান। বিচারগানের আসরে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সৃষ্টিতত্ত্ব, নবীতত্ত্ব, আদিতত্ত্ব রসতত্ত্ব, নামাজতত্ত্ব, নারীতত্ত্ব, যৌবনতত্ত্ব, মানুষতত্ত্ব প্রভৃতি তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে পাল্লা হয়। এ বিষয়গুলো তাত্ত্বিক কিন্তু ধর্মীয় বিষয়। এছাড়া নারী-পুরুষ, গুরু-শিষ্য, আদমতত্ত্ব-নবিতত্ত্ব, জীব-পরম, শরিয়ত-মারফত, হাশর-কেয়ামত, মেরাজতত্ত্ব-নবিতত্ত্ব, হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিচারগানে পাল্লা হলেও ধর্মীয় বিষয় চলে আসে গানের কথায় এবং প্রশ্ন-উত্তরে।

বিচারগানের বাহাস সাধারণত শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন আশেকানদের সামনেই বেশি করা হয়। ঢাকা, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ অঞ্চলে বিভিন্ন সুফিসাধক পির আউলিয়াদের ঔরসে এখনও এই পাল্লাটি প্রায় নিয়মিতভাবেই পরিবেশিত হয়ে থাকে। বিষয়বস্তু যা-ই হোক বিচারগানের প্রতিটি আসরের গানে ও কথায় গায়কদের অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানবধর্ম প্রচারের সুতীব্র বাসনা প্রকাশিত হয়ে থাকে। বিচারগানের প্রখ্যাত মহৎ বা বিচারক আবদুল ওয়াহেদ শিকদার বলেন যে, 'বিচারগান হচ্ছে শুধু মানুষের খেলা, মানুষের মধ্যেই আল্লার খেলা। সেখানে কোনো জাতি ধর্ম খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধু মানুষ পাওয়া যায়। বিচারগানের বাণী এটি।'[১০৫]

১৫.৩ কবিগান ও বিচারগান

অনেকে কবিগানের সঙ্গে বিচারগানের সাদৃশ্য খুঁজে ফেরেন। কারণ, কবিগান ও বিচারগানের মিল হচ্ছে দু'টি গানই প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে হয়। কবিগানের বোল, টপ্পা দীর্ঘ বা লম্বা। বিচারগানের একটি গানে তিনটা কলি থাকে। তবে কিস্‌সা-কাহিনিমূলক গানে অনেক সময় ৪/৬টি হয়। আধ্যাত্মিক, শরিয়ত, মারফত, দেহতত্ত্ব বিষয়ক গানে, সাধারণত তিনটি কলি হয়ে থাকে। কবিগানে বোল, টপ্পা, কবির ধুয়া লম্বা হয়। কবিগানের বিষয় হচ্ছে মূলত হিন্দুশাস্ত্র-বিষয়ক কাহিনি। *রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ভাগবত-গীতা*। তবে ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়েও কবিগানে আলোচনা হয়। জারিগানেও ধুয়া থাকে। দুই দলে পাল্লা হয়। একজন ইমাম হাসান-এর ভূমিকা নেন এবং অন্যজন এজিদের ভূমিকায় গান করেন। জারিগানের বিষয় নির্দিষ্ট, যেমন—কারবালা কাহিনি, নবীদের কাহিনি, আওলিয়াদের কাহিনি, সমসাময়িক ঘটনা, যেমন—পরিবার পরিকল্পনা, বৃক্ষরোপন ইত্যাদি। বিচারগানের বিষয় বহুমুখী, যেমন—শরিয়ত, মারফত,

Dhaka University Institutional Repository

দেহতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, আদমতত্ত্ব, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি। বিচারগানের বিষয় গভীর ও তত্ত্বমূলক। জারিগানের বিষয় কাহিনি-নির্ভর ও প্রায়শই কল্পনাপ্রসূত। কবিগানেও কল্পনা আছে। গানে গানে পাল্লা দিয়ে এই কথা কাটাকাটি কবিত্বের পরিচয় বহন করে।

১৬ ঐতিহ্যবাহী ভ্রাম্যমাণ নাট্যধারা

বাংলাদেশের ভ্রাম্যমাণ নাট্যের ঐতিহ্য সর্বপ্রাচীন বলা চলে। কেননা, এদেশীয় নাট্যের উদ্ভব ঘটেছে ভ্রাম্যমাণ নাট্যের ঐতিহ্য থেকে, যা এই অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ের বিবরণে লভ্য। এমনকি সমকালে চর্চিত যাত্রার ইতিহাসেও জানা যায় যে, ধর্মীয় কৃত্যমূলক বিভিন্ন শোভাযাত্রার ভ্রাম্যমাণ পরিবেশনা ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে অষ্টাদশ শতকের শেষে পরিবেশনশিল্প যাত্রার উদ্ভব হয়েছে। মনসাপূজা উপলক্ষে বিভিন্ন নদীর ঘাটে ভাসান গান পরিবেশনের ভ্রাম্যমাণরীতি হতেই সম্ভবত টাঙ্গাইল অঞ্চলে বেহুলার নাচাড়ির জন্ম হয়েছে। অবশ্য, উক্ত অঞ্চলে শ্রাবণ-সংক্রান্তিতে নৌকার উপর উঠে এক এক দল গায়ক সাতটি ঘাটে থেমে মনসার গান গেয়ে সন্ধ্যায় আবার শুরুর ঘাটে ফিরে আসে, এ ধরনের পরিবেশনাকে বলা হয় শাওনে ডালা। শুধু হিন্দু পুরাণ নয়, ইতিহাসের কোনো বিশেষ ঘটনার স্মরণেও ধর্মীয় কৃত্যাচার পালনের মতোই কিছু ভ্রাম্যমাণ পরিবেশনের প্রচলন বাংলাদেশে রয়েছে। এ ধরনের ভ্রাম্যমাণ পরিবেশনের মধ্যে পড়ে কারবালার যুদ্ধের মর্মান্তিক ঘটনা স্মরণে তাজিয়া মিছিল, অস্ত্র বহকারী কাসেদ দল, দুলদুল ঘোড়া, জারি নাচের দলের বর্ণিল শোভাযাত্রা। ধারণা করা হয়, চৈত্রসংক্রান্তিতে হিন্দুদের কালী কাচসহ বিভিন্ন অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে দেবীকাহিনির বিভিন্ন পৌরিণক ঘটনা প্রদর্শনের অভিনয়ের পাশাপাশি এদেশের মুসলমানরা নিজেদের শৌর্য-বীর্য প্রদর্শনের উপায় হিসেবে মহররমের সময় কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার শোক উদ্‌যাপনকে আশ্রয় করে থাকে। এ সম্পর্কে কবি জসীমউদ্‌দীন জানান—'মুহ্‌ররমের সময় রাস্তায় লাঠি ও ছোরা খেলা হয়। জারী গায়কেরা মুহ্‌ররমের কাহিনি বর্ণনা করে। কেহ আপন অঙ্গে আঘাত করিতে করিতে শরীর রক্তাক্ত করিয়া তোলে। এদেশে চৈত্রপূজার সময় এক শ্রেণির হিন্দু আপন আপন শরীরের উপর নানা রকম আঘাত করিয়া থাকে, যেমন জিহ্বায় বড়শী বিদ্ধ করা, হাতের মধ্যে সূঁচ চালাইয়া দেওয়া, কোন লোকের পৃষ্ঠদেশ বড়শীবিদ্ধ করিয়া তাহাকে চড়ক গাছে ঘুরান প্রভৃতি। ইহার কিছুটা প্রভাব আমাদের মুহ্‌ররম অনুষ্ঠানে আসিয়াছে।'[১০৬] জানা যায়, 'মুহ্‌ররমের সময় ময়মনসিংহ জেলায় জারীগানের সঙ্গে সুদর্শন তাজিয়া তৈরী করা হয়। কাগজ ও রাঙতার পাত সুনিপুণ হস্তে কাটিয়া সুন্দর ফুল লতাপাতা ও ঝালর তৈরী করিয়া এই তাজিয়ার গায়ে আঁটিয়া দেওয়া হয়। জারীগানের গায়কেরা এই তাজিয়া বাড়িতে বাড়িতে বহিয়া লইয়া যায়। তাজিয়ার সামনে নৃত্যগীত, লাঠিখেলা ও তলোয়ারের কৌশল দেখাইয়া তাহারা গৃহবাসীকে মুগ্ধ করে। ফল কথা, এই মুহ্‌ররম পর্বে গ্রামের গানরচয়িতা, নর্তক, গায়ক ও শিল্পী প্রত্যেকেই নিজ নিজ কলা-কৌশল দেখাইবার সুযোগ পায়।'[১০৭] শুধু ময়মনসিংহ জেলাতে নয়, বাংলাদেশের ঢাকা, মানিকগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইত্যাদি জেলাসহ অনেক অঞ্চলে মহররম উপলক্ষে বর্ণাঢ্য তাজিয়া মিছিল, অস্ত্র-শস্ত্র প্রদর্শন, লাঠি খেলা, আগুন খেলা ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে প্রচলিত বৈচিত্র্যময় ভ্রাম্যমাণ পরিবেশনাকে তিনটি প্রধান শ্রেণি বা প্রকরণে বিভক্ত করা যায়, যথা—এক. ধর্মীয় ইতিহাস, পুরাণ নির্ভর প্রদর্শনমূলক শিল্প; দুই. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন এবং অসাম্প্রদায়িক উৎসবকেন্দ্রিক পরিবেশনশিল্প; এবং তিন. পেশাভিত্তিক পরিবেশনা।

এই প্রকরণের প্রথমটি হচ্ছে—ধর্মীয় ইতিহাস, পুরাণ নির্ভর প্রদর্শনমূলক শিল্প, এদেশের গ্রাম ও শহর পর্যায়ের ধর্মাচারী জনতা তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে সে সকল পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বা বাস্তব জীবনের ঘটনা অভিনয় আকারে উপস্থাপন করে থাকেন তা-ই হচ্ছে ধর্মীয় ইতিহাস, পুরাণ নির্ভর প্রদর্শনমূলক শিল্প। এ প্রকরণের মধ্যে আছে মহররম, জন্মাষ্টমী ইত্যাদি উপলক্ষে আয়োজিত বিচিত্র শোভাযাত্রা, জারি নাচ, তাজিয়া মিছিল, নৌকাবিলাস প্রভৃতি। পুকুরে নেমে কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার বস্ত্রহরণ ও নৌকাবিলাসের অভিনয়, মন্দির বা বাড়ির উঠানে সীতার অগ্নিপরীক্ষার অভিনয়, মন্দির বা বাড়ির উঠানে শ্মশান তৈরি করে রাজা হরিশ্চন্দ্রের শ্মশান মিলনের অভিনয়, মাছ ও পশু-পাখির মূর্তি নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে 'গমীরা' উপস্থাপন ইত্যাদি। এ ধরনের পরিবেশনের মধ্যে আর আছে, মুসলমানদের লৌকিক পির খোয়াজ খিজির ও মাদার পিরের স্মরণ উপলক্ষে বেইড়া ভাসান ও মাদার পিরের বাঁশ তোলা বা মাদার বাঁশের জারি; মুসলমানি ও বিয়ের উপলক্ষে গ্রামের পুরুষ ও নারীদের উপস্থাপনে নাট্যমূলক বহুরূপী বা সঙের পরিবেশনা। উল্লেখ্য, এই সকল ধর্মীয় কৃত্যকেন্দ্রিক ভ্রাম্যমাণ পরিবেশনাসমূহ নাট্যমূলক, কখনোই তা নাট্য উপস্থাপনের আখ্যান বিন্যাসের মতো একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ গ্রহণ করে না, একটি ঘটনা এ ধরনের পরিবেশনাতে হঠাৎ করেই সূচনা করা হয় এবং হঠাৎ করেই তার ইতি টানা হয়।

উপর্যুক্ত প্রকরণের দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে—জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন এবং অসাম্প্রদায়িক উৎসবকেন্দ্রিক পরিবেশনা শিল্প, বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে নানা ধরনের শোভাযাত্রার আয়োজনে ঐতিহ্যবাহী পোশাক, বাদ্যযন্ত্র, অস্ত্রশস্ত্রসহ বাস্তব জীবন নির্ভর কিছু নাট্যমূলক ঘটনাকে শহরের নাগরিকগণ রাস্তায় রাস্তায় অভিনয় আকারে উপস্থাপন করে থাকেন। যা নিশ্চিতভাবেই ভ্রাম্যমাণ পরিবেশনের পর্যায়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস, মে দিবস, নৃত্য দিবস, নাট্য দিবস ইত্যাদি উপলক্ষে যেমন বিভিন্ন ধরনের নাট্যমূলক শোভাযাত্রা বের হয় তেমনি বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি জাতীয় দিবস উপলক্ষে ইতিহাস ও সমসাময়িক কালের বিভিন্ন চরিত্রের সাজ-পোশাকে নাট্যমূলক শোভাযাত্রা করা হয়ে থাকে।

প্রকরণের তৃতীয় ও সর্বশেষ পর্যায়ে আছে—পেশাভিত্তিক পরিবেশনা, এ ধরনের পরিবেশনা হিসেবে গ্রামের পেশাজীবী লাঠিয়ালদের লাঠি খেলা; হাট-বাজার বা গ্রামের রাস্তার ধারের বানর খেলা, সাপ খেলা, জাদু খেলা, পথ-সার্কাস ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যায়। এ প্রকরণের এ পর্যায়টি পেশাগত কারণে সম্পূর্ণরূপে অসাম্প্রদায়িক চেতনার পরিচয় বহন করে। আবার একথাও ঠিক যে, অপরাপর পরিবেশনা শিল্পের চেয়ে এ প্রকরণের অন্তর্ভুক্ত শিল্পটি বিশেষভাবে ভ্রাম্যমাণ নাট্যঐতিহ্যমূলক পরিবেশনা শিল্পের গুণাবলী ধারণ করে। কেননা, একজন সাপুড়ে যখন সাপ খেলা আয়োজনের জন্য বীণ বা ডমরু বাজিয়ে 'এই সাপের খেলা' বলতে বলতে গ্রামের পথ দিয়ে হেঁটে যান তখন তার পিছে পিছে গ্রামের শিশু-কিশোর

Dhaka University Institutional Repository

থেকে শুরু করে যুবক-বৃদ্ধেরাও কখনো কখনো ছুটতে থাকে, আর পেছনের এই লোক জমায়েত দেখেই সাপুড়ে সুবিধাজনক একটি স্থানে সাপ খেলা দেখান। আর এই সাপ খেলা দেখানোর সময় দর্শকদের সঙ্গে সাপ ও সাপুড়ের সরাসরি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ামূলক একটি উত্তেজনাময় সম্পর্ক তৈরি হয়। দর্শকদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বুঝে সাপুড়ে তার সাপের খেলাকে আকর্ষণীয় করে তোলেন। এ ধরনের সাপ খেলা দেখানোর ফাঁকে সাপুড়ে কখনো কখনো টোটকা চিকিৎসার কিছু গাছ-গাছড়া বা তাবিজ-কবজ বিক্রি করে থাকেন, কখনোবা আবার সাপের খেলার বিনিময়ে দর্শকদের কাছ থেকে সামান্য কিছু সম্মানী চেয়ে নেন। এভাবে এক স্থানের সাপ খেলা দেখানো শেষ হলে সাপুড়ে আবার নতুন আরেকটি পাড়া বা নতুন আরেকটি গ্রামে ঢুকে পড়ে আগের মতোই খেলা দেখিয়ে থাকেন। এমনই ভ্রাম্যমাণ প্রবণতা লাঠি খেলা ও জাদু খেলার রয়েছে, লাঠি খেলার আগে লাঠিয়ালরা গ্রামের পথ দিয়ে বিচিত্র শব্দে ডাক ভেঙে দর্শকদেরকে আকৃষ্ট করে কোনো একটি খোলা স্থানে জমায়েত করে তাদেরকে বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে লাঠি খেলার বিচিত্র কসরত দেখিয়ে থাকেন।

অতি প্রাচীনকাল থেকে এদেশে ভ্রাম্যমাণ পরিবেশনের শিল্পের প্রচলন রয়েছে। কালের বিবর্তনে তার স্বরূপ পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু তা একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়নি, ভবিষ্যতেও হয়তো হবে না। কেননা, যুগ ও কালের চাহিদা অনুযায়ী এক সময়ের ধর্ম নির্ভর ভ্রাম্যমাণ পরিবেশনের সূত্র ধরেই এদেশে অসাম্প্রদায়িক ভ্রাম্যমাণ পরিবেশনশিল্প হিসেবে পহেলা বৈশাখ শোভাযাত্রার প্রচলন হয়েছে, যা প্রতি বছর এদেশের ধর্মমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষের মিলনমেলার মার্যাদা অর্জন করেছে। আর বৈশাখী নাগরিক শোভাযাত্রা থেকেই পরবর্তী সময়ে জন্ম লাভ করেছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসকেন্দ্রিক শোভাযাত্রা, যাতে দেশের সাম্প্রতিক অবস্থার বিভিন্ন চিত্র সাজ-পোশাকসহ অভিনয় আকারে উপস্থাপন করা হয়।

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পরিবেশনরীতি বা নাট্যের বিষয় বৈচিত্র্য অর্জিত হয়েছে নানা ধরনের সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ভূ-প্রকৃতি, ধর্মাচার, সাহিত্য (বাচনিক ও লিখিত), পুরাণ, নৃগোষ্ঠী জীবন ও তার চিন্তা-দর্শন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। দেশ-জাতি-রাষ্ট্রের গভীরে বসবাসরত মানুষের মননে যে শিল্পিতক্ষুধা জাগ্রত থাকে, মূলত সেখান থেকেই মানুষ বিচিত্র ধরনের শিল্পসৃষ্টি করে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, বৈচিত্র্যের অভিযাত্রা মানুষের প্রকৃতিগত অধিকার। এদেশীয় নাট্যের বিষয় ও আঙ্গিকগত বৈচিত্র্যের ভেতর দিয়ে স্থানীয় মানুষের শিল্পরুচি ও শিল্পদক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব, ঐতিহ্যবাহীর নাট্যের এই বিষয়-আঙ্গিক বৈচিত্র্যের আলোচনায় বাংলাদেশের মানুষের অন্তর্গত নানন্দিক বোধ ও সৃষ্টিশীল জ্ঞানপ্রকাশের বিষয়টি আবশ্যিকভাবে ধরা পড়েছে বৈকি, সেইসঙ্গে একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্য শুধু আনন্দ বিনোদনের জন্য নয়, মানুষের জ্ঞান-দর্শন-রাষ্ট্র-সমাজ-পরিবার ও ইতিহাসচেতনার পরিচয়বাহী।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

[১] আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসংস্কৃতি*, (নয়াদিল্লি : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৮২), পৃ. ১২৯-১৪১

[২] সৈয়দ জামিল আহমেদ, *হাজার বছর : বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা*, (ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ২

[৩] সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬) পৃ. সূচিপত্র ও ভূমিকা দ্রষ্টব্য

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. [ভূমিকা] ৮-৯

[৫] Syed Jamil Ahmed, *Acinpakhi Infinity : Indigenous Theatre of Bangladesh*, (Dhaka: The University press Limited, 2000), পৃ. ১৯

[৬] রাজশেখর বসু (সারানুবাদ), *বাল্মীকি রামায়ণ*, (কলিকাতা : এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লি:, ১৩৯৬) পৃ. ভূমিকা-১

[৭] কুষ্টিয়া জেলার মঙ্গলবাড়িয়া বাজার সংলগ্ন হরেকৃষ্ণপুর গ্রামের বিখ্যাত রামকীর্তন গায়ক রামচন্দ্র মোহন্ত গোঁসাই সাধারণত এই তেরোটি পালায় বিভক্ত করে সমগ্র রামায়ণের আখ্যান আসরে উপস্থাপন করেন।

[৮] ঠাকুরগাঁও জেলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে রামযাত্রার আসর পর্যবেক্ষণ ও সংগৃহীত হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে।

[৯] জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ থেকে "বাংলাদেশের লোকায়ত রামায়ণে রাম-সীতা চরিত্র" শীর্ষক মৎকৃত এম.ফিল. গবেষণা-অভিসন্দর্ভে এ বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

[১০] সাইমন জাকারিয়া, "এই কীর্তন গান নহে", *প্রণমহি বঙ্গমাতা*, প্রথম খণ্ড, (ঢাকা : উত্তরণ, বাংলা বাজার, ২০০৪), পৃ. ৫৩-৫৪

[১১] ঢাকার সেগুনবাগিচায় অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উন্মুক্ত মঞ্চে ১৩ ডিসেম্বর ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে পরিবেশিত কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ থানার জাফরাবাদ গ্রামের রঘুনাথ সম্প্রদায়ের *লব-কুশের যুদ্ধ বা পিতা-পুত্রের পরিচয় পালার* শ্রুতিলিখন থেকে উদ্ধৃত।

[১২] লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী থানার স্বর্ণামতি মন্দিরে শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে পরিবেশিত রামলীলার আসর থেকে অডিও-টেপরেকর্ডারে ধারণকৃত সীতার অগ্নিপরীক্ষা পালার শ্রুতিলিখন থেকে উদ্ধৃত।

[১৩] উদ্ধৃতি, রামবহাল তেওয়ারী, "তুলসীদাসের রামচরিতমানসের একদিক", তাপস ভৌমিক (সম্পাদিত), *কোরক : সাহিত্য পত্রিকা*, (কলিকাতা : দেশবন্ধুনগর, বাগুইআটি, খালধার, শারদ ১৪০৫), পৃ. ৩৭১

[১৪] মৌলভীবাজার জেলা শ্রীমঙ্গল থানার ভুড়ভুড়িয়া চা-বাগানে ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে ও কাকিয়াছরা চা-বাগানে ২৪ নভেম্বর ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে ভোজপুরী রামায়ণের পাঠ্যগীতির দু'টি আসর প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা থেকে।

[১৫] সেলিম আল দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

[১৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

[১৭] সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা থানার ডুমরা গ্রামের দেবী সোমেশ্বরী সম্প্রদায়ের ঢপযাত্রা এবং মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানার আদমপুর-নয়াপত্তন গ্রামে জগন্নাথ মন্দির সংলগ্ন নাটমণ্ডপে পরিবেশিত কাশীদাসী মহাভারত-এর আসর প্রত্যক্ষণ ও শিল্পী-কলাকুশলীদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য অবলম্বনে।

[১৮] সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা থানার ডুমরা গ্রামের দেবী সোমেশ্বরী সম্প্রদায়ের ঢপযাত্রা দাতাকর্ণ-এর লিখিত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে।

[১৯] সেলিম আল দীন, *বাঙলা নাট্যকোষ*, (ঢাকা : শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, ১৯৯৮), পৃ. ১৮১

[২০] সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা থানার ডুমরা গ্রামের দেবী সোমেশ্বরী সম্প্রদায় পরিবেশিত ঢপযাত্রার *দাতাকর্ণ পালার* লিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধৃত।

[২১] সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, (কলিকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, মাঘ ১৪০০), পৃ. ৭০

[২২] মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানার আদমপুর (নয়াপত্তন) গ্রামের জগন্নাথ মন্দির সংলগ্ন নাটমন্দিরে ১৪১৪ বঙ্গাব্দের রাসপূর্ণিমার দিন সকালে মৈতৈ মণিপুরীদের পরিবেশিত কাশীদাসী মহাভারত-এর পাঠ্যগীতির অভিনয় দেখার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী।

[২৩] অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র*, (কলিকাতা : দেশ পাবলিশিং, আগষ্ট ১৯৯৬), পৃ. ৮৬

[২৪] টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর থানার পাকুল্লা গ্রামে রাধাকালাচাঁদ মন্দির সংলগ্ন নাটমণ্ডপে ৮ মে ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া থানার বাল্লোপাড়া গ্রামের বিখ্যাত কীর্তনীয়া মিহির ঘোষ ও তাঁর দলের পদাবলি কীর্তন গোষ্ঠলীলা'র পরিবেশনা প্রত্যক্ষণ এবং আসর শেষে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে কীর্তনীয়ার নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অবলম্বনে।

Dhaka University Institutional Repository

[২৫] ঢাকা জেলার সাভার থানার পালপাড়া বড় আত্রা সীতানাথ মন্দিরে নাটমণ্ডপে ১ মে ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে পরিবেশিত গোষ্ঠলীলা পালা শেষে টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর থানার পাকুল-া গ্রামের দুলাল চক্রবর্তীর এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার হতে প্রাপ্ত তথ্য।

[২৬] সাইমন জাকারিয়া, "ভক্তের চরণ বক্ষে ধরি", *প্রণমহি বঙ্গমাতা*, দ্বিতীয় পর্ব, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, বাংলা বাজার, ফেব্রুয়ারি ২০০৬), পৃ. ১১১-১১২

[২৭] মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, *বাংলার কীর্তন গান*, (কলিকাতা : সাহিত্যলোক, মার্চ ১৯৯৮), পৃ. ৫৮-৫৯

[২৮] ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা থানার বালিয়াঘাট গ্রামে নিখিলচন্দ্র বিশ্বাসের উঠানে ১৫ অক্টোবর ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে পরিবেশিত আসর থেকে প্রাপ্ত অষ্টগানের *নৌকাবিলাস পালার* লিখিত পাণ্ডুলিপি'র উদ্ধৃতি।

[২৯] সাইমন জাকারিয়া, "আউটপাড়ার পুরাণ কর্মকাণ্ড", *প্রণমহি বঙ্গমাতা*, তৃতীয় পর্ব, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, বাংলা বাজার, ফেব্রুয়ারি ২০০৭), পৃ. ১৪৫-১৪৬

[৩০] সাইমন জাকারিয়া, *প্রণমহি বঙ্গমাতা*, চতুর্থ খণ্ড, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, বাংলা বাজার, ফেব্রুয়ারি ২০০৮), পৃ. ৯৩

[৩১] প্রাগুক্ত

[৩২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

[৩৩] প্রাগুক্ত

[৩৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪-৯৭

[৩৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২-১০৩

[৩৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৪৯

[৩৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৫৯

[৩৮] সত্যেন্দ্রনাথ বসু ভক্তিসিদ্ধান্ত বাচস্পতি (সম্পাদিত), *শ্রীচৈতন্যভাগবত*, (কলিকাতা : দেবসাহিত্য কুটির, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৪২৫

[৩৯] টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা, শ্রীমঙ্গল চা-বাগান, দিনাজপুর ইত্যাদি স্থানে ২০০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শিব-কালী বিষয়ক পরিবেশনা প্রত্যক্ষ করার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে।

[৪০] নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার বগাউড়া গ্রামের রাধাকৃষ্ণ সম্প্রদায় পরিবেশিত 'মহিষাসুরবধ' পালার শ্রুতিলিখন।

[৪১] চড়ক ও কালী কাচ প্রসঙ্গ, "গ্রামাঞ্চলের একটি বছর সংক্রান্তি", *প্রণমহি বঙ্গমাতা*, দ্বিতীয় পর্ব, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০৬), পৃ. ৮৩-৮৪

[৪২] কল্যাণী মল্লিক, *নাথসম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী*, (কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫০), পৃ. ৯৮-৯৯

[৪৩] নাটোর জেলার কমরপুর গ্রামে ১৮ অক্টোবর ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে পরিবেশিত কৈগাড়িকৃষ্ণপুরের তছের মণ্ডল ও তাঁর দলের যুগীর গান-এর আসর থেকে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে।

[৪৪] সেলিম আল দীন, *বাঙলা নাট্যকোষ*, (ঢাকা : শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, এপ্রিল ১৯৯৮), পৃ. ১৭৬

[৪৫] সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, (কলিকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, মাঘ ১৪০০), পৃ. ৭৫

[৪৬] আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, (কলিকাতা : চতুর্থ সংস্করণ ১৯৬৪), পৃ. ৮৮

[৪৭] রংপুর জেলার ফতেহদুর্গাপুর গ্রামে সজবালার বাড়ির ভেতরের উঠানে ১১ জানুয়ারি ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে পরিবেশিত বিষহরির গান-এর ধারণকৃত পালার শ্রুতিলিখন থেকে উদ্ধৃত। এই পালাটির শ্রুতিলিখন করে দিয়েছেন ঢাকা থিয়েটারের নাট্যকর্মী ওয়াসিম আহমেদ।

[৪৮] নাটোর জেলার বাগাতিপাড়া থানার জামনগর গ্রামে ১৭ আগস্ট ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে মনসামঙ্গল থিয়েটার ও রাজশাহী জেলার বানেশ্বর সদরে ১৮ আগস্ট ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে রাধা-গোবিন্দ সম্প্রদায় পরিবেশিত *পদ্মাপুরাণ গান*-এর অডিও-টেপরেকর্ডারে ধারণকৃত পালার শ্রুতিলিখন থেকে উদ্ধৃত।

[৪৯] কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা থানার পরাণখালি গ্রামের দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার দলের ১৭ জুন ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে পরিবেশিত পদ্মার নাচন-এর অডিও-টেপরেকর্ডারে ধারণকৃত পালার শ্রুতিলিখন উদ্ধৃত।

[৫০] টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী থানার হরিপুর গ্রামে রুস্তম আলীর দল এবং একই জেলার ঘাটাইল থানার সিংগুরিয়া গ্রামে আব্দুল হালিমের দলের পরিবেশনা বেহুলার নাচাড়ি'র অডিও-টেপরেকর্ডারে ধারণকৃত পালার শ্রুতিলিখন থেকে উদ্ধৃত।

[৫১] সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩

[৫২] নাটোর জেলার বাগাতিপাড়া থানার জামনগর গ্রামের সাঁওতাল পাড়ায় ১৯ আগস্ট ২০০০ খিস্টাব্দে কালিকাপুর তরুণ অপেরার পরিবেশনা ভাসানযাত্রা'র অডিও-টেপরেকর্ডারে ধারণকৃত পালার শ্রুতিলিখন থেকে উদ্ধৃত।

Dhaka University Institutional Repository

[৫৩] দিনাজপুর জেলার পাবর্তীপুর থানার ডারার পাড়ে ৯ জানুয়ারি ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে পরিবেশিত কান্দনীর বিষহরির গান-এর অডিও-টেপরেকর্ডারে ধারণকৃত পালার শ্রুতিলিখন উদ্ধৃত।

[৫৪] সিলেট সদরে হাওলাদার পাড়ার মজুমদার বাড়িতে ২০ অক্টোবর ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে পরিবেশিত ঢপযাত্রা মনসামঙ্গল পালার আসর থেকে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধৃত।

[৫৫] সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩

[৫৬] হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, (কলিকাতা : জুন ১৯৮৮), পৃ. ৫৬৭

[৫৭] উদ্ধৃতি, ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, অক্টোবর ১৯৭৪) পৃ. ৩২৮

[৫৮] ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত

[৫৯] উদ্ধৃতি, প্রাগুক্ত

[৬০] ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত

[৬১] ফরিপুর জেলার কাফুরা গ্রামে ১৭ জানুয়ারি ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে পরিবেশিত ত্রিনাথের মেলা'র আসর থেকে ধারণকৃত গানের শ্রুতিলিখনের উদ্ধৃতি। দেখুন– সাইমন জাকারিয়া, "এলোরে ত্রিনাথ ঠাকুর জগতে", *প্রণমহি বঙ্গমাতা*, দ্বিতীয় পর্ব, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, বাংলা বাজার, ফেব্রুয়ারি ২০০৬), পৃ. ৬৬-৭৬

[৬২] সাইমন জাকারিয়া, "কত রূপ ধরে গাজী মসজিদে থাকিয়া", *প্রণমহি বঙ্গমাতা*, তৃতীয় পর্ব, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, বাংলা বাজার, ফেব্রুয়ারি ২০০৭), পৃ. ১৭-৬০

[৬৩] মানিকগঞ্জ জেলার কামতা-গোলরা গ্রামে ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে পরিবেশিত গাজীর যাত্রা'র অডিও-টেপরেকর্ডারে ধারণকৃত পালার শ্রুতিলিখন থেকে উদ্ধৃত।

[৬৪] ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে গত শতকের আশির দশক থেকে প্রায় নিয়মিতভাবে বিভিন্ন দলের গাজীর গানের আসর উপভোগ করার অভিজ্ঞতা থেকে।

[৬৫] মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল থানার মাইজদিহি গ্রামে পরিবেশিত *গাজীর পাইল*-এর আসর শেষে মূলগায়েন সরল মিয়া (৩৭) উক্ত তথ্য প্রদান করেন।

[৬৬] নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া থানার তারাকান্দি-রাজীবপুর গ্রামের আব্দুল জব্বার বয়াতী এবং একই গ্রামের মনসুর বয়াতী-র পরিবেশিত গাজীর গীত প্রত্যক্ষ করে এবং তাঁদের সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্য অবলম্বনে।

[৬৭] মনসুর মুসা (সম্পাদিত), *মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী*, প্রথমখণ্ড, *বঙ্গে সূফি প্রভাব*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী ১৯৯১) পৃ. ১৯০

[৬৮] ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১

[৬৯] সাইমন জাকারিয়া, "আগে যদি জানতাম আমি তুমি মাদার পীর", *প্রণমহি বঙ্গমাতা*, দ্বিতীয় পর্ব, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, বাংলা বাজার, ফেব্রুয়ারি ২০০৬), পৃ. ৮৫

[৭০] নাটোর জেলার কমরপুর গ্রামের মাদার পিরের গানের মূলগায়েন বিচ্ছাদ আলী ১৮ অক্টোবর ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর নিজ বাড়িতে এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে এমন তথ্য দেন। সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের বিশিষ্ট গবেষক কাজী সাইদ হোসেন দুলাল।

[৭১] সাইমন জাকারিয়া, "আগে যদি জানতাম আমি তুমি মাদার পীর", *প্রণমহি বঙ্গমাতা*, দ্বিতীয় পর্ব, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, বাংলা বাজার, ফেব্রুয়ারি ২০০৬), পৃ. ৭৭-১০৯

[৭২] মানিকগঞ্জ জেলার হাঁসলী গ্রাম সাইদুর রহমান বয়াতীর বাড়িতে বসে ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে এক সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে।

[৭৩] কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা থানার পরানখালি গ্রামের হাজাম গায়ক হায়দার আলী এবং ঐতিহ্যবাহী নাট্যের গবেষক ও নাট্যকার রোকনুজ্জামান রুনু'র নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে।

[৭৪] মাইকেল এ লেয়ার্ড, "খ্রিষ্টধর্ম", সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড-৩, (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৩), পৃ. ১০০

[৭৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

[৭৬] প্রাগুক্ত

[৭৭] তৃপ্তি চৌধুরী, "খ্রিষ্টান মিশনারি", সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

[৭৮] মাইকেল এ লেয়ার্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

[৭৯] গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার পিপ্রাশৈর, হাড়িখেলা ও বোয়ালিয়া গ্রাম থেকে প্রাপ্ত বৈঠকী গানের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিতে এ রকমটা লেখা দেখেছি।

Dhaka University Institutional Repository

[৮০] যেরোম ডি'কস্তা, *বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলী*, প্রথম খণ্ড, (ঢাকা : প্রতিবেশী প্রকাশনী, লক্ষ্মীবাজার, ১৯৮৮) পৃ. ১৬

[৮১] ফাদার যোসেফ ম. গোমেজ (জীবন), "রামুর পালার ইতিবৃত্ত", যোসেফ ডি. রোজারীও (সম্পাদিত), *মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিষ্ট* : রামুর পালা, (ঢাকা : পাদ্রশিবপুর খ্রীষ্টান ডেভলপমেন্ট কমিটি, ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৩), পৃ. উল্লেখ নেই

[৮২] যোসেফ ডি. রোজারীও (সম্পাদিত), *মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিষ্ট* : রামুর পালা, (ঢাকা : পাদ্রশিবপুর খ্রীষ্টান ডেভলপমেন্ট কমিটি, ১৯৯৩), পৃ. ১-৫০

[৮৩] গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার হাড়িখেলা গ্রামে করিগো বাড়ির উঠানে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে *মুক্তিদাতা যিশু : যিশুর যাতনা ভোগের পালাগান*-এর অভিনয় প্রত্যক্ষণ এবং পরিচালক প্রণয়জন রিবেরুর সাক্ষাৎকার ও আসরে ব্যবহৃত লিখিত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে।

[৮৪] গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার হাড়িখেলা গ্রাম থেকে প্রাপ্ত হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে।

[৮৫] প্রাগুক্ত

[৮৬] প্রাগুক্ত

[৮৭] সৈয়দ মুর্তাজা আলী, "কুষ্টিয়ার কথা", আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত, *কুষ্টিয়া পাবলিক লাইব্রেরী : প্লাটিনাম জুবিলী স্মারকগ্রন্থ*, (কুষ্টিয়া : ডিসেম্বর ১৯৮৫), পৃ. ২৯-৩০

[৮৮] সাইমন জাকারিয়া, "চর্যা-সংস্কৃতির আলোকে বাংলাদেশের বুদ্ধ নাটকের ঐতিহ্য অন্বেষণ", রবীন্দ্র গোপ (সম্পাদিত), *প্রতিবেদন : লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ১৪২২*, (নারায়ণগঞ্জ : বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, ২০১৫), পৃ. ২৭-২৯

[৮৯] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, চতুর্থ খণ্ড, (কলিকাতা : মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৫), পৃ. ৪০৬

[৯০] অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়, *সামাজিক চালচিত্রে যাত্রাগান*, (কলিকাতা : এপ্রিল ১৯৯৮), পৃ. ৩২

[৯১] শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ*, (কলিকাতা : আষাঢ়, ১৩৭২), পৃ. ২১৩

[৯২] সাইমন জাকারিয়া, "উতলা সুন্দরী ও কাকাধরের খেলা", *প্রণমহি বঙ্গমাতা*, প্রথম পর্ব, (ঢাকা : উত্তরণ, বাংলা বাজার, ফেব্রুয়ারি ২০০৪), পৃ. ৫৫-৮৭

[৯৩] কুষ্টিয়া জেলার স্টেডিয়াম পাড়ায় ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে এবং ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা থানার মির্জাপুর গ্রামে সাহাদত মণ্ডলের বাড়িতে ২৩ ডিসেম্বর ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে পরিবেশিত মজিবর বয়াতী ও আকরব আলী জোয়ার্দারের দলের নছিমন যাত্রার আসর প্রত্যক্ষণ এবং কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর থানার বহলবাড়িয়া গ্রামের রেজাউল হক সলকের নিকট থেকে প্রাপ্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে।

[৯৪] ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা থানার মির্জাপুর গ্রামে সাহাদত মণ্ডলের বাড়িতে ২৩ ডিসেম্বর ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে নছিমন যাত্রা পরিবেশনের আগে এক সাক্ষাৎকারে পালার পরিচালক ও অভিনেতা আকবর আলী জোয়ার্দার এ কথা জানান।

[৯৫] সৈয়দ জামিল আহমেদ, *হাজার বছর: বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা*, (ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ৩০

[৯৬] সাইমন জাকারিয়া, *প্রণমহি বঙ্গমাতা*, দ্বিতীয় পর্ব, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, বাংলা বাজার, ২০০৬), পৃ. ১২৭-১৩৩

[৯৭] প্রদ্যোত ঘোষ, "গ্রামীণ লোকনাটক : গম্ভীরা", *বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক: আলোচনা এবং সংগ্রহ*, সনৎকুমার সম্পাদিত, (কলিকাতা : লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, ডিসেম্বর ২০০০), পৃ. ৭৬

[৯৮] সাইমন জাকারিয়া, *প্রণমহি বঙ্গমাতা*, দ্বিতীয় পর্ব, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, বাংলা বাজার, ২০০৬), পৃ. ১২৭-১৩৩

[৯৯] বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে*, (কলকাতা : মনীষা গ্রন্থালয়, প্রকাশ : ১৯৯৬), পৃ. ৩

[১০০] গোলাম সারোয়ার সম্পাদিত, *লোকনাট্য সপ্তাহ ২০০৭* (স্যুভেনির), (ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ২০০৭), পৃ. ১১

[১০১] সাইমন জাকারিয়া, "পিতা-পুত্রের সঙখেলা", *প্রণমহি বঙ্গমাতা*, প্রথম পর্ব, (ঢাকা : উত্তরণ, ২০০৪), পৃ. ২৬-৩৬

[১০২] সৈয়দ জামিল আহমেদ, পৃ. ৩২

[১০৩] যতীন সরকার, *বাংলাদেশের কবিগান*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী ১৯৮৫), পৃ. ৩২

[১০৪] সৈয়দ জামিল আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

[১০৫] শফিকুর রহমান চৌধুরী, *আবদুল হালিম বয়াতী : জীবন ও সঙ্গীত*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০০), পৃ. ২২৩

[১০৬] জসীমউদ্‌দীন, *জারীগান*, (ঢাকা : কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড, জানুয়ারি ১৯৬৮), পৃ. ৫-৬

[১০৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১২

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ভাষা বিচার

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্য তথা 'লোকনাট্য'-এর পরিচয় দিতে গিয়ে অধিকাংশ গবেষক বলেন : এ ধরনের নাট্যরীতি হল—১. লোকজীবনের কাহিনি-নির্ভর, ২. মুখে মুখে রচিত এবং অভিনীত, ৩. গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে আঞ্চলিকভাবে পরিবেশিত এবং ৪. এতে মূলত আঞ্চলিক ভাষায় সংলাপ ব্যবহার করা হয়।[১] ক্ষেত্রবিশেষে একথাও উল্লেখ থাকে যে, 'লোকনাট্য' তথা ঐতিহ্যবাহী নাট্যের কোনো লিখিত পাণ্ডুলিপি হয় না।[২] কিন্তু বাংলাদেশে প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী নাট্যের জনসাংস্কৃতিক সমীক্ষণে ভিন্নতর অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়; বর্তমান অধ্যায়ে সেই অভিজ্ঞতার আলোকে প্রথমত বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্য তথা 'লোকনাট্য' সম্পর্কে পূর্বে প্রচলিত মতগুলি খণ্ডন করা হচ্ছে, দ্বিতীয়ত জনসাংস্কৃতিক সমীক্ষণ থেকে সংগৃহীত মৌখিক ও লিখিত পাণ্ডুলিপি বা নাটলিপির ভাষার বৈশিষ্ট্য, শব্দ চয়ন ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হচ্ছে।

পূর্ববতী অধ্যায়ে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ইতিহাস, শ্রেণিবিন্যাস, বিষয় ও আঙ্গিক-বৈচিত্র্যের আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে—এদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্য [লোকনাট্য] সকল ক্ষেত্রে লোকজীবনের কাহিনি-নির্ভর নয়, এমনকি তা কেবল মুখে মুখেও রচিত নয়, অনেক ক্ষেত্রে তার লিখিত পাণ্ডুলিপি লভ্য এবং তা অভিনয়ের সময় আসরে বা মঞ্চে দর্শক-শ্রোতাদের সামনে পালাকার বা প্রম্পটার [Prompter] কর্তৃক ব্যবহৃত হয়।[৩] এছাড়া, বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের আঞ্চলিকতার বিষয়টিও মাঝে মধ্যে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে; কেননা, এদেশের কিছু পরিবেশন শিল্পী-পালাকারের নিজস্ব এলাকা বা আঞ্চলিকতার গণ্ডি অতিক্রম করে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন; বিশেষ করে যাত্রাগান, পুতুলনাচ ইত্যাদি ঐতিহ্যবাহী নাট্যকে আঞ্চলিক শিল্প হিসেবে বিচার করার কোনো সুযোগ নেই। এ ধরনের নাট্যশিল্পের শিল্পীরা পেশাগত কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে বিহার করেন এবং নানা স্থানে গিয়ে আঞ্চলিক শিল্পের আঞ্চলিক গণ্ডি ভেঙে তা বিভিন্ন এলাকায় পরিবেশন করেন। আসলে, আঞ্চলিক পরিবেশশিল্প হিসেবে ঐতিহ্যবাহী নাট্যকে উল্লেখ করা হলেও এই শিল্পরীতি অনেক সময় ধর্ম-সাংস্কৃতিক কারণে একটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা আঞ্চলিক সীমানা অতিক্রম করে এবং একই ভাষাভাষী অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। প্রসঙ্গক্রমে বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের *চৈতন্যচরিতামৃত* বা বৃন্দাবন দাসের *চৈতন্যভাগবত* অবলম্বনে পরিবেশিত ঐতিহ্যবাহী নাট্য 'পদাবলি কীর্তন' বা 'লীলা কীর্তনে'র কথা বলা যায়। নাটোর-সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের মিহির ঘোষ,

Dhaka University Institutional Repository

ফরিদপুর অঞ্চলের অমল ব্যানার্জী, টাঙ্গাইলের মির্জাপুর থানার পাকুল্লার দুলাল চক্রবর্তী, নওগাঁর শ্রীমতি অনিতা রানী দেবনাথ প্রমুখ কীর্তনীয়া তাঁদের পরিবেশনের আঞ্চলিক গণ্ডি অতিক্রম করে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রাধা-কৃষ্ণলীলা ও গৌরাঙ্গলীলার বিভিন্ন আখ্যান-নাট্য 'পদাবলি' বা 'লীলাকীর্তন' শীর্ষক নাট্যাঙ্গিকে পরিবেশন করেন।[৪] এছাড়া, বাংলাদেশের অষ্টকগানের ঐতিহ্য দেশ-রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করে ভারতের চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি জেলার বিভিন্ন গ্রামে পরিবেশিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ নির্দেশক-অভিনয়শিল্পী এখনও আসরগুলোতে প্রধানত বাংলাদেশের ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল অঞ্চলের পালাকারদের হস্তলিখিত নাটলিপি বা পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেন।[৫] আবার পশ্চিমবঙ্গের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ঐতিহ্যনাট্যের শিল্পীদের কেউ কেউ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় নাট্য পরিবেশন করেন।[৬] ঐতিহ্যবাহী নাট্যের আঞ্চলিকতা অতিক্রমের দৃষ্টান্ত হিসেবে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সময়ের জনপ্রিয় ঐতিহ্যবাহী পরিবেশন 'নছিমন' নামের বিশেষ প্রকারের নাট্যরীতির কথাও উল্লেখ করা যায়। এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষণ বা জনসাংস্কৃতিক সমীক্ষণের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়—এ ধরনের পরিবেশনের প্রচলন সুনির্দিষ্ট কোনো আঞ্চলিক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং তার বিস্তৃতি রয়েছে ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া থেকে শুরু করে পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, এমনকি দিনাজপুর, রংপুর পর্যন্ত। যথাযথ জনসাংস্কৃতিক সমীক্ষণের অভাবে অনেক গবেষক 'নছিমন' নাট্যাঙ্গিককে কোনো কোনো সুনির্দিষ্ট এলাকা, যেমন—কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ বা সিরাজগঞ্জ ইত্যাদি এলাকার বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু, এর বিস্তৃতি যে এদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও রয়েছে তা অদ্যাবধি স্বীকৃত হয়নি। মোটকথা, ক্ষুদ্র আঞ্চলিক গণ্ডিকে অতিক্রম করে ঐতিহ্যবাহী নাট্য কখনো কখনো বৃহত্তর গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক সম্পদে পরিণত হয়। এ রকম বহু দৃষ্টান্ত নিশ্চিতভাবে আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে, যার যথাযথ জনসাংস্কৃতিক সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। উল্লেখ করতে দ্বিধা নেই, এ ধরনের গবেষণা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের বেশ কিছু ঐতিহ্যবাহী নাট্যাঙ্গিক ক্ষুদ্র অর্থে আঞ্চলিক পরিবেশনশিল্প হিসেবে বিবেচনা করে, বৃহত্তর সমাজে গৃহীত ও প্রচলিত নাট্যঐতিহ্য হিসেবে প্রমাণ করা সম্ভব।

ভাষাতাত্ত্বিকের বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় :

> ...ভাষার মূল উদ্দেশ্য মনোভাব জ্ঞাপন নয়, মনোভাব 'প্রকাশ' বা expression। ভাষাতাত্ত্বিকেরা ভাষার ভূমিকাগুলির মধ্যে কেবল মনোভাব-জ্ঞাপন (communication) এবং মনোভাব প্রকাশ (expression)-এর মধ্যে প্রকরণ ও বিষয়গত তফাত করেন। ভাষার 'প্রকাশ' কর্মে শুধু যে আবেগগত তীব্রতা আসে তাই নয়, এতে ভাষারও খানিকটা প্রমুখণ (foregrounding) ঘটে। অর্থাৎ ভাষা শুধু বিষয়ের বা বক্তব্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে না, সে নিজে নিজের দিকেও শ্রোতার খানিকটা মনোযোগ আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

ভাষার এই মনোযোগ আকর্ষণ প্রবণতাই হয়তো এই অভিসন্দর্ভ রচনার গভীরে কোনো একক্ষণে প্রেরণায় সঞ্চার করেছে। কেননা, এদেশের বিভিন্ন প্রান্তে জনসাংস্কৃতিক সমীক্ষণে গেলে ঐতিহ্যবাহী নাট্যের আসরে নানা ধরনের ভাষা প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করা যায়, কোথাও নিরেট আঞ্চলিক শব্দ চয়নে বা স্থানীয় মানুষের কথ্য ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে নাট্য উপস্থাপিত হয়, কোথাও আবার সংস্কৃত বহুল শব্দ চয়নে 'মান্য বা আদর্শভাষা' প্রয়োগে শিষ্ট বাংলায় নাট্য পরিবেশিত হয়।[৮] শুধু তাই নয়, এদেশের অনেক নাট্য পরিবেশনে সংস্কৃত মন্ত্র, প্রণাম, শ্লোক; আরবি-ফারসি শব্দ; এমনকি ইংরেজি শব্দ এবং বিভিন্ন ধরনের আদিবাসী শব্দ ও ভাষা ব্যবহৃত হয়। এ অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে এ ধরনের মন্তব্যের যথার্থতার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

দুই

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ভাষা-বিচারের ক্ষেত্রে উপস্থাপনরীতির দিক থেকে দুই ধরনের পাণ্ডুলিপিকে গ্রহণ করা হচ্ছে—১. বাচনিক বা মৌখিকরীতির পাণ্ডুলিপি এবং ২. হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি।[৯] এছাড়া, বিষয়গত দিক থেকে ঐতিহ্যবাহী নাট্যের সনাতন, বৈষ্ণব, ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্ট ও অন্যান্য ধর্মীয় পরিবেশনের পাশাপাশি লোককাহিনি, রূপকথা-উপকথা বা সাধারণ লোকজীবনের পারিবারিক ও সামাজিক ঘটনা নির্ভর নাট্যপালা, এমনকি সমতল ও পাহাড়ে বসবাসরত অবাঙালী বিচিত্র নৃগোষ্ঠী বা আদিবাসী সমাজে প্রচলিত নাট্যরীতিকে বিবেচনায় গৃহীত হয়েছে।

প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে, ধর্মীয় হোক আর লোকজীবন হোক, অথবা হোক রূপকথা-উপকথার নাট্য পরিবেশন সবক্ষেত্রে হস্তলিখিত ও মৌখিকরীতির দুই ধরনের পরিবেশনের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন—*রামায়ণের* আখ্যান নির্ভর কাহিনি কখনো ভক্তিভাবে লিখিত হয়েছে, আবার কখনো ভক্তিরসে সম্পূর্ণ মৌখিকরীতিতে তথা বাচনিকশিল্প হিসেবে অলিখিতভাবে তাৎক্ষণিক অভিনয়ের মাধ্যমে লোকমানুষের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—কোনো কোনো অঞ্চলে *রামায়ণের* কাহিনি নিয়ে 'রামযাত্রা' বা 'ঢপযাত্রা'র নাট্যাঙ্গিকে পরিবেশনের জন্য 'লক্ষ্মণ-শক্তিশেল', 'রাম-সীতার বিবাহ', 'রাম-লক্ষ্মণ ও সীতার বনবাস', 'রাম বিহীন অযোধ্যা' ইত্যাদি পালার হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় এবং সে সকল লিখিত পাণ্ডুলিপিকে আশ্রয় করেই তা দর্শকের সামনে পরিবেশিত হয়; অন্যদিকে কোনো কোনো অঞ্চলে তা 'রামকীর্তন', 'রামমঙ্গল' ইত্যাদি নাট্যাঙ্গিককে মৌখিকরীতিতে আসরে পরিবেশিত হয়।

একথা ইসলাম ধর্মীয় নাট্যঐতিহ্যের ক্ষেত্রে সত্য, যেমন—কারবালার কাহিনি-নির্ভর পরিবেশনশিল্প 'জারিগান', 'জারিনাচ' ইত্যাদি মৌখিকরীতিতে আসরে উপস্থাপিত হয়; অন্যদিকে একই আখ্যান 'ইমামযাত্রা'র নাট্যাঙ্গিকে পরিবেশনের জন্য পাণ্ডুলিপি আকারে লিখিত হয় এবং মঞ্চে বা আসরে তা পরিবেশিত হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

বৈষ্ণবদের নাট্যঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত 'পদাবলি কীর্তন' বা 'লীলাকীর্তন' মূলত বাচনিকশিল্প বা মৌখিকরীতি পরিবেশনশিল্প; তবে, একই ধরনের পৌরাণিক কাহিনি-নির্ভর নাট্য 'কৃষ্ণলীলা', 'কৃষ্ণযাত্রা' ইত্যাদি পরিবেশনরীতি সাধারণত হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিকে অনুসরণ করে।

পর্যবেক্ষণে দেখা যায়—বাচনিক বা মৌখিকরীতির হলেই বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের পরিবেশনে লোকভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করা হয় না, আবার লিখিত হলেই তা শিষ্টভাষা বা সংস্কৃত বহুল শব্দের মিশ্রণে সর্বজনগ্রাহ্য মান্য [মার্জিত] ভাষায় বা সাধু ভাষায় পরিবেশিত হয় না। ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ভাষায় আঞ্চলিক ও শিষ্ট বা মান্যভাষা প্রয়োগের মূলে লৈখ্যরূপ বা মৌখিকরূপ কোনো কার্যকর ভূমিকা পালন করে না। আসলে, যে সকল ঐতিহ্যবাহী নাট্যের বিষয়বস্তু বা আখ্যানবস্তুর একটি ধ্রুপদী বা সাহিত্যিকভিত্তি পূর্ব হতেই রয়েছে—সাধারণত সে সকল ঐতিহ্যবাহী নাট্যের পরিবেশনাতে সংস্কৃত শব্দ বহুল সংলাপ-বাক্য-গীত চয়নে সর্বজনগ্রাহ্য আদর্শভাষা বা শিষ্ট ভাষারীতি প্রয়োগ লক্ষ করা যায়, এক্ষেত্রে মৌখিক বা লিখিত যে রীতিতেই তা পরিবেশিত হোক না কেন—প্রায় সকল পর্যায়ে শুদ্ধ ভাষারীতি প্রত্যক্ষ করা যায়। অন্যদিকে যে সকল ঐতিহ্যবাহী নাট্যের বিষয়বস্তু সরাসরি গ্রামীণ মানুষের সমাজ-জীবন থেকে গৃহীত হয়—সে সকল পরিবেশনে অধিকাংশ সময় আঞ্চলিক বা স্থানীয় কথ্য ভাষারীতির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। আবার এও প্রত্যক্ষ করা যায়—যে সকল আখ্যানবস্তু রূপকথা, লোককথা, উপকথা আশ্রিত এবং ক্ষেত্রবিশেষে তার সঙ্গে যেমন সাহিত্যিকভিত্তি ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন-সাংস্কৃতিক চিত্র প্রকাশিত হয়—সে ধরনের পরিবেশনে সর্বজনগ্রাহ্য শিষ্ট ও আঞ্চলিক—দুই ধরনের ভাষারীতির সমন্বিত প্রয়োগ বা মিশ্রভাষারীতি প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করা যায়।

২.১ ধ্রুপদী আখ্যান-নাট্যের ভাষারীতি

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের পালাকার-শিল্পী-গায়ক কর্তৃক গ্রামের মানুষের সম্মুখে *রামায়ণ*, *মহাভারত*, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* ইত্যাদি আখ্যানকাব্যের উপস্থাপনকে 'ধ্রুপদী আখ্যান-নাট্য' পরিবেশন হিসেবে শনাক্ত করা যায়। গ্রামের মানুষের কাছে এ ধরনের ধ্রুপদী আখ্যানের পরিবেশন নানা নামে ও নানা ভাব সমাদৃত। *রামায়ণে*র কাহিনি-নির্ভর পরিবেশন কোথাও 'রামলীলা', কোথাও 'রামকীর্তন', 'রামমঙ্গল', 'রামযাত্রা' ইত্যাদি নাট্যাঙ্গিকে প্রচলিত। কৃত্তিবাসী *রামায়ণে*র কাহিনি আশ্রিত মৌখিকরীতির পরিবেশনশিল্প 'কুশানগান' ও 'রামলীলা' বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী উত্তরবঙ্গের কুড়িগ্রাম-লালমনিরহাট প্রভৃতি অঞ্চলে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এ ধরনের পরিবেশনরীতিতে সাধক-শিল্পীগণ কৃত্তিবাসী *রামায়ণে*র সমগ্র কাহিনি উপস্থাপন করতে সক্ষম।[১০]

ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ভাষা বিচারের প্রয়োজনে নিম্নে লালমনিরহাটের আদিতমারী স্বর্ণমতি মন্দির প্রাঙ্গণে কৃপাসিন্ধু রায় সরকার কর্তৃক পরিবেশিত 'রামলীলা'র মৌখিকরীতির আসর থেকে শব্দযন্ত্রে

Dhaka University Institutional Repository

ধারণকৃত 'সীতার অগ্নিপরীক্ষা' পালার শ্রুতিলিখনের প্রথমাংশের উদ্ধৃত ও বিশ্লেষণ করা হল।[১১] এ ধরনের নাট্য পরিবেশনের শুরুতেই থাকে বন্দনা, তা হল :

নিজ গুণে কৃপা করে একবার এসো
এসো হে জগতের কাণ্ডারি
ধনীগণে পূজে তোমায় নানা উপাচারে
কি দিয়া পূজিব বল—আমি কি দিয়া
মন্ত্রহীন ভক্তিহীন জ্ঞানহীনও আমি
জ্ঞানহীনও আমি হে
ওই নাম পতিত পাবন
নিজ গুণে হৃদয়ে মাঝে
এসে তুমি হও অধিষ্ঠান॥

অখণ্ড মণ্ডলা কারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম।
তদপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ॥
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলিত যেন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ॥
গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর।
গুরু রেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ॥

হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপথে।
গোপেশ গোপীকা কান্ত রাধা কান্ত নমহস্তুতে॥
ওঁ ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রহ্মণ্য হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় বাসুদেবায় নমো নমঃ॥[১২]

উপর্যুক্ত বন্দনাংশের প্রথম স্তবকে তৎসম, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দের আধিক্য প্রত্যক্ষ করা যায়; যেমন—'নিজ গুণে', 'কৃপা করে', 'জগতের কাণ্ডারি', 'উপাচার', 'পূজিব', 'মন্ত্রহীন', 'ভক্তিহীন', 'জ্ঞানহীন', 'পতিত পাবন', 'হৃদয় মাঝে', 'অধিষ্ঠান' ইত্যাদি শব্দের অধিকাংশই তৎসম তথা সংস্কৃত এবং তদ্ভব। উল্লেখ্য, স্থানীয় গায়কগণ এ সকল শব্দ উচ্চারণে কখনো কখনো আঞ্চলিক ভঙ্গি প্রয়োগ করেন, যেমন—'উপচার' শব্দটি গায়কের আঞ্চলিক উচ্চারণ ভঙ্গিতে 'উপাচার' হয়ে ওঠে।[১৩] তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংস্কৃত প্রভাবিত ভাষার গাম্ভীর্য গায়কের উচ্চারণে রক্ষিত হয়ে থাকে। যে কারণে দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে গায়কের প্রতি উচ্চ ধারণা তৈরি হয়, সে ধারণা আরও অধিক প্রতিষ্ঠা পায় গায়কের পরবর্তী কার্যক্রমে।

Dhaka University Institutional Repository

আসলে, ধ্রুপদী আখ্যানের গায়কগণ প্রথম স্তবকের তৎসম ও তদ্ভব শব্দের মিশ্রণে 'জগতের কাণ্ডারি' তথা স্রষ্টাকে আসরে আহ্বানের পর দ্বিতীয় স্তবকে পরিবেশনের শাস্ত্রীয় কাঠামো যুক্ত করেন সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন প্রণাম-মন্ত্র বা শ্লোক উচ্চারণে, যা উপর্যুক্ত 'রামলীলা'র আসরের উদ্ধৃতিতে প্রত্যক্ষ করা যায়। আসরে বন্দনাংশে গায়ক যথাক্রমে সংস্কৃতভাষায় 'গুরু প্রণাম' ও 'শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম' করে শাস্ত্রীয় একটা ভাবের সঞ্চার করেন।

প্রশ্ন আসতে পারে—১. গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিবেশিত নাট্যগীতে এ ধরনের শিষ্টভাষা ও সংস্কৃত প্রণাম মন্ত্র বা শ্লোকের সুরেলা সংগীত-কথা উপস্থাপনের কারণ কী? ২. গ্রামীণ জীবনে যেখানে এখন আর কোনো সংস্কৃতশিক্ষা চর্চা তেমনভাবে নেই, সেখানে গায়ক এ ধরনের সংস্কৃতভাষাজ্ঞান কীভাবেইবা পেলেন? দর্শক-শ্রোতাগণইবা কীভাবে এই সংস্কৃতভাষার ভাবসঞ্চারের সাথে নিজেকে একাত্ম করতে সক্ষম হন?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে, নাট্যপরিবেশনের উপলক্ষ্য ও আসরে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতা সম্পর্কে কিছু কথা উল্লেখ করতে হয়। প্রথমত বলতে হয় যে, গায়ক কৃপাসিন্ধু রায় সরকার কর্তৃক সংস্কৃত প্রণাম বাক্য বা শ্লোক এবং তৎসম, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দের সংযোগে গীত উপস্থাপনের প্রধান কারণের সাথে উপলক্ষ্যের বিষয়টিই প্রধানভাবে যুক্ত। আসলে, শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে 'রামলীলা'র পরিবেশনের আয়োজন করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, আসরের অধিকাংশ দর্শক-শ্রোতা ছিলেন সনাতনধর্মীয় লৌকিক বিশ্বাসী মানুষ; তাই পুরো আসর জুড়ে শাস্ত্রীয় ভক্তির স্ফূরণ ছড়িয়ে দেবার প্রয়োজন ছিল। গায়ক মূলত সে বিষয়টি বিবেচনা নিয়েই তৎসম ও তদ্ভব শব্দের মিশ্রণে বাংলা ভাষায় গীত উপস্থাপনের পাশাপাশি সংস্কৃত প্রণাম-মন্ত্র বা শ্লোকের উচ্চারণে মাধ্যমে শ্রোতা-দর্শকের ভেতর শাস্ত্রীয় ভক্তিরস ও শাস্ত্রীয় দেবতা শিবের প্রতি অপরিসীম বিশ্বাস প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, *রামায়ণে*র আখ্যান অবলম্বনে পরিবেশিত ঐতিহ্যবাহী নাট্যরীতি 'রামলীলা'র পরিবেশনের একটি শাস্ত্রীয় বিধান বা মার্গীয় ভিত্তি বাংলাদেশের সর্বত্রই সুদূর অতীত থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বহমান, তাই গায়ক খুব সহজেই গুরু-শিষ্য পরম্পরার উত্তরাধিকার ও বাচনিক বা মৌখিকরীতির ঐতিহ্যিক চর্চাকারী হিসেবে এ ধরনের ভাষারীতি প্রয়োগ করতে সক্ষম হন। এ সম্পর্কে চমৎকার একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় পবিত্র সরকারের *লোকভাষা লোকসংস্কৃতি* শীর্ষক গ্রন্থে, যথা :

> ভাষাবিজ্ঞান যুক্তিবদ্ধ—তা পর্যবেক্ষণ, প্রমাণ, সাধারণীকরণ, আবার যাচাই ইত্যাদি গবেষণা ও বিচারজাত সিদ্ধান্তের সমষ্টি। কিন্তু লৌকিক ভাষাতত্ত্ব মূলত অনেক লোকের মনগড়া ধারণার সমষ্টি—সে ধারণা তারা কোনো একটা সাধারণীকরণ থেকে উপার্জন করেছে, কিন্তু যুক্তিতথ্য দিয়ে বারবার যাচাই করবার প্রয়োজন বোধ করেনি। এই বিশ্বাস বিনা সংশয়ে বিনা

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্নে গৃহীত, উত্তরাধিকার বা অন্যের আরোপিত আপ্তবাক্য হিসেবে পাওয়া। অর্থাৎ অন্য যে কোনো সংস্কার বা বিশ্বাসের মতোই।[১৪]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতির ইশারা থেকে একথা স্পষ্টত বলা চলে যে, ঐতিহ্যবাহী নাট্যের বিষয়ের সাথে সংগতি রেখে অতীতের কোনো 'সাধারণীকরণ থেকে উপার্জন'কৃত এবং সেই ভাষাগত ঐতিহ্য নাট্যের আসরে 'উত্তরাধিকার' সূত্রে চলমান রয়েছে। এক্ষেত্রে 'উত্তরাধিকার'সূত্রে প্রাপ্ত 'রামলীলা'র ভাষার শিষ্ট ঐতিহ্য গায়ক ও দর্শক-শ্রোতার অভিজ্ঞতার সাথে সমমাত্রায় গ্রথিত রয়েছে বলে তার সংস্কৃত, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দের মিশ্রণ অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং আসর জুড়ে শাস্ত্রীয় ভাবসঞ্চারে সহায়ক হয়।

'রামলীলা' পরিবেশনের বন্দনাংশ এবং গুরু প্রণাম ও শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম শেষ হলে গায়ক সাধারণত সুর-বাণীর গীতল ভঙ্গি থামিয়ে গদ্য-কথনের সূচনা করেন।

এ পর্যায়ে আসরে গায়ক কৃপাসিন্ধু রায় সরকার বলেন :

> নামামৃত কাণ্ডারি। আদ্যাশক্তির অংশভুতা জগৎজননী মা-ভগ্নিগণ, আমার প্রাণাধিক ভক্তমণ্ডলী, আপনাদের সবার শ্রীচরণে আমার কোটি কোটি প্রণতি। আপনারা এই লালমনিরহাট ডিস্টিকের মধ্যে এই আদিতমারী বিশেষ করে ভাদা ইউনিয়ন আমাকে এতো বেশি ভালোবাসেন যে ভালোবাসা বাংলা ৮০ সাল থেকে আজ ১৪১৩ সাল গত হয়ে যাচ্ছে দীর্ঘদিন আপনাদের ভালোবাসা আপনাদের স্নেহ আপনাদের আশীর্বাদ পেয়ে আজ আমি কৃপাসিন্ধু। নইলে কৃপাসিন্ধু হিসেবে আরেকটি নাম–আমি কিন্তু কোথাও খুঁজে পাইনি। আমার মিত্র করার মতো কাউকে এতোদিনে আমি খুঁজে পাইনি। এই কৃপাসিন্ধু নাম আপনাদেরই দেওয়া। বাংলা ৮০ সালে আমি এসেছিলাম সর্বপ্রথম আপনাদের এই ভাদা ইউনিয়নে। আজ এতোদিন আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন করে আপনাদের কৃপায় আপনাদের দয়ায় আজ আমি কৃপার থেকে সিন্ধু হয়েছি। আমাকে কিন্তু আগে কৃপাসিন্ধু বলে কেউ ডাকতো না। মা ডাকতো কৃপা করে, বাবা ডাকতো কৃপা করে, আর গ্রামবাসীরা সবাই ডাকতো কৃপা করে, কেউবা কিরপা করে। কৃপাসিন্ধু আমি হয়েছি–এই লালমনিরহাট ডিস্টিকের বিশেষ করে ভাদা ইউনিয়নের ভক্তবৃন্দের কৃপা বলে। আপনাদের আশীর্বাদে দীর্ঘদিন আমার এই কীর্তনের বয়সে আপনাদের এই ভালোবাসা রাখার মতো ভাণ্ড আমার নেই। আজ নতুন করে আপনাদের আমি কী শুনাবো। এতোদিন যা শুনিয়ে গেছি আজও তাই শুনাবো। এই রামায়ণের কিছু কথা ছাড়া আর অন্য শাস্ত্র আমার পড়ারও সৌভাগ্য হয়নি, অন্য শাস্ত্রের প্রতি আমার প্রেমও নেই।
>
> যখন আমি ছোট ছিলাম মায়ের কোলে শুনেছিলাম এই রামায়ণ গান–তোমার ঘণ্টা বাজার সাধ নইলে। এই ঘণ্টা বাজার সাধ নইলে–আমি মায়ের কোলেই শিখেছি। মায়ের

Dhaka University Institutional Repository

কোল থেকে আজ আমি দীর্ঘদিন যাবৎ এই রামায়ণের ঘণ্টা বাজিয়ে যাচ্ছি। জানি না, কবে আমার এই ঘণ্টা বাজা শেষ হয়ে যাবে।

সম্মানিত ভক্তমণ্ডলী, প্রাণাধিক মাতৃভক্তগণ আজকে আমি যে পালাটি গাইবো-লঙ্কাকাণ্ডে প্রভু রামচন্দ্র রাবণকে বধ করার পর জানকী সীতাকে উদ্ধার করে লবণ সমুদ্র তীরে নিয়ে এলেন এবং তাকে অগ্নিপরীক্ষা করা হল। তারপরে প্রভু রামচন্দ্র যখন সমুদ্র বন্ধন করেছিলেন শিবের সঙ্গে তিনি একটা প্রতিশ্রুতি করেছিলেন–'হে দেবাদিদেব মহাদেব, এই সমুদ্র বন্ধন করে যদি আমি আমার জগৎলক্ষ্মী সীতা উদ্ধার করতে পারি, অযোদ্ধা ফেরার পূর্বে লবণ সমুদ্র তীরে আমি তোমার নিজ হাতে পূজো করে তারপর অযোদ্ধায় যাবো। আজ শিব চতুর্দশী রাত্রিতে প্রভু রামচন্দ্র শিব পূজা করেন লঙ্কার সমুদ্র তীরে, আজকের গান এই কাণ্ডটা নিয়ে।[১৫]

এই গদ্য-কথনে তৎসম, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়, যেমন–'নামামৃত কাণ্ডারি', 'আদ্যাশক্তি', 'অংশভুতা', 'জগৎজননী', 'মা-ভগ্নিগণ' 'প্রাণাধিক ভক্তমণ্ডলী', 'শ্রীচরণ', 'প্রণতি', 'আশীর্বাদ', 'শাস্ত্র', 'জগৎলক্ষ্মী', 'চতুর্দশী রাত্রি' ইত্যাদি। এ ধরনের শিষ্ট শব্দ চয়নের মধ্যে গায়ক এক পর্যায়ে বেশ অনায়াসে 'ইংরেজি শব্দের মৌখিক রূপান্তরে' জেলার পরিবর্তে ডিস্টিক (district) শব্দটি প্রয়োগ করেন, যা মুহূর্তের ভাষার মধ্যে সমকালিক ব্যঞ্জনা টেনে আনে। কেননা, বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনে সমকালে এ ধরনের বহু ইংরেজি শব্দের ব্যবহার চলছে।

উল্লেখ্য, 'রামলীলা'র এই উপস্থাপনটি কৃপাসিন্ধু রায় সরকার যদিও পরিবেশন করছেন–লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলার একেবারে নিখাঁদ গ্রামীণ আসরে, সাধারণ একটি মন্দির প্রাঙ্গণে এবং যে অঞ্চলের একটি বলিষ্ঠ লোকভাষাও রয়েছে। কিন্তু গায়ক কৃপাসিন্ধু তাঁর কথা মধ্যে পরিপূর্ণ তৎসম, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দের প্রয়োগে অনেকটাই মান্যভাষায় কথা বলেন, ক্ষেত্রবিশেষে সংস্কৃত প্রণাম-মন্ত্র, শ্লোক ইত্যাদি প্রয়োগ করেন। এর মূল কারণ, *রামায়ণ*-কাহিনির প্রতি গায়কের স্বাভাবিক এক ধরনের শাস্ত্রীয় ভক্তিরসের প্রাবল্য। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের *রামায়ণে*র আখ্যান পরিবেশনের প্রায় সর্বত্র এ ধরনের শাস্ত্রীয় ভক্তিরসের আধিক্য প্রত্যক্ষ করা যায়। এ পর্যায়ে অন্য অঞ্চলের বাচনিক বা মৌখিকরীতির *রামায়ণ* পরিবেশনে একই ব্যাপার ঘটে কি-না, তা যাচাই করে দেখা যাক।

বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলায় কৃত্তিবাসী *রামায়ণে*র আদর্শ অনুসরণে 'রামকীর্তন' বা 'রামমঙ্গলে'র পরিবেশন অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। বিভিন্ন পূজা-পার্বণে তো বটেই, এমনকি শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে বা বিভিন্ন মানতে 'রামকীর্তনে'র বিভিন্ন পালা পরিবেশিত হয়ে থাকে। এবারে ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ভাষা বিচারের নিমিত্তে কুষ্টিয়া জেলার রামচন্দ্র মোহন্ত গোঁসাই পরিবেশিত রামকীর্তনের 'অশ্বমেধযজ্ঞ পালা'র অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

এই পালার শুরুতে সম্মিলিত বাদ্যবাদনের পর গায়েনের ভূমিকায় রামচন্দ্র মোহন্ত গোঁসাই হারমোনিয়ামটি নিজের কাছে টেনে নিয়ে ভরাট কণ্ঠে রাগ সাধতে থাকেন—'মা আ আ আ।' 'মা' ধ্বনির রাগচর্চার মধ্যে তিনি এক সময় বাংলা ও সংস্কৃত কথা আরোপ করেন :

ওম গুরুদেব মহেশ্বর।
অখণ্ড মণ্ডলা কারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম।
তদপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ॥
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলিত যেন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ॥
গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর।
গুরু রেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ॥

বন্দে বন্দে আসরে যত ভক্তবৃন্দ
বন্দে সর্বজন
হরে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম।
রাম রাম রাম হরে হরে॥

ওরে এসো রাম-সীতা
তুমি দয়া করে এসো হে রাম॥
ও রাম, তোমার ভজনও না জানি।
তুমি পার করো নিজ গুণে।
ও রাম, তুমি একবার এসো হে॥
তোমার ভক্তবৃন্দ সঙ্গে লয়ে
ডাকি যে তোমার
আমি ভজন না জানি॥[১৬]

এখানে বন্দনার পূর্বেই গায়ক সংস্কৃতভাষায় গুরু প্রণাম প্রয়োগ করেছেন। সংস্কৃতে গুরু প্রণামের ঠিক পর পরই মূলত বন্দনাগীত শুরু করেন। এক্ষেত্রে বন্দনায় গায়ক তৎসম, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দের বহুল প্রয়োগে শ্রীরামচন্দ্রকে শরণ করেছেন এবং নিজের দীনতা স্বীকার করে আসরের সাফল্যের জন্য স্বয়ং রামচন্দ্রকে আহ্বান করেছেন। আর এই আহ্বানগীতের সুর-বাণীর মধ্যে গায়ক তৎসম, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দের মধ্যে 'ভক্তবৃন্দ', 'সর্বজন', 'নিজ গুণ', 'সঙ্গ', 'ভজন' ইত্যাদি প্রয়োগের মাধ্যমে গানের ভাষায় শিষ্টরূপ নির্মাণ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তৎসম, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দের প্রয়োগে সমাপ্ত বন্দনা গীতের পর গায়ক সাধারণত রামায়ণের নির্ধারিত আখ্যান বর্ণনার অবতারণা করেন। কুষ্টিয়ার রামচন্দ্র মোহন্ত গোঁসাই আখ্যান বর্ণনা শুরু করেন এভাবে :

> প্রভু রামচন্দ্রের পিতা অযোধ্যার ভূপতি একের পর এক করতে করতে নয় হাজার বৎসর রাজত্ব করে ইহলোক ত্যাগ করে পরলোকে গমন করেছেন। এখন তার পুত্র শ্রীরামচন্দ্র এগারো হাজার বৎসর রাজত্ব করিবেন। দশ হাজার বৎসর গত হয়ে গেছে, আর একটি হাজার বৎসর আয়ু। মৃত্যুচিন্তা তার স্মরণ হয়েছে।
>
> : সামান্য একটি হাজার বৎসর আয়ু আমার!
>
> তাই অযোধ্যাতে শ্রীরামচন্দ্র আজকে প্রাতঃকালে-রজনীপ্রভাতে।
>
> প্রাতঃকালে-রজনীপ্রভাতে অযোধ্যার ভূপতি শ্রীরামচন্দ্র ভেসে যান নয়নের জলে॥ আজ অনুজ লক্ষ্মণ ছলছল নেত্রে গদগদ ভাবে রামচরণে প্রণাম করে বললেন—দাদা...।[১৭]

এখানে গায়কের ভাষার মধ্যে এক ধরনের গীতিময়তা প্রত্যক্ষ করা যায়। 'প্রাতঃকালে-রজনীপ্রভাতে'র সমার্থক যুগ্মশব্দ প্রয়োগে গায়ক গীতলতাকে সম্প্রসারিত করেন; শুধু তাই নয়, বাক্যের মধ্যে একই শব্দের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে ধ্বনিমাধুর্য যেমন বেড়ে যায়, তেমনি গায়কের ভাষার মধ্যে ধ্রুপদীকাব্যের মতো অনাবিল এক ভাব সঞ্চারিত হয়, যা দর্শক-শ্রোতাদের মোহিত করে। গায়কের উপস্থাপনে এক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষার তেমন কোনো প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা যায় না। উল্লেখ্য, কুষ্টিয়া অঞ্চলের ভাষার মধ্যে আপনা হতেই তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব শব্দ প্রয়োগে চর্চিত শিষ্টভাষার একটা রূপ আছে—একথা সত্য; তবে তারও একটি আঞ্চলিক রূপ আছে—কেননা, কুষ্টিয়া অঞ্চলে সাধারণত মহাপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণের সময় অনেকক্ষেত্রে স্বল্পপ্রাণের রূপ গ্রহণ করে, উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—কুষ্টিয়া অঞ্চলের গ্রামীণ মানুষের উচ্চারণে 'খ'-এর পরিবর্তে 'ক', 'ছ'-এর পরিবর্তে 'চ' ব্যবহৃত হয়; কিন্তু গায়ক রামচন্দ্র মোহন্ত গোঁসাইয়ের 'রামকীর্তনে'র উপস্থাপনে কোথাও সে ধরনের কোনো ধ্বনি বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করা যায় না।

উত্তরবঙ্গের কৃপাসিন্ধু রায় সরকারের 'রামলীলা'র মতো কুষ্টিয়ার রামচন্দ্র মোহন্ত গোঁসাইয়ের পরিবেশনাও একক অভিনয়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়। শুধু কিছু দোহার-বাদ্যকর তাঁদের পরিবেশনে সংগীতাংশে সহযোগিতা দিয়ে থাকেন। যেমন—রামচন্দ্র মোহন্ত গোঁসাই যখন আখ্যান বর্ণনার মধ্যে সংগীত সূচনা করেন তখন দোহার-বাদ্যকরগণ তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ ও বাদ্যযন্ত্র সঙ্গত করেন। উপর্যুক্ত গদ্য ভাষ্যের পরই আসে সংগীত, যাকে লক্ষ্মণের গীত-সংলাপ হিসেবে শনাক্ত করা যায় :

> ও দাদা, তুমি অমন করে কেঁদো না, কেঁদো না
> আরে কাঁদা বদন তোমার দেখতে নারি॥

Dhaka University Institutional Repository

আরে তুমি কাঁদিলে আমার চোখে আসে বারি।
কাঁদা বদন তোমার দেখতে নারি।
আরে বলো কিসের এত তোমার অভাব হল গুণমণি
কাঁদা বদন তোমার দেখতে নারি।
বলো কিসের অভাব হল– খুলে বল, প্রাণ খুলে
আমি ধৈর্য ধরিতে নারি।
কাঁদা বদন দেখতে নারি।
ওরে প্রাণ খুলে বলো, আমার সম্মুখে বলো
কাঁদা বদন দেখতে নারি।
দাদা, তুমি কাঁদিলে এই জগৎ কাঁদিবে
কাঁদা বদন দেখতে নারি।[১৮]

এখানে 'কেঁদো না', 'কাঁদা বদন', 'তুমি কাঁদিলে', 'জগৎ কাঁদিবে' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারে ভাষার ভেতর ক্রন্দনের অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়, সেই সাথে 'নারি', 'বারি', 'গুণমণি', 'প্রাণ', 'সম্মুখে' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগে এই বন্দনাগীতের আবহে পৌরাণিক কাব্য বয়ানের স্বভাব ধৃত হয়।

এ ধরনের বন্দনাগীতের পর গায়ক রামচন্দ্র মোহন্ত গোঁসাই সুর-বাণীর ভেতর থেকে বর্ণনাত্মক গদ্যে প্রবেশ করেন এবং বলেন–"আজ শ্রীরামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণকে জড়িয়ে ধরে বললেন।" এরপর কণ্ঠের পরিবর্তনে অত্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গিতে তিনি রামচন্দ্রের সংলাপ উচ্চারণ করেন, রামচন্দ্রের জবানিতে বলেন :

> ওরে, ভাই লক্ষ্মণ, আমাদের আরাধ্য দেবতা পিতা ইহলোক ত্যাগ করে পরলোকগমন করেছে বটে–কিন্তু অবিনশ্বর আত্মা, আত্মার মৃত্যু নেই। সেই রুহ, আজ বেহেশত-স্বর্গের দরজায় দাঁড়িয়ে স্বপ্নযোগে-খোয়াবে আমার শিয়রে এসে বলল :
>
> : ওরে রাম, লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন চারিটি পুত্রধন পৃথিবীর বুকে থাকতে, বল তোদের পিতা হয়ে আর কতদিন আমি এমনিভাবে ব্রহ্মহত্যা পাপের বোঝা মাথায় করে বইবো। ওরে রাম, আমাকে উদ্ধার করে দে। আমার এই আত্মার উদ্দেশ্যে পারলৌকিক ক্রিয়া সমাপ্ত কর।[১৯]

ভাষা প্রয়োগে প্রমিত বাংলা শব্দ ও বাক্যের মধ্যে অনায়াসে আরবি, ফারসি শব্দ যুক্ত করেন এবং পুরোপুরি আঞ্চলিক ভাষা না হলেও কিছুটা আঞ্চলিক ভাষাভঙ্গি প্রয়োগ করেন। উদ্ধৃতিতে 'রুহ' আরবি শব্দ; অন্যদিকে 'বেহেশত', 'খোয়াব' ফারসি শব্দ। এক্ষেত্রে ভাষারূপের প্রবহমানতার 'বেহেশত-স্বর্গ', 'স্বপ্নযোগে-খোয়াবে' সমার্থক যুগ্মশব্দ প্রয়োগে অসাম্প্রদায়িক চেতনাযুক্ত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য, আসরে গায়ক কর্তৃক এ ধরনের সমার্থক যুগ্মশব্দ ব্যবহারে সনাতন, বৈষ্ণব, ইসলাম ইত্যাদি ধর্মানুসারী দর্শক-শ্রোতা ধর্ম-মতাদর্শের মধ্যে ঐক্য অনুভব করেন। 'রামকীর্তনে'র আসরে রামায়ণের আখ্যান পরিবেশনে এ ধরনের আরবি, ফারসি শব্দের প্রয়োগ এখানেই থেমে যায় না, বরং তা আরও সম্প্রসারিত হয় গায়ক কর্তৃক পরবর্তী পর্যায়ের বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনায়।

গায়ক পূর্ববর্তী সংলাপের সূত্র ধরে দর্শক-শ্রোতাদের জন্য ধর্মের আচার এবং তার মারফতিসত্তা তথা আত্মতত্ত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যায় নানা ধরনের আরবি শব্দের আশ্রয়ে বলেন :

> যেটা জানাজা। তবে, জানাজা শুধু সুরা জানলেই হয়তো হবে না। আত্মা সম্বন্ধে জানার বিশেষ প্রয়োজন। পাঁচ রুহ সম্বন্ধে যিনার জানা আছে, সেই ব্যক্তি দিয়ে জানাজা করলে অতি উত্তম। এটা তরিকাভুক্ত কথা। স্থূল প্রবর্ত সাধক সিদ্ধির কথা।
>
> তাই শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের কাছে যখন বললেন, তখন লক্ষ্মণ বললেন :
>
> : 'দাদা, আমাদের যে আছে কুল পুরোহিত, যিনি মুরশিদ-গুরুদেব, তার নিকটে নিশ্চয় জানালে তিনি হয়তো সমস্ত বিধান দেবেন।'

শ্রীরামচন্দ্র বললেন :

> : 'ওরে লক্ষ্মণ, তাহলে তুমি কালবিলম্ব না করে অতিসত্বর গুরু আশ্রমে যাত্রা কর...।

উদ্ধৃতিতে 'জানাজা', 'সুরা', 'রুহ', 'মুরশিদ', 'তরিকা' বা তরিক' এই পাঁচটি আরবি শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা গেছে, আর এই শব্দ প্রয়োগের ব্যাপারটি অহেতুক আসেনি। বরং রামায়ণের একটি ঘটনার সাথে ইসলামি একটি কৃত্যের সাদৃশ্য টেনে এ সকল শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কুষ্টিয়া অঞ্চলে সনাতন, ইসলাম, সাধুগুরু, বাউল-ফকির, বৈষ্ণব-সাধকদের ঐতিহ্যবাহী এলাকা, এই অঞ্চলে সকল ধর্মের সরলীকৃত ভক্তিবাদ লালন সাঁই ও তাঁর পরবর্তী কালের সাধকদের অবদান। তাই কুষ্টিয়া অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী নাট্য পরিবেশনে অনায়াসে শাস্ত্রীয় ভাষা বা শিষ্টভাষার ব্যাপক প্রভাব যেমন স্বীকৃত, তেমনি আরবি-ফারসি ও কুষ্টিয়ার নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষার উদার ব্যবহার প্রত্যক্ষ করা যায়।

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি ও বিশ্লেষণ থেকে বাংলাদেশের দুই অঞ্চলের দুটি ধ্রুপদী আখ্যান-নাট্যের পরিবেশনে ভাষা বিচারে প্রত্যক্ষ করা গেল যে, মৌখিকরীতিতে আঞ্চলিক গায়ক কর্তৃক পরিবেশিত ধ্রুপদী আখ্যান-নাট্যে সর্বজন গ্রাহ্য প্রমিত বা মার্জিত ভাষার প্রচলন স্পষ্ট; এছাড়া, পরিবেশনরীতির এদিকে যেমন সংস্কৃত শ্লোক বা সংস্কৃত শব্দ ও ভাষাভঙ্গির মিশ্রণ থাকে, অন্যদিকে তেমনি আরবি, ফারসি শব্দের প্রয়োগ প্রচ্ছন্ন থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

২.২ নৃগোষ্ঠী [আদিবাসী] নাট্যঐতিহ্য

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা ধরনের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বসবাসরত। বৃহত্তর অর্থে তাঁরা যেহেতু প্রধানত আদিম ও কৃষিভিত্তিক জীবন যাপনে অভ্যস্থ সেহেতু তাঁদের আদিবাসী হিসেবে অভিহিত করা যায়। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি আদিবাসী সমাজে, বিশেষ করে হাজং, গারো, ওঁরাও, মারমা, চাকমা, ত্রিপুরা ইত্যাদি নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি ও নাট্যঐতিহ্য বর্তমান রয়েছে। তাঁদের ভেতর থেকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী [আদিবাসী] নাট্যঐতিহ্যের ভাষা বিচারের নিমিত্তে জনসাংস্কৃতিক সমীক্ষায় প্রাপ্ত নেত্রকোনা অঞ্চলের হাজংদের (রাসমনি হাজং সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর নেতৃত্বে দুর্গাপুর-বগাউড়ার রাধাকৃষ্ণ সম্প্রদায়) পরিবেশিত 'দেবাসুর' বা 'মহিষাসুরবধ' পালার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, এ ধরনের নাট্যপালা মূলত বাংলার লোকায়ত দেবী *চণ্ডীমঙ্গলের* আখ্যানকে নির্ভর করে আসরে পরিবেশিত হয়।

বাংলাদেশের অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী নাট্যরীতির মতো হাজং সমাজে প্রচলিত 'মহিষাসুরবধ' শীর্ষক নাট্যপালার শুরুতেই থাকে বন্দনাগীত। যথা :

নমঃ নমঃ নারায়ণী জগত তারিণী
দুর্গাসুর বিনাশিনী দুর্গতি হারিণী॥
সর্বলোক নিস্তারিণী পতিত উদ্ধারিণী
কালী তারা তাপহারা সন্তোষ কারিণী॥
কালী তারা মহাবিদ্যা রাজা রাজ্যশ্বরী
শ্রীমতী ভুবনশ্বরী ভৈরব শঙ্করী॥
চন্দ্র রূপ রক্ষগণ রক্ষকতারিণী
অতি চণ্ডী রক্ষা কর অশুভ হারিণী॥...
মঙ্গল কর মা মঙ্গল চণ্ডী, মঙ্গলে রেখ মা জননী।
সুভক্তি প্রণয়ে নমি মা অভয়ে, জয় দেবী কৈলাসবাসিনী॥
নমস্তে হর জয় শ্রীগুণ মহামায়া, জয় দেবী কৈলাসবাসিনী।
জয় জয় চন্দ্রাবতী অম্বিকা ভগবতী, ভৈরব অভয়তারিণী॥
বিঘ্ন নাশিনী মোক্ষ প্রদায়িনী, রেখ পদ্মা ত্রিলোকতারিণী॥[২০]

এই বন্দনাংশ পাঠে বোঝার কোনো উপায় নেই যে, এটা হাজংদের উপস্থাপিত নাট্যপালা থেকে উদ্ধৃত। কারণ, এর ভাষায় লোকভাষা তথা আঞ্চলিকতার তেমন কোনো মিশ্রণ যেমন নেই, তেমনি হাজংদের নিজস্ব ভাষারও প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে না। এখানে মূলত শাস্ত্রীয় ভাষা কাঠামো

Dhaka University Institutional Repository

অনুসরণে তথা সংস্কৃত বা তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব শব্দের প্রয়োগে শিষ্টভাষার উপস্থাপন প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে।

এ ধরনের বন্দনাগীতের পর হাজংদের নাট্যপালায় পার্ব্বতী ও দুর্গাসুরের যুদ্ধ দৃশ্যের অভিনয় প্রত্যক্ষ করা যায়। যে অভিনয়ের শুরুতে এক হাতে তরবারি আর অন্য হাতে ফলা অস্ত্র নিয়ে নৃত্যের তালে তালে মহামায়া বা দুর্গা মঞ্চে প্রবেশ করেন। একই সঙ্গে তাকে অনুসরণ করে ঢাল-তরবারি হাতে একজন কুশীলব অসুর রূপে নৃত্য যোগে মঞ্চে আগমন করেন। এক সময় তিনি তাঁর নৃত্যের মধ্যে নানা রকম অঙ্গ ভঙ্গি করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন এবং বলেন :

অসুর : হু হা হা হা। কে? কে তুমি নারী? আমায় সত্য পরিচয় দাও।

মহামায়া : সমরের প্রাঙ্গণে দেবতার আলয়ে কেন তুমি আসিলে হেথায়?

অসুর : এই তো আমি অসুর। তুমি আমাকে সত্য পরিচয় দেবে, না হলে তোমাকে আমি করতে পারি জানো?

মহামায়া : হ্যাঁ জানি। তোমার মতো তোমার মত কত সহস্র অসুর আমার পায়ের তলায় রেখে দিয়েছি। সেই পাপিষ্ট অসুর, আমার পরিচয় জানতে চায়ছো! জানো, আমি মহামায়া।

অসুর : মহামায়া! আজ তুমি কী চাও।

মহামায়া : চাই শুধু রাজ্য।

অসুর : রাজ্য! হু হা হা হা। তবে আয়, আয়রে মৃত্যুকামিনী নারী, তোকে রাজ্যের সাধ মিটিয়ে দেই॥[২১]

এখানে অসুর ও মহামায়া চরিত্রের সংলাপে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ রয়েছে, দুটি ক্ষেত্রেই শব্দ প্রয়োগে কিছুটা গীতল ভাব ও পুরানো ভঙ্গি প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে, বিশেষ করে 'সমরের প্রাঙ্গণে', 'দেবতার আলয়ে', 'আসিলে হেথায়' ইত্যাদি শব্দের বিন্যাসে গঠিত বাক্যে সাধু ভাষার পুরানো ভঙ্গির নিদর্শন দৃষ্ট হয়, অন্যদিকে যখন মহামায়া তার সংলাপে বলেন—'আমার পরিচয় জানতে চায়ছো! জানো, আমি মহামায়া।' এ ধরনের সংলাপ থেকে কথ্যরীতি বা চলিত ভাষার একেবারে সাদামাটা দৃষ্টান্ত প্রকাশ পায়। আসলে, হাজংদের এই নাট্যের বন্দনাংশে যেভাবে সংস্কৃত প্রভাবিত শিষ্টভাষারীতির প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করা যায়, নাট্য পরিবেশনের সংলাপে তা কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে মিশ্ররীতির ভাষা কাঠামো গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঐতিহ্যবাহী নাট্যের নানা ধরনের ক্ষেত্রসমীক্ষণ বা জনসাংস্কৃতিক সমীক্ষণে ধ্রুপদী আখ্যান-নাট্যসমূহ মৌখিকরীতির হলেও যতটুকু শিষ্ট বা মান্যভাষায় পরিবেশিত হয়ে থাকে, আদিবাসী নাট্যঐতিহ্য ততটুকু শিষ্ট বা আদর্শভাষা বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে না। বন্দনাগীত বা

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য গীতে কিছু সংস্কৃত প্রণাম বা শ্লোকের ব্যবহার বা তৎসম, অর্ধতৎসম, ও তদ্ভব শব্দের নানা ধরনের প্রভাব প্রত্যক্ষ করা গেলেও সংলাপে আদিবাসী নাট্যঐতিহ্য মিশ্ররীতির ভাষা ব্যবহার করে। আসলে, ক্ষেত্রবিশেষে আদিবাসী নাট্যঐতিহ্যের পরিবেশনে দু'একটি আঞ্চলিক শব্দ-বাক্য বা ভাষাও ব্যবহৃত হয়। একই ধরনের চিত্র *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* আখ্যান নির্ভর পরিবেশনাসমূহেও প্রত্যক্ষ করা যায়। এমনকি কারবালার ইতিহাস নির্ভর উপন্যাস মীর মশাররফ হোসেন রচিত 'বিষাদ-সিন্ধু'র আখ্যান আশ্রিত 'ইমামযাত্রা'র পরিবেশনাতে প্রমিত বাংলার ভাষা প্রয়োগ করা হয়।

২.৩ ইসলামের ইতিহাসকেন্দ্রিক নাট্যঐতিহ্য

ইসলামের ইতিহাসের করুণ ও মর্মান্তিক ঘটনার একটি উদাহরণ হল—কারবালার যুদ্ধ ও তার পরিণতি। এই যুদ্ধের পরিণতিতে এজিদ ও তার সৈন্যদের কাছে ইসলামের সর্বশেষ নবী ও রাসুল হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর প্রিয় দৌহিত্র ইমাম হোসাইন সপরিবারে শহীদ হন। সেই করুণ ও মর্মান্তিক ইতিহাসকে সাক্ষ্য মেনে এবং প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর বংশ নিধনের বেদনা প্রকাশের নিমিত্তে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে জারি-মার্সিয়াসহ নানা ধরনের নাট্যপালা পরিবেশিত হয়। এ ধরনের একটি নাট্যপালার ভাষা বিচারের জন্য মানিকগঞ্জের চরখণ্ড-গোলরা গ্রামে চাঁনমিয়া পির সাহেবের বার্ষিক ঔরস উপলক্ষে পরিবেশিত 'ইমামযাত্রা'র কিছু অংশের উদ্ধৃতি দেওয়া যাক।

নিম্নে উদ্ধৃত 'ইমামযাত্রা'র অংশটুকু "শহীদে কারবালা" শীর্ষক পালার থেকে গৃহীত হয়েছে।

এজিদ : মহামন্ত্রী মারোয়ান! এই অপরূপ সুন্দরীটিকে?

মারোয়ান: জনাব, এতো দেখছি আমাদেরই রাজ্যের এক সাধারণ প্রজা আব্দুল জব্বারের স্ত্রী বিবি জয়নব।

[জয়নব কলসিতে জল নিয়ে এজিদকে তোয়াক্কা না করে পাশ কাটিয়ে মঞ্চ থেকে প্রস্থান করেন। তখন এজিদ মারোয়ানকে বলেন]

এজিদ : মহামন্ত্রী মারোয়ান, আমাদের রাজ্যের সাধারণ প্রজা আব্দুল জব্বারের স্ত্রী বিবি জয়নব! জয়নব জয়নব! মহামন্ত্রী মারোয়ান, আমাকে দেখার জন্য দামেস্কের হাজার হাজার নর-নারী রাস্তায় কাতার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে। আর সামান্য আব্দুল জব্বারের স্ত্রী জয়নব আমাকে করলো এতো অবহেলা! মহামন্ত্রী মারোয়ান এযে আমি সইতে পারছি না। মহামন্ত্রী মারোয়ান, আমি দেখতে চাই বিবি জয়নবের রূপের কত গৌরব। মহামন্ত্রী মারোয়ান, চলো এবার আমরা অন্তঃপুরে গমন করি।

মারোয়ান: তাই চলুন জনাব।

Dhaka University Institutional Repository

[এজিদ ও মারোয়ান উভয়ে প্রস্থান করেন। কিন্তু তার ঠিক পর মুহূর্তে এজিদ আবার মঞ্চে প্রবেশ এবং আত্মকথনমূলক সংলাপে বলতে থাকেন]

এজিদ : একি রূপ আমি আজ হেরিলাম! ভুলিতে নাহি পারি। শয়নে, স্বপনে, নিদ্রায় জাগরণে শুধু তাকেই স্মরণ করি। জানি না আজ কিসের মোহে কোন পথে চলছি একা। ওগো জয়নব এই যন্ত্রণা হতে বাঁচাইবে কি তুমি? কিসের মোহে ধন-সম্পদ, রাজ্য-সিংহাসন ছেড়ে তোমারই তরে ভিখারী হয়ে তেজিব প্রাণ। ওগো জয়নব, ওগো জয়নব, তুমি দাও মোরে দরশন।

[এজিদের এই কথার মধ্যে তার পিতা মাবিয়া প্রবেশ করেন]

মাবিয়া : পুত্র, আমি লক্ষ করছি দিন দিন নিজেকে তুমি যেন ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছো। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, কি যেন অশান্তি ভোগ করে চলেছো। বল পুত্র, কি তোমার বাসনা, কি তোমার কামনা? কেন তুমি নিজেকে তিলে তিলে নিঃস্ব করে দিচ্ছো। বল পুত্র, বল আমার কাছে খুলে বলো।

এজিদ : পিতা, আমার অপরাধ মার্জনা করবেন। আমি নিজেও বলতে পারছি না কেন আমার এই পরিণতি! তবে কি যেন না পাওয়ার ব্যথায় আজ আমি দুঃখে জর্জরিত। আর বেশি কিছু আপনার কাছে বলতে পারছি না।

মাবিয়া : তোমার কথা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি না পুত্র। কি না পাওয়ার ব্যথায় আজ তুমি এমন করে ভুগছো। মনে রেখো তুমি দামেস্কের রাজপতি সম্রাট মাবিয়ার একমাত্র পুত্র, এই অতুল ঐশ্বর্য, ধন-সম্পদ, অসংখ্য সৈন্য সামন্ত সবই তোমার মাথায় শোভা পাবে। এরপর তোমার কিসের অভাব! কি না পাওয়ার যন্ত্রণা?

এজিদ : তা বলতে আমার কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে পিতা। তা আমি কিছুতেই আপনার কাছে প্রকাশ করতে পারছি না পিতা।[২২]

"শহীদে কারবালা" শীর্ষক 'ইমামযাত্রা'র উদ্ধৃত সংলাপসমূহে ভাষা প্রয়োগের নানাবিধ বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করা যায়; এখানে সংলাপের ভাষায় যেমন শিষ্ট বা মান্যভাষা ভঙ্গি দুর্লক্ষ্য নয়, তেমনি লোকভাষা ভঙ্গির চরিত্র লক্ষণও স্পষ্ট। এছাড়া, সংলাপের গাঁথুনিতে মান্যভাষার প্রভাব বেশ প্রচ্ছন্ন। এখানে সংলাপে মান্যভাষার প্রভাব সম্পর্কে বলতে গেলে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা অতীব প্রয়োজন, তা হল—মানিকগঞ্জ অঞ্চলে প্রচলিত 'ইমামযাত্রা'র সংলাপে শিষ্টভাষা প্রয়োগের মূল নিয়ামক হচ্ছে—মীর মশাররফ হোসেন রচিত 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাস। কারণ, 'ইমামযাত্রা'র পাণ্ডুলিপি মূলত 'বিষাদ-সিন্ধু'র ঘটনাবিন্যাস ও ভাষাকে অবলম্বন করেই রচিত হয়েছে।[২৩] আর উপন্যাসটি সাধুভাষায় রচিত এবং তৎসম, অর্ধসৎসম, তদ্ভব শব্দের ঝঙ্কারে পরিপূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

ইমামযাত্রা'র এ ধরনের লিখিত পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব দৃষ্টে কোনো কোনো শিক্ষিত পণ্ডিত হয়তো নাট্যশাস্ত্রের প্রচলিত নীতিজ্ঞানে একে ঐতিহ্যবাহী নাট্য হিসেবে স্বীকৃতি দিতে সংকোচ বোধ করতে পারেন। কিন্তু, মনে রাখা প্রয়োজন, এটা বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতির একান্তই নিজস্ব ভাবসম্পদ এবং প্রাণের সামগ্রী।

উল্লেখ্য, মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু' অবলম্বনে শুধু 'ইমামযাত্রা'র পাণ্ডুলিপিই রচিত হয়নি, তার একটি মৌখিকঐতিহ্য 'জারিগান' বা 'বিষাদ-জারি' নামে বহুদিন ধরে নেত্রকোনা জেলার বিভিন্ন উপজেলার বহু গ্রামে প্রচলিত রয়েছে। শুধু তাই নয়, উক্ত অঞ্চলে 'বিষাদ-জারি'র এক ধরনের প্রতিযোগিতামূলক আসর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ ধরনের আসরে মাঝে মধ্যে 'বিষাদ-সিন্ধু'র অনুসরণে সাধারণত তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব শব্দের প্রয়োগে শিষ্ট বা মান্যভাষা যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনি লোকভাষা তথা আঞ্চলিক ভাষার ধুয়া-দিশা-ডাক ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।[২৪]

এ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত দেওয়া যেতে পারে, 'ইমামযাত্রা'র লিখিত পাণ্ডুলিপি বা মৌখিকরীতির 'বিষাদ-জারি'র মূল পরিবেশনে সর্বজনগ্রাহ্য তথা মান্যভাষা প্রয়োগের দুইটি কারণ রয়েছে—প্রথম কারণটি হল—খ্রিষ্টীয় উনিশ শতকের সাধু ভাষায় রচিত 'বিষাদ-সিন্ধু'র লিখিতরূপ অনুসৃত হবার জন্যেই পরিবেশনের ভাষায় শিষ্টরূপ রক্ষিত হয়; দ্বিতীয় কারণটির সাথে ভক্তিরস যুক্ত রয়েছে, যেহেতু পরিবেশনের কেন্দ্রীয় চরিত্রসমূহ ইসলাম ধর্মের শীর্ষতম ব্যক্তিত্বের পরিবারের সদস্যবর্গ। ক্ষেত্রবিশেষে লোকভাষার আঞ্চলিক শব্দ ও কথ্যভাষা প্রয়োগের কারণ হল—দর্শক-শ্রোতাদের অধিকাংশ ব্যক্তি আঞ্চলিক পরিসীমার, 'বিষাদ-জারি'র ক্ষেত্রে সাধারণত মূলকাহিনির বাইরে ধুয়া, দিশা, ডাক ইত্যাদি পর্যায়ে আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করা যায়।

ইসলামের ইতিহাসকেন্দ্রিক নাট্যঐতিহ্যের পাশাপাশি নানা ধরনের লৌকিক পির-মুরশিদ তথা গাজীপির, মাদারপির, মানিকপির প্রমুখের মাহাত্ম্যপ্রকাশক আখ্যান-নাট্যের পরিবেশনাতে অনেকক্ষেত্রে শিষ্টভাষার প্রয়োগ লক্ষণীয়। যদিও প্রায় সকলক্ষেত্রে পরিবেশনাকারী শিল্পগণ বিদ্যালয়ের বা কোনো ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করেন নি, সেই বিচারে তাঁরা নিরক্ষর; তবে, ক্ষেত্রবিশেষে স্বশিক্ষিত; তাঁরা গুরু-শিষ্য পরম্পরায় লৌকিক পিরের আখ্যান-নাট্যের পরিবেশনে শিষ্টভাষা প্রয়োগে স্বতঃস্ফূর্ত থাকেন। যেমন—টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলার মীরদেওহাটা গ্রামের লিয়াকত সরকার দোহার-বাদ্যযন্ত্রীদের সহযোগিতায় একক অভিনয়ের মাধ্যমে সম্পূর্ণ শিষ্টভাষায় 'গাজীর পালা' পরিবেশন করেন।[২৫] অন্যদিকে কিছু কিছু এক্ষেত্রে এ ধরনের পির মাহাত্ম্যের আখ্যান আঞ্চলিক ভাষার মাধুর্যের ভেতর দিয়ে পরিবেশিত হয়, যেমন—ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা থানার দুধসর গ্রামের রওশন আলী জোয়ারদার দলীয়ভাবে নাটকীয় অভিনয় তথা চরিত্রানুযায়ী সাজ-পোশাক গ্রহণপূর্বক সংলাপ, গীত, বর্ণনা সহযোগে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া জেলার মনোহরী লোকভাষা বা আঞ্চলিক ভাষায় 'গাজীর গানের ফোকরের পালা'র পরিবেশন করেন।[২৬] এক্ষেত্রে শিষ্টভাষার মহাপ্রাণ ধ্বনিসমূহ স্বল্পপ্রাণে

Dhaka University Institutional Repository

রূপান্তরিত হাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। কারণ, আগেই বলা হয়েছে, কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ অঞ্চলের লোকভাষায় অনেকক্ষেত্রে মহাপ্রাণ ধ্বনি স্বল্পপ্রাণে রূপান্তরিত হয়।

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের অন্যান্য যে সকল পরিবেশনে লোকভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা বিশেষ গুরুত্বের সাথে ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে স্থানীয় লোককাহিনি, রূপকথা, উপকথা, আখ্যান-গীতিকা ইত্যাদি পরিবেশন উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত ও দীনেশচন্দ্র সেন সংকলিত-সম্পাদিত *মৈমনসিংহ-গীতিকা*'র আখ্যানসমূহে আঞ্চলিক পর্যায়ে 'কিচ্ছা' বা 'কিচ্ছাগান', 'কিচ্ছাপালা' নামে বৃহত্তর ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষায় পরিবেশিত হয়ে থাকে।

২.৪ লোককাহিনি বা আখ্যান-গীতিকার নাট্যঐতিহ্য

বাংলাদেশের সামাজিক মানুষের নিজস্ব জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে লোককথার আখ্যানে রূপান্তরকে লোককাহিনি বলা যেতে পারে; যা কখনো গল্পকথনের ভঙ্গিতে, কখনোবা গীতির কাঠামোতে আখ্যান-কাহিনি আকারে মুখে মুখে রচিত হয়ে থাকে। দেব-দেবতার বন্দনা বা সমাজের উঁচু শ্রেণীর মানুষের বন্দনা এ ধরনের লোককাহিনি বা আখ্যান-গীতিকাতে পাওয়া দুর্লভ, তার পরিবর্তে এ ধরনের আখ্যান-গীতিকা বা লোককাহিনিতে সবকিছুর ঊর্ধ্বে সাধারণ মানুষের জীবন-মাহাত্ম্য বন্দিত হয়ে থাকে। তাই লোককাহিনি বা আখ্যান-গীতিকা নির্ভর নাট্যঐতিহ্য সাধারণ মানুষের ভাষারীতি তথা আঞ্চলিক ভাষা অত্যন্ত সচেতনভাবে গৃহীত হয়েছে বা আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমেই তার সমূহ ভাব সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

বিংশ শতকের শুরুর দিকে চন্দ্রকুমার দে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে এ ধরনের আখ্যান-গীতিকা সংগ্রহ করেন এবং দীনেশচন্দ্র সেন তা সংকলন, গ্রন্থন ও সম্পাদনের মাধ্যমে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন, যার নাম দেওয়া হয়েছিল–*মৈমনসিংহ-গীতিকা*। এই গীতিকায় স্থান পাওয়া এবং না পাওয়া অনেক লোককাহিনি বা আখ্যান 'কিচ্ছা' বা 'কিচ্ছাগান', 'কিচ্ছাপালা' নামে অদ্যাবধি বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ ইত্যাদি জেলাতে একক গায়ক-শিল্পী কর্তৃক দোহার-বাদ্যযন্ত্রীদের সহযোগিতায় পরিবেশিত হয়ে থাকে। এ ধরনের কিচ্ছা পরিবেশনের জন্য কুদ্দুস বয়াতী, ইসলামউদ্দিন কিচ্ছাদার, দিলু বয়াতী, মিলন বয়াতী, খোকন বয়াতী প্রমুখ উক্ত অঞ্চলের শিল্পীদের মধ্যে অত্যন্ত খ্যাতিমান।

ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত আখ্যান-গীতিকা তথা 'কিচ্ছা' বা 'পালাগানগুলি'র ভাষারীতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন *পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা*-র তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা-র ভূমিকায় লিখেছেন :

> পালাগানগুলির এই সংখ্যা ও পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যাগুলির মধ্যে ভাষাসম্বন্ধে অনেক বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়। বঙ্গভাষার এখনও কোন নিজস্ব ব্যাকরণ রচিত হয় নাই। যাঁহারা এযাবৎ বাঙ্গালা

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাকরণ লিখিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই সম্পূর্ণভাবে পাণিনি অথবা বোপদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন, নিজের স্বাধীন চিন্তা বা চেষ্টা দ্বারা কিছু নূতন জিনিষ দিয়া যান নাই। ভবিষ্যতের বৈয়াকরণিক ও ভাষা-সন্ধানকারীদের কার্য্যের সুবিধার জন্য পালাগানের অন্তর্গত ভাষার প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা প্রয়োজনীয়।[২৭]

এরপর দীনেশচন্দ্র সেন ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত পালাসমূহের ভাষার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেন, এভাবে :

(১) 'হ' প্রায়ই পরিবর্ত্তিত হইয়া 'অ' হইয়া থাকে। একজন পশ্চিমবঙ্গের লোক যে স্থলে 'হাঁ' বলেন, পূর্ব্ববঙ্গের [তথা ময়মনসিংহের] একজন লোক সেই স্থলে বলিবেন 'অয়'। এই সমস্ত পালাগানে আমরা 'হিন্দু' স্থানে 'ইন্দু', 'হাতী' স্থানে 'আতি', 'হেন' স্থানে 'এন', 'হইয়া' স্থানে 'অইয়া', 'হইব' স্থানে 'অইব', 'মহাল' স্থানে 'ময়াল' দেখিতে পাই।

(২) 'ও' প্রায়ই 'উ'-তে পরিণত হয়; যথা, 'কোণা'–'কুণা', 'কোরাণ'–'কুরাণ', 'ছোট'–'ছুট্ট', 'বোচকা'–'বুচকা', 'জোখা' (লেখা-জোখা)–'জুখা', 'গোয়াইল'–'গুয়াইল', 'ষোল'–'ষুল', 'সোত' (স্রোত)–'সুত', 'প্রবোধ'–'পরবুদ', 'সোদর'–'সুদুর', 'সোনালী'–'সুনালী', 'সোয়ার' (ঘোড়-সওয়ার)–'সুয়ার', 'মোচ' (গুম্ফ)–'মুচ', 'যোগ'–'যুগ', 'কোল' (ক্রোড়)–'কুল', 'খোল' (উন্মুক্ত করা) স্থলে 'খুল'।

(৩) 'উ' কখনো কখনো পরিবর্ত্তিত হইয়া 'ও' হইয়াছে; যথা, 'তুফান' স্থলে 'তোফান'।

(৪) 'ট' ও 'ঠ' স্থানে 'ড'; যথা, 'ছোট' স্থলে 'ছুড়ু', 'কাঠি' স্থলে 'কাডি', 'পাঁঠা' স্থলে 'পাঁডা'।

(৫) 'ঢ' স্থলে 'ড'; যথা, 'ঢোল' স্থলে 'ডুল'।

(৬) 'ন' স্থলে 'ল'; যথা, 'নাড়া' স্থলে 'লাড়া'।

(৭) পূর্ব্ববঙ্গীয় [ময়মনসিংহ অঞ্চলের] ভাষায় 'স' ও 'শ'-কে প্রায়ই 'হ'-তে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। ইহার উদাহরণ এত বেশী যে অধিক দিবার প্রয়োজন নাই। 'সেই' স্থলে 'হেই', 'সেওলা' স্থলে 'হেওলা', 'সাজি' স্থলে 'হাজি', 'শালা' স্থলে 'হালা', 'শুধু' স্থলে 'হুদু', 'শত' স্থলে 'হত' প্রায়ই পাওয়া যায়। 'শত' স্থানে 'হত' প্রয়োগের একটি রহস্যজনক গল্প আছে। একটি সংস্কৃত শ্লোক পশ্চিমবাসীদিগকে পূর্ব্ববঙ্গের পণ্ডিতদের নিকট আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছে; কারণ আশীর্ব্বাদ-কালীন 'শতায়ুস্ত্বং ভবিষ্যসি' স্থলে পূর্ব্ববঙ্গীয় পণ্ডিত বলিবেন, 'হতায়ুস্ত্বং ভবিষ্যসি'–অর্থ দাঁড়াইবে বিপরীত।

(৮) কয়েক স্থলে আবার 'হ'-এর পরিবর্ত্তে 'স'-এর ব্যবহার দেখা যায়; যথা, 'হেন কালে' স্থানে 'সেন কালে', 'হাতী' স্থানে 'সাতি'।

Dhaka University Institutional Repository

অনেক স্থলে প্রায় অকারণেই কোন কোন শব্দে একটি অতিরিক্ত স্বরবর্ণ যুক্ত হইয়া থাকে; যথা, 'কন্যা' স্থলে 'কৈন্যা', 'বক্ষ' স্থলে 'বৈক্ষ', 'লক্ষ্য' স্থলে 'লৈক্ষ্য', সন্ধান স্থলে 'সৈন্ধান', 'অঞ্চল' স্থলে 'ঐঞ্চল'। এখানে 'ঐ'-এর ব্যবহার অকারণ। আবার এইরূপ ভাবেই অনেক স্থলে 'উ' স্বরবর্ণটিকে শব্দমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হয়; যথা, 'রাখাল' স্থলে 'রাউখাল'। 'কবর' স্থলে 'কয়বর' কথায় এইরূপে 'য়'টি প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছে। কখনো কখনো কোন কোন বর্ণের লোপ হয়; যথা, 'মহাজন' স্থলে 'মাজন'; এ ক্ষেত্রে কেবল 'হ'টি লুপ্ত হইয়াছে এবং 'আ'কার 'ম'কারের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। 'মোড়ল' স্থানে 'মড়ল' হওয়ায় 'ও'কার লুপ্ত হইয়াছে এবং 'স্থান' শব্দের পরিবর্ত্তে 'থান', 'স্তন'-এর পরিবর্ত্তে 'তন' হওয়ায় 'স'কারের লোপ পরিলক্ষিত হয়।

পূর্ব্ববঙ্গের [ময়মনসিংহ অঞ্চলে] ভাষায় বর্ণেও দ্বিত্ব-বিধান আর একটি বিশেষত্ব; যথা, 'হুকা' স্থলে 'হুক্কা', 'শিকা' (শিকে)—'শিক্কা'।[২৮]

বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী নাট্যপালা 'কিচ্ছা'র পরিবেশনে অনেকক্ষেত্রে উপর্যুক্ত ভাষা বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করা যায়। সেইসঙ্গে ক্রিয়াপদ ব্যবহারে আরেকটি ভাষাবৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়; যেমন—ক্রিয়াপদের সাথে অধিকাংশক্ষেত্রে ভবিষ্যৎকাল বোঝাতে 'বাম' ও 'তাম' শব্দাংশ যুক্ত করা হয়; যথা, 'করবো'র পরিবর্তে 'করবাম', 'যাইবো'র পরিবর্তে 'যাইবাম'; এছাড়া, ক্ষেত্রবিশেষে ক্রিয়াপদের সাথে 'তাম' শব্দটিও যুক্ত হয়, যথা—'করবো'র পরিবর্তে 'করতাম', 'খাইবো'র পরিবর্তে 'খাইতাম' ইত্যাদি।

এবারে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার নোয়াবাদ গ্রামের ইসলাম উদ্দিন কিচ্ছাদার পরিবেশিত *উতলা সুন্দরী ও কাকাধরের খেলা* শীর্ষক কিচ্ছার উদ্ধৃতি দিয়ে উপর্যুক্ত ভাষাবৈশিষ্ট্য খুঁজে দেখা যেতে পারে। এ ধরনের কিচ্ছার শুরুতেই থাকে বন্দনা, যথা :

পাষাণ মনওরে আমার। ওরে হরদমে লইও আল্লার নাম
প্রথমে আল্লাজীর নামে আমি কিচ্ছা করলাম শুরু। হায় হায় কিচ্ছা করলাম শুরু।
দ্বিতীয় বন্দনা গো করলাম রাসুলের পাক পায়ে।
পুবেতে বন্দনা করলাম পুবে ভানুশ্বর। হায় হায় পুবে ভানুশ্বর।
একদিকে উদয় গো ভানু চৌদিকে পসর ॥ ও মনওরে...
উত্তরে বন্দনা করলাম হিমালয় পর্বত। হায় হায় হিমালয় পর্বত।
যেখানে পাঠায়ছে আলী মালামের পাথর।
হাত উঠায় মারে গো পাথর বুক পাতিয়া ধর। হায় হায় বুক পাতিয়া ধর।
বিপদে পড়িয়া মানুষ আল্লার নামটি ধর ॥ পাষাণ মনওরে...

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষিণে বন্দনা করলাম ক্ষীর নদী সাগর। হায় হায় ক্ষীর নদী সাগর।
যেখানে বাইতো গো ডিঙ্গা চান্দ সওদাগর। পাষাণ মনওরে...॥
পশ্চিমে বন্দনা করলাম মক্কা বড় স্থান। হায় হায় মক্কা বড় স্থান।
যেখানে হয়ছিল নাজিল কিতাবও কুরান।
পশ্চিমে বন্দনা করলাম আলীরও রওজায়। হায় হায় আলীরও রওজায়।
তুমারও কৃপায় পাইবো রসুলের চরণ। পাষাণ মনওরে...
চারকুনা বন্দনা করলাম মন করিলাম স্থির। হায় হায় মন করিলাম স্থির।
তীরের আগায় বান্ধি লইলাম আশি হাজার পির।
আশি হাজার পির বান্ধিলাম আমি নয় লাখ পয়গম্বর। হায় হায় নয় লাখ পয়গম্বর।
গাজী কালুর চরণ বান্দি সুন্দরবন বন্দর। পাষাণ মনওরে...
সভা করে বয়ছেন যত আমার ভক্ত শ্রোতাগণ। হায় হায় ভক্ত শ্রোতাগণ।
ভক্তেরও চরণে রইল আমারও সালাম।
ভুল যদি করি আমি আসরের মাঝারে। হায় হায় আসরের মাঝারে।
ছেলে বলে করবেন ক্ষমা সভার এই দরবারে। পাষাণ মনওরে...
উস্তাদেরও চরণ বান্ধলাম বসিয়া আসরে। হায় হায় বসিয়া আসরে।
উস্তাদ যদি করেন দয়া তরাবো আসরে।
পিতা মাতার চরণ বান্ধলাম বসিয়া আসরে।
সেইও মায়ে জন্ম দিয়ে দিল যে বাড়ায়ে।
পাষাণ মনওরে হরদমে হরদমে লইও আল্লার নাম...॥

[বন্দনাগীত শেষ করে ইসলাম উদ্দিন ভিন্ন একটি গানে গেয়ে পালার মূল আখ্যানে ঢুকে পড়লেন]

সুনাপুরে বাড়ি তার গো ও গুণের বাবা, সুনাপুরে ঘর।
ওরে বান্ধে বাড়ি কাহারও আশায় বান্ধে সারে সারে গো।
এই যে, বাড়িরও ভিতরে বাবা সুনারও যে পুরী।
আবার ভিতরে বানাইল বাদশা সভা করবার বাড়ি।
... ...
সভা কইরা আছিন যত ভদ্র শ্রোতাগণ
কাকাধরের খেলা কিচ্ছা এখন করিবো বর্ণন॥

আল্লাপাক দিছে তারে বুড়া। আল্লাপাকের ইচ্ছায় পুরী বান্ধছে, বাড়ি বান্ধছে, বাদশার জন্ম নিয়েছে—এ কোন শহর?

Dhaka University Institutional Repository

: আই?

: সুনাপুর শহর।

: ওই

বাদশা ইব্রাহিম নাম ডাকিয়া জানাই খবর। ওই যে ডাকিয়া কথা বলে উজিরের দরবারে :

: উজির?

: মুনিব।

: তুমার কাছে আমি মনস্তাব রাখি।

: কিরম মনস্তাব?

: আল্লা পাকের দুয়াতে আমি বারো মুল্লুকের বাদশা হয়েছি সুনাপুর শহরে। আল্লা পাকে আমার কাঞ্চনলীলা, সুনামানিক কুনু দিক দিয়ে রাখছেনি বাকি। আমি শোনো ইব্রাহিম বাদশা যদি ইচ্ছা করি সুনা দিয়া বান্ধতাম পারি রাজ্যের চারকুনা...

ওই বলিয়া প্রভুজী :

: উজির?

: হুঁ।

: মাছে চিনে গহিন গাঙের পানি
পাখি চিনে ডাল।
মায়ে জানে পুতের বেদন
যার তিনডা ছাল।

আমি আল্লার দরবারে পাঁচ ওকতো নামাজ পড়ি, সকাল বিকাল কুরান পড়ি। আল্লা পাকে আমাকে বারো মুল্লুকের বাদশাহী দান করেছে সুনাপুর শহরে। কুনু দিক আল্লা আমারে রাখছে না কুম করে...কিন্তু আমি এক দুঃখের দুঃখী...।

: কির'ম দুঃখ?

আল্লা আমার ছেড়াক না দেন সুনাপুর শহরে।
ওরে মানষেরেও দেখিবে আল্লা সন্তান আছে ঘরে।
আমারে দেখিবে কে গো বলি যে তুমারে।
ওরে সন্তানেরও পাগল আমি আমার সন্তান নাই।
কী অপরাধ করছি আমি দুনিয়ার মাঝারে।
সন্তান দিয়ে করবেন বিধি গো সুখী আমারও দরবারে॥

Dhaka University Institutional Repository

হায় গো আল্লা তোমায় না চিনিয়া
জীবনে কি করলাম আল্লা গো॥
ওরে কী অপরাধ করছি গো আমি এই দুনিয়ার মাঝারে।
আমার কি নিয়া করবেন তিনি ক্ষমাবেন আমারে।
সন্তান কি আর পাবো আমি গো বিধি অপরাধ খণ্ডালে।
আমার সুময় হয় আশি বছর সন্তানও নাই ঘরে।
আটকুড়া হয়ে বেঁচে থাকি কেমনে এ শহরে।
উজির রে... আটকুড়া হয়ে কেমনে বাঁচি।
হায় হায়... মরিব মরিব একটা সন্তানের কারণে।
আমি সকাল-বিকাল কুরান পড়ছি আল্লারই দরবারে।
পাঁচ ওক্তো যে নামাজ পড়ছি আল্লারই দরবারে।
ওরে তবু আল্লায় দেয় না সন্তান আমার এ দরবারে।
কী আর করে বাঁচি আমি লুকসভার মাঝে...

বাদশা বলে :

: উজির

: জী

: আমি আল্লার দরবারে পাঁচ ওক্তো নামাজ পড়ি, সকাল বিকাল কুরান পড়ি। কিন্তু আল্লা পাক আমাকে কুন পুত্র সন্তান দেয় না। আমি কুন জায়গায় যাইতে পারি না। প্রজারা সবাই আমাকে আটকুড়া বাদশা বলিয়া ধিক্কার দেয়। আমি লুকসভায় গিয়ে মুখ দর্শন করতে পারি না শুধু একটা সন্তানের কারনে... প্রজারা আমাকে ঘৃণা করে। যে প্রজারা আমাকে ঘৃণা করে আমি চাই না- সে প্রজাদের কাছে আমার মুখ দর্শন দিই... আমি এখন চলে যাবো কোথায় জানো-

: আই?

আমি চলে যাবো আমার স্ত্রীর কাছে...জিজ্ঞাসা করতে চাই তারে বিয়ে করেছি কত বছর হয়েছে... আমি অদ্য শুনে দেখবো যে জগতে তুমি নারী... যদি তুমি কুন সন্তান আমারে না দাও তবে কি করবাম জানো...

: কি?

: আমি দ্বিতীয় একটা বিয়া করবাম... ।"[২৯]

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে দীনেশচন্দ্র সেনকৃত এবং সেই সঙ্গে আমাদের নির্দেশিত ভাষাবৈশিষ্ট্যের প্রমাণ পাওয়া যায়; লক্ষণীয় যে, উদ্ধৃতাংশে 'করবো'র পরিবর্তে যেমন 'করবাম' শব্দটি রয়েছে, যেমন 'লোক' বা লোকসভা-র পরিবর্তে 'লুক' বা 'লুকসভা', 'হাটকুড়া'র পরিবর্তে 'আটকুড়া', 'সোনপুর'-এর পরিবর্তে 'সুনাপুর', 'সোনামানিক'-এর পরিবর্তে 'সুনামাণিক', 'কোন'-এর স্থলে 'কুন' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যা ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষার নিজস্বতার পরিচয় বহন করে। আসলে, লোককাহিনি জনমানুষের সমাজ পরিচয়ের গভীর থেকে উৎসারিত হয়ে থাকে বলেই তার ভাষারীতির ভেতর কোনো কৃত্রিমতা থাকে না।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ 'নিরক্ষর জেলে ও কৃষক মেয়েদের নিকট' থেকে এ ধরনের 'কিচ্ছা' বা 'পল্লীসঙ্গীতে পালা গান' সংগ্রহের মাধ্যমে প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন, 'পল্লী কবি পল্লী-সুলভ ভাষায় ও ভাবে' 'গ্রাম্য পরিবারের অশ্রুপূর্ণ' 'ট্রাজেডি' ব্যক্ত করেন।[৩০] এই 'পল্লী-সুলভ ভাষা'র মাধ্যমেই বাঙালির নিজস্বতার পরিচয় প্রকাশিত হয়। কিন্তু ভাষার আলোচনা-বিশ্লেষণে তা বারবার উপেক্ষিত হয়েছে, তাই দীনেশচন্দ্র সেন সুগভীর খেদ প্রকাশপূর্বক *মৈমনসিংহ-গীতিকার* প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যার ভূমিকায় বিস্তৃত আলোচনার শেষে বলেছেন :

> বাঙ্গালা ভাষাটা প্রাকৃতের রূপভেদ। কিন্তু টোলের এই ভাষায় অপর্য্যাপ্ত সংস্কৃত শব্দ আনয়ন করিয়া ইহার শ্রী বদলাইয়া দিয়াছেন; এইজন্য কাহারও কাহারও মনে হইতে পারে, বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সংস্কৃত যুগের পূর্ব্ব সাহিত্য, বিশেষ এই গীতিকাগুলি [*মৈমনসিংহ-গীতিকা*] পাঠ করিলে সে ভুল ঘুচিয়া যাইবে। খাঁটি বাঙ্গালা যে প্রাকৃতের কত নিকট ও সংস্কৃত হইতে কত দূরবর্ত্তী তাহা স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে।[৩১]

অর্থাৎ লোককাহিনি বা আখ্যান-গীতিকা (গাঁথাকাব্য)-এর বিষয়াবলী নিয়ে 'কিচ্ছা' নামের যে নাট্যঐতিহ্য ময়মনসিংহ অঞ্চলে চর্চিত হচ্ছে, তা বিষয়ের দিক থেকে যেমন বাংলাদেশের নিজস্ব ভাবসম্পদ তেমনি তাতে প্রতিফলিত ভাষারীতিও আমাদের মৌলিক পরিচয়ের অবলম্বন হতে পারে। এই নিজস্বতার পরিচয়ের প্রকাশ শুধু লোককাহিনি বা আখ্যান-গীতিকার ভেতরেই খুঁজে পাওয়া যায় না, এখনও গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত নানা ধরনের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন নির্ভর নাট্য পরিবেশনের মধ্যে। একদিকে তাতে জনসমাজের বর্তমান রূপ যেভাবে প্রতিফলিত হয়, অন্যদিকে জনসমাজে প্রচলিত সমকালীন ভাষার প্রকৃতি ও স্বরূপ প্রকাশিত হয়। এ পর্যায়ে সে ধরনের একটি নাট্যঐতিহ্যের উদ্ধৃতি ও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

২. ৫ পারিবারিক ও সামাজিক জীবন-নির্ভর নাট্যঐতিহ্য

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যে শুধু ধ্রুপদী আখ্যান, নানাবিধ ধর্মীয় কাহিনি, লোককাহিনি ইত্যাদি উপস্থাপিত হয় না, একই সঙ্গে কিছু কিছু নাট্যঐতিহ্যের ভেতর দিয়ে গ্রামীণ মানুষের জীবনচিত্র তথা পরিবারিক ও সমাজিক পরিমণ্ডলের বিবিধ ঘটনা বিভিন্ন উপায়ে পরিবেশিত হয়ে থাকে। জনসাংস্কৃতিক সমীক্ষণে দেখা যায় যে, অন্যান্য নাট্যাঙ্গিকের চেয়ে গ্রামীণ মানুষের ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক ইত্যাদি জীবন নির্ভর নাট্যে অধিকতর প্রাণবন্তভাবে আঞ্চলিক ভাষারূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, গ্রামীণ পালাকার-শিল্পীরা যে সকল নাট্যে নিজের জীবনকে প্রতিফলিত করতে আগ্রহী সে সকল নাট্যে প্রতিদিনের মুখের ভাষা প্রয়োগেই তারা মুখর থাকে। উল্লেখ্য, এ ধরনের নাট্যের যেমন লিখিতরূপ থাকে তেমনি অলিখিতরূপে তথা বাচনিক বা মৌখিকরীতিতেও এ প্রকৃতির নাট্য পরিবেশিত হয়ে থাকে, যথা–দিনাজপুর অঞ্চলে প্রচলিত 'পালাটিয়া' বা 'বান্ধানী গানে'র লিখিত পাণ্ডুলিপি প্রত্যক্ষ করা যায়, পক্ষান্তরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-রাজশাহী-জয়পুরহাট অঞ্চলে প্রচলিত 'আলকাপ গানে'র আসরে সাধারণত কোনো লিখিত পাণ্ডুলিপি ব্যবহৃত হয় না, টাঙ্গাইল অঞ্চলের 'সঙখেলা' বা 'সঙযাত্রা'র পরিবেশন মূলত বাচনিক বা মৌখিকরীতিতে পরিবেশিত হয়।

বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলার তারগাঁও গ্রামের মঙ্গলুচন্দ্র রায় 'বান্ধানী গান'-এর অন্যতম পালাকার, নির্দেশক ও অভিনয়শিল্পী। তিনি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পাননি, তাই হয়ে উঠেছেন স্বশিক্ষিত। 'বান্ধানী গানে'র বিভিন্ন পালা তিনি প্রথমে হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে ধারন করেন এবং পরে তা আসরে পরিবেশন করেন। ১৭ এপ্রিল ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে দিনাজপুর জেলার তারগাঁও গ্রাম থেকে জনসাংস্কৃতিক সমীক্ষণের মাধ্যমে মঙ্গলুচন্দ্র রায় রচিত 'বান্ধানী গান' বা 'পালাটিয়া'র 'মাটি কাঁপা দেওয়ানি' পালাটি সংগৃহীত হয়। পালাটি দিনাজপুর জেলার আঞ্চলিক ভাষায় রচিত, দৃষ্টান্ত হিসেবে কিছু অংশের উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে :

মাটি কাঁপা : সবায় জানে তোগ চিনে চিনিবার বাকি নাই। ও তোর মতন মানুষে নাই।

চিলকো : গটায় ঘুরেক ইউনিয়নটা মানুষের নাগা ঝগড়া- ফকির বইডাগিক ভিক্ষা দিস না।

সুতুরি : আহুকেতু শনি দিষ্টান শয়তানের নাই আরাম ও তোর নাই আল্লা ভগবান।

চিলকো : বিষ খাওয়া ফাঁসি নাগা বাঁচাউ দিন ভগবানটা মানুষ মোলে কথা কহে না।... মোর কি হবে তুই মোলে, দেখিবে সতনীর বেটা তোর অসুখ-বেরাম পালায় না।... মোর বাপ মাও দিছে বিহা ভবিষ্যৎ দেখে নাই মোর জমি বাড়ি আছে তোর।...

ফকির বেশে মাঠি কাঁপার গান :

আল্লা ভগবান দুই ভাই

Dhaka University Institutional Repository

মুই কহেছু কাহয় নাই
ফকির ফাকরার ভাঙ্গা বাড়ি
দে দিন ওমাক সাহা করি॥[৩২]

এখানে দু'একটি ক্রিয়া ও বিশেষ্য ছাড়া প্রায় অধিকাংশ শব্দ আঞ্চলিক। যে আঞ্চলিক ভাষার ভেতর দিয়ে দিনাজপুর অঞ্চলের সাধারণ গ্রামীণ মানুষের ব্যক্তি জীবনের জীবনচিত্র ও জীবনদর্শন একই সঙ্গে ধৃত হয়েছে।

টাঙ্গাইল জেলার প্রসিদ্ধ নাট্যঐতিহ্য 'সঙযাত্রা' বা 'সঙখেলা'র বিভিন্ন পালাতেও আঞ্চলিক ভাষার এ ধরনের সহজ-সুন্দর রূপ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ভাষা বিচারের ক্ষেত্রে টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলার কাওয়ালজানি গ্রামে 'সঙযাত্রা'র মৌখিক আসরে পরিবেশিত 'পিতা-পুত্রের সঙ খেলা' পালা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যায়। যথা :

পুত্র : বাবারে বাবারে...।

পিতা : এই বাবারে বাবারে করবা না... তোরে খুঁজতি খুঁজতি আমার চোক একেবারে ঘুলা হয়ে গেছে গা...এই কই আছিলি?

পুত্র : কাম-কাজ করতি করতি ভুইলা গিছি গা বাবা...।

পিতা : কাম-কাজ করতি তুই ভুইলা গিছিস গা!

পুত্র : হ'... এই এই...

পিতা : এই রকম মিছা কতা কস ক্যান... কোন খ্যাতে কাম করছোস...?

পুত্র : এট্টাও না।

পিতা : এই দেখেন– কইলাম কাম-কাজ করতি... অহনও এট্টা ক্ষ্যাতেও যায় নাই... এই কোনে আছিলি?

পুত্র : এই না... আমার না... এই না... এই বাবারে...।

পিতা : কী হয়ছে-ভাইঙ্গা বুললেই না আমি বুঝতি পারি।

পুত্র : এই না... এই না... বাবারে...।

পিতা : আরে কী হয়ছে বলবি তো।

পুত্র : ভালো লাগে নারে বাবা।

পিতা : আরে ভালো লাগে না ক্যান? ক' কী হয়ছে–তোর কি সদ্দি-জ্বর হয়ছে?

পুত্র : না, সদ্দি লাগে নাই গা।

পিতা : তে কী হয়ছে–মাথা বিষ করে?

Dhaka University Institutional Repository

পুত্র : ভালো লাগে না।

পিতা : ভালো লাগে না–তাহলি আমি দাঁড়া ডাক্তারখানা থিকে ভিটামিন আইনে দিই...তুই সুস্থ হোবি গা।

পুত্র : ওতি ভাল হোবি নারে বাবা...।

পিতা : কী খায়লি তাহলি ভাল হোবি...?

পুত্র : এই না... এই না... বাবা রে... এই না...

পিতা : কি হয়ছে বলবি তো...

পুত্র : এই না... এই না... জানস না বাবা তুই...।

পিতা : আরে আমি জানলে তে কইতাম-ই... এই কি হইছে...?

পুত্র : বাবারে...।[৩৩]

উদ্ধৃতিতে 'কইতাম', 'কইলাম', 'জানস', 'ভুইলা গেছিগা', 'আইনে দিই', 'ওতি', 'খায়লি', 'জানস না', 'হোবি' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগের ভেতর দিয়ে টাঙ্গাইল অঞ্চলের গ্রামীণ মানুষের ভাষাভঙ্গির কিছু পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, যদিও উপস্থাপন মুহূর্তে এই আঞ্চলিক ভাষার স্বরূপ গ্রামীণ ও আঞ্চলিক শিল্পীদের মুখে আরও বেশি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

উল্লেখ্য, সকল ক্ষেত্রে গ্রামীণ মানুষের পারিবারিক ও সমাজ-জীবন নির্ভর আখ্যান পরিবেশনে আঞ্চলিক ভাষার নিখাঁদ প্রয়োগ নাও হতে পারে, ক্ষেত্রবিশেষে মিশ্ররীতির ভাষা তথা লোক ও শিষ্ট দুই ধরনের ভাষারীতি মিশ্রণ প্রত্যক্ষ করা যায়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে প্রচলিত আলকাপ-গম্ভীরা নাট্যাঙ্গিক অধিকাংশক্ষেত্রে চাপাইনবাবগঞ্জের লোক বা আঞ্চলিক ভাষারীতিকে আশ্রয় করেই পরিবেশিত হয়ে থাকে। ক্ষেত্রসমীক্ষণ বা জনসাংস্কৃতিক সমীক্ষার অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষ করা যায়, আলকাপগানের বিস্তৃতি যখন চাপাইনবাবগঞ্জের গণ্ডি ছাড়িয়ে রাজশাহী অতিক্রম করে নওগাঁ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে তখন তার ভাষারীতিতে চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভাষারীতির পরিবর্তে নওগাঁর স্থানীয় ভাষারীতির সঙ্গে শিষ্টভাষারীতি প্রযুক্ত হয়। ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহী জেলার পুঠিয়া রাজবাড়ির মাঠে পুঠিয়া থিয়েটার আয়োজিত জাতীয় ঐতিহ্যবাহী নাট্য উৎসবে নওগাঁর আনন্দ মোহন বাগচীর স্বদেশী আলকাপ দলের 'দেবর-ভাবী' পালায় এ ধরনের মিশ্র ভাষারীতির প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করা গেছে।[৩৪] আসলে, লৌকিক জীবনের স্বতঃস্ফূর্ততার প্রতিফলন ঘটে বলে একদিকে যেমন পারিবারিক ও সামাজিক জীবন নির্ভর নাট্যঐতিহ্য আঞ্চলিক ভাষার গাঁথুনিকে অনুসরণ করে, অন্যদিকে তেমনি সেই

Dhaka University Institutional Repository

নাট্যঐতিহ্য যখন আঞ্চলিক গণ্ডি অতিক্রম করে অন্যত্র গমন করে বা প্রচার মাধ্যমে স্থান করে নেয় তখন তাতে মিশ্র ভাষারীতি গৃহীত হয়।

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ভাষা বিচারের সামগ্রিক দিক বিবেচনা করলে যে সকল সিদ্ধান্ত গবেষকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হল–১. সে সকল ঐতিহ্যবাহী নাট্যরীতির সাথে ভক্তিরস যুক্ত তার ভাষা শিষ্ট বা মান্য [আদর্শ] রূপ পরিগ্রহ করে, আর তা যদি সনাতন কোনো দেব-দেবী বা লোকপুরাণের চরিত্রদের আশ্রয় করে–তবে তাতে সংস্কৃত প্রণাম, শ্লোক ও সংস্কৃত ভাষার প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়; ২. অনুষঙ্গ হিসেবে ইসলামের শরিয়তি-মারফতি বিষয় যুক্ত হলে তাতে আরবি, ফারসি শব্দের ব্যবহার প্রত্যক্ষ করা যায়; ৩. লৌকিককাহিনি বা লৌকিক জীবন নির্ভর নাট্যঐতিহ্য অনিবার্যভাবে আঞ্চলিক ভাষাকে আশ্রয় করেই দর্শক-শ্রোতাদের সামনে অভিনীত হয়ে থাকে; ৪. যে কোনো আঞ্চলিক ভাষার ঐতিহ্যবাহী-নাট্যই আঞ্চলিক পরিমণ্ডলকে অতিক্রম করে অন্যত্র গমন করলে অনেকক্ষেত্রে তাতে ভাষার মিশ্রণ তথা আঞ্চলিকতার সঙ্গে শিষ্ট বা মান্য ভাষার কিছু কিছু প্রভাব গৃহীত হয়, আর এটি ঘটে মূলত পালাকার বা অভিনয়শিল্পী কর্তৃক দর্শক-শ্রোতাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের নিমিত্তে; ৫. আসলে, ঐতিহ্যবাহী নাট্যের পরিবেশনে মিশ্ররীতির ভাষার প্রয়োগ ঘটে আরেকটি বিশেষ মুহূর্তে, বিশেষ করে যে কোনো আখ্যান পরিবেশনের সময় গায়ক-পালাকার-শিল্পীরা শিষ্টভাষার ব্যবহার করলেও যখন মূল আখ্যান পরিবেশনের সমান্তরালে দর্শক মনোরঞ্জনের জন্য আখ্যান বর্হিভূত যে দৃশ্য সৃজন করেন তখন তারা সেখানে আঞ্চলিক ভাষারীতি প্রয়োগ করে থাকেন। এভাবেও ঐতিহ্যবাহী নাট্যে অনেকক্ষেত্রে ভাষার মিশ্রণ সম্ভব হয়।

সবশেষে বলা যায় যে, এ ধরনের ভাষা বিচারের ভেতর দিয়ে একদিকে যেমন বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ভাষাকাঠামোর নতুন পরিচয়কে শনাক্ত করা গেল, একইসঙ্গে ঐতিহ্যবাহী নাট্যে প্রচলিত ভাষারীতির স্বরূপ বিশ্লেষণের জন্য ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার নতুন ক্ষেত্র রচিত হল।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

[১] আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসংস্কৃতি*, (নয়াদিল্লি : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, ১৯৮২), পৃ. ১২৯
উপর্যুক্ত গ্রন্থে 'লোকনাট্য' সম্পর্কে বলা হয়েছে :

ক. 'লোকনাট্য লোকজীবনের কাহিনির উপর ভিত্তি করে মুখে মুখে রচিত এবং অভিনীত নাটক।'
প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

খ. 'নিরক্ষর গ্রাম্য এই সব নাটকের পালা রচয়িতারা সারা বছর ধরে গ্রামের সামাজিক এবং পারিবারিক নানা ঘটনার উপর লক্ষ্য রাখে... মুখে মুখে নাটক রচনা করে এবং তার অভিনয় করে। সমস্ত ঘটনাটির ধারাবাহিকতা রক্ষা করে গান রচিত হয় এবং তাতে আঞ্চলিক লোকসঙ্গীতের সুরারোপ করা হয়। মধ্যে মধ্যে তাৎক্ষণাৎ মুখে মুখে রচিত আঞ্চলিক ভাষায় সংলাপ ব্যবহার করা হয়।'
প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯-১৩০

গ. '... মধ্যে মধ্যে আঞ্চলিক উপভাষায় তাৎক্ষণিক মুখে মুখে রচিত গদ্য-সংলাপও ব্যবহার করা হয়।'
প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

ঘ. '... যদিও তা আঞ্চলিকতার পরিচয় বহন করে। এর ভাষায়, সংলাপে আঞ্চলিক উপভাষা বিদ্যমান। জীবনযাত্রার আঞ্চলিক রীতি-নীতির ছাপ লোকনাট্যে আছে। এগুলির মধ্যে বৈচিত্র্য আছে, আছে ঐক্যের সূত্রও। লোকনাট্য মূলত লোকসমাজের আত্মিক ও বৈষয়িক জীবনের দর্পণ।'
মাধুরী সরকার, "লোকনাট্য", *লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*, দুলাল চৌধুরী ও পল্লব সেনগুপ্ত (সম্পাদিত), (কলিকাতা : পুস্তক বিপণি, ২০১৩), পৃ. ২১১-২১২

[২] ক. 'পৃথিবীর সব দেশেই লিখিত সাহিত্য বা সংস্কৃতিধারার সঙ্গে অলিখিত বা মৌখিক একটি ধারাও সমান্তরালভাবে চলে এসেছে। এই অলিখিত কলার মধ্যে প্রাচীন শিল্প, অনুষ্ঠান উৎসব সমাজে সংহতির আসল রূপ। বাংলার লোকনাট্যের আলোচনা এগুলির বিচার জরুরী।'
দুলাল চৌধুরী, "লোকনাট্য", *লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*, দুলাল চৌধুরী ও পল্লব সেনগুপ্ত (সম্পাদিত), (কলিকাতা : পুস্তক বিপণি, ২০১৩), পৃ. ২১২

খ. 'লোকনাট্য প্রধানত অলিখিত (এখন লেখার প্রচলন হয়েছে)।... লেখনীর শাসন না থাকলেও লোকনাট্যের গান, সংলাপ শৃঙ্খলাবিহীন যথেষ্ট নয়। অলিখিত, অভিজ্ঞতাজাত একটা শৃঙ্খলা লোকনাট্যে ধরা থাকে।'
মাধুরী সরকার, "লোকনাট্য", *লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*, দুলাল চৌধুরী ও পল্লব সেনগুপ্ত (সম্পাদিত), (কলিকাতা : পুস্তক বিপণি), ২০১৩, পৃ. ২১১

[৩] অষ্টকগান বা অষ্টকপালার অভিনয় উপস্থাপন বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা আসরে যে বাড়ির উঠানে হোক বা অস্থায়ী-স্থায়ী মঞ্চে হোক লিখিত পাণ্ডুলিপি দর্শক-শ্রোতাদের সামনে নির্দেশক অভিনয়শিল্পীদের পাশে থেকে ব্যবহার করেন। এছাড়া, নাট্যরীতি যাত্রাগান, ঢপযাত্রা, গাজীর যাত্রা, কৃষ্ণলীলা, এমনকি হাজং, চাকমা ইত্যাদি নৃগোষ্ঠীদের বিচিত্র ধরনের নাট্য পরিবেশনে পালার নির্দেশক বা প্রম্পটার কর্তৃক লিখিত পাণ্ডুলিপি ব্যবহৃত হয়।

[৪] ব্যক্তিগত ক্ষেত্রসমীক্ষণে মিহির ঘোষ, অমল ব্যানার্জী, দুলাল চক্রবর্তী, অনিতা রাণী দেবনাথ, এমনকি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শ্যামলী দাসীকে ঢাকার বিভিন্ন মন্দির, সাভারের পালপাড়া মন্দির, টাঙ্গাইলের পাকুল্লার রাধাকালাচাঁদ মন্দির প্রভৃতি স্থানে লীলানাট্য পরিবেশন করতে দেখেছি। টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর থানার পাকুল্লা গ্রামে রাধা-কালাচাঁদ মন্দির সংলগ্ন নাটমণ্ডপে ৮ মে ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া থানার বাল্লোপাড়া গ্রামের বিখ্যাত কীর্তনীয়া মিহির ঘোষ ও তাঁর দলের পদাবলি কীর্তন *গৌষ্ঠলীলা*'র পরিবেশন প্রত্যক্ষণ এবং আসর শেষে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে কীর্তনীয়ার নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অবলম্বনে।

[৫] ব্যক্তিগত ক্ষেত্রসমীক্ষণে ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার গাড়াপোতা গ্রামে সুকান্ত স্মরণী ক্লাব আয়োজিত ৪০তম অষ্টক মেলাতে যোগ দিয়ে এ ধরনের তথ্য ও প্রামাণ্য সংগ্রহ করেছি। নড়াইলের বিপিন বিহারি ও মাগুরার বীরেন্দ্রনাথ রায় লিখিত পাণ্ডুলিপি সেখানকার অষ্টকগানের আসরে ব্যবহৃত হয়।

[৬] ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শ্যামলী দাসী প্রতি বছর বিভিন্ন বাংলাদেশে 'পদাবলি কীর্তন' পরিবেশন করে থাকেন।
সাইমন জাকারিয়া, "প্রেম ভিন্ন মিলন নাই", *প্রণমহি বঙ্গমাতা*, চতুর্থ পর্ব, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৮), পৃ. ১৩৫

[৭] পবিত্র সরকার, *লোকভাষা লোকসংস্কৃতি*, (কলিকাতা : চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৯৭), পৃ. ১২১

Dhaka University Institutional Repository

[৮] বাক্যে ব্যবহৃত 'মান্য বা আদর্শভাষা' কথাটি পবিত্র সরকার প্রণীত *লোকভাষা লোকসংস্কৃতি* শীর্ষক গ্রন্থধৃত "লোকভাষা ও লৌকিক ভাষাতত্ত্ব" শিরোনামের প্রবন্ধ থেকে গৃহীত হয়েছে।

প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

[৯] বাচনিক বা মৌখিকরীতির নাট্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে সরাসরি আসর থেকে শব্দধারনযন্ত্রে ধারনকৃত পালার শ্রুতি লিখনকে 'বাচনিক বা মৌখিকরীতির পাণ্ডুলিপি' হিসেবে বোঝানো হয়েছে। হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি যা সরাসরি আসরে ব্যবহৃত হয়, তার অনুলিপি অবলম্বনে আলোচনা করা হয়েছে।

[১০] সাইমন জাকারিয়া, "এই কীর্তন গান নহে", *প্রণমহি বঙ্গমাতা*, প্রথম পর্ব, ঢাকা : উত্তরণ, ২০০৪, পৃ. ৪৭-৪৮

[১১] লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী থানার স্বর্ণামতি মন্দিরে শিবরাত্রি উপলক্ষে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে কুড়িগ্রামের পালাকার-শিল্পী কৃপাসিন্ধু রায় সরকার কর্তৃক পরিবেশিত 'রামলীলা'র 'সীতার অগ্নিপরীক্ষা' পালার অডিও-রেকর্ডারে ধারণকৃত অংশের শ্রুতিলিখন।

[১২] প্রাগুক্ত

[১৩] পবিত্র সরকার "লোকভাষা ও লৌকিক ভাষাতত্ত্বে"র আলোচনা করতে বাংলা প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যেও এ ধরনের বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি লিখেছেন–"তৎসম শব্দের সংখ্যাল্পতা, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দাবলির আধিক্য; ইংরেজি শব্দের মৌখিক রূপান্তর–টেন (train), টাইম (time), ডেরাইভার (driver), এস্‌টাইক (strike) ইত্যাদি।"

পবিত্র সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

[১৪] পবিত্র সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

[১৫] প্রাগুক্ত

[১৬] সাইমন জাকারিয়া, "এই কীর্তন গান নহে", *প্রণমহি বঙ্গমাতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮

[১৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

[১৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

[১৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

[২০] নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর থানার বগাউড়া গ্রামের রাধাকৃষ্ণ সম্প্রদায় পরিবেশিত 'মহিষাসুরবধ' পালার ধারণকৃত শ্রুতিলিখন।

[২১] প্রাগুক্ত

[২২] মানিকগঞ্জ জেলার চরখণ্ড গোলরা গ্রামে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে পরিবেশিত 'শহীদে কারবালা' শীর্ষক ইমামযাত্রার হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধৃত।

[২৩] মানিকগঞ্জ জেলার চরখণ্ড গোলরা গ্রামে পরিবেশিত 'শহীদে কারবালা' শীর্ষক ইমামযাত্রার পাণ্ডুলিপি রচয়িতা নূর মোহাম্মদ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে বলেছেন–তিনি পাণ্ডুলিপিটি মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু' অবলম্বনে রচনা করেছেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ, স্থান : চরখণ্ড গোলরা, চাঁনমিয়া পির সাহেবের গৃহপ্রাঙ্গণ।

[২৪] সাইমন জাকারিয়া ও নাজমীন মর্তুজা, *ফোকলোর ও লিখিত সাহিত্য : জারিগানের আসরে 'বিষাদ-সিন্ধু' আত্তীকরণ ও পরিবেশন-পদ্ধতি*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০১২), দ্রষ্টব্য

[২৫] সাইমন জাকারিয়া, "কত রূপ ধরে গাজী মসজিদে থাকিয়া", *প্রণমহি বঙ্গমাতা*, তৃতীয় পর্ব, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৭), পৃ. ১৭-৬০

[২৬] স্থানে স্থানে ঐতিহ্যবাহী নাট্যগীতের ভাষারীতি সম্পর্কে গায়কগণ নিজেরাও অত্যন্ত সচেতন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ঝিনাইদহ অঞ্চলের গাজীর গানের গায়ক রওশন আলী জোয়ারদারের কথা। ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ অঞ্চলে অনুষ্ঠিত গাজীর গানের আসরে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন:

> আমার বাড়ি হোলো দুধসর। ভাটই বাজারের পাশে। আমি হয়তো গান শুনায়ে আপনাদের খুশী করতি পারবো না, আপনাদের মন ছুঁয়ানের যোগ্যতা আমার হয়নি। আমি অল্প বয়াসে গান শিকেছি। হয়তো আপনারা আমার গান উপভোগ করতি পারলি, আমি গাতি পারবানে। যদি কোনো ভুলভ্রান্তি হয় তে নিজির সন্তানজ্ঞানে মাপ করবেন। আর একটা কথা আছে, তা হল–এক দ্যাশের বুলি আরেক দ্যাশের গালি। হয়তো গানের একই সুর-কতা সব জা'গা এক না। এক এক জা'গা এক এক সুর-কতায় গান হয়।

সাইমন জাকারিয়া, "গাজীর গানের ফোকরে পালা", *প্রণমহি বঙ্গমাতা*, প্রথম পর্ব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

Dhaka University Institutional Repository

[২৭] দীনেশচন্দ্র সেন, *পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা*, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, (কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩০), পৃ. ভূমিকা ১

[২৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ভূমিকা ১-৩

[২৯] সাইমন জাকারিয়া, "উতলা সুন্দরী ও কাকাধরের খেলা", *প্রণমহি বঙ্গমাতা*, প্রথম পর্ব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬-৬১

[৩০] অদ্বৈত মল্লবর্মণ, *রচনাসমগ্র*, [সম্পাদনা : অচিন্ত্য বিশ্বাস], (কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১১), পৃ. ৭৮

[৩১] দীনেশচন্দ্র সেন, *মৈমনসিংহ-গীতিকা*, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, (কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩), পৃ. (১৭)-(১৮)

[৩২] দিনাজপুর জেলার কাহারোল থানার তারগাঁও গ্রামে ১৭ এপ্রিল ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে পরিবেশিত 'বান্ধানী গানে'র ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত মঙ্গলুচন্দ্র রায় লিখিত 'মাটি কাঁপা দেওয়ানিয়া' পালা থেকে উদ্ধৃত।

প্রসঙ্গক্রমে ঐতিহ্যবাহী নাট্যে লিখিত পাণ্ডুলিপি ও তার ভাষারীতির ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচনা করে উত্তরবঙ্গের দুই ধরনের নাট্যপালা ও পালাকার সম্পর্কে কিছু তথ্য উল্লেখ করা যায়, যার একটি হল—'বান্ধানী গানে'র (যা শিক্ষিত সমাজে 'পালাটিয়া' নামে অধিক পরিচিত) আঙ্গিকে পরিবেশিত 'মাটি কাঁপা দেওয়ানি' পালা এবং অন্যটি হল—'রামযাত্রা'র আঙ্গিকে পরিবেশিত 'রাম লক্ষ্মণ ও সীতার বনবাস' পালা। এই দুটি নাট্যাঙ্গিকে পরিবেশিত পালারই লিখিত পাণ্ডুলিপি রয়েছে। কিন্তু একটি পাণ্ডুলিপি (রামযাত্রার আসরে) সরাসরি ব্যবহৃত হয়েছে প্রম্পটার কর্তৃক আর অন্য পাণ্ডুলিপিটি (বান্ধানী গানের আসরে) ব্যবহৃত হয়েছে গ্রীণরুম থেকে অভিনয়শিল্পীর আগমন-নির্গমনের নির্দেশনা হিসেবে। অবশ্য দুটি অভিনয়রীতির পাণ্ডুলিপির আলাদা আলাদাভাবে একক রচয়িতা রয়েছেন—এক্ষেত্রে অনেকের মনে প্রশ্নের উদয় হতে পারে এতে ঐতিহ্যবাহী নাট্যের সামষ্টিক পরিচয় হারিয়ে যায় কি-না? সে প্রশ্নের উত্তরে পালাকার-গায়কগণ জানান যে, পালাকারগণ প্রথমে এককভাবে কাহিনির কাঠামোটা দাঁড় করান, তারপর তা নিয়ে দলের অন্যান্য শিল্প-কুশীলবদের সঙ্গে বসে পালাটি আবার নতুনভাবে বিন্যাস ও পুনঃরচনা করেন। গত ১৭ এপ্রিল ২০১০ তারিখে দিনাজপুর জেলার কাহারোল থানার অন্তর্ভূক্ত তারগাঁও-উপরপরি গ্রামে বসে বান্ধানী গান (পালাটিয়া)-র 'মাটি কাঁপা দেওয়ানি'পালার পালাকার মঙ্গলুচন্দ্র রায় (৫৪) তার নিজের পালা রচনা সম্পর্কে এমনটাই জানিয়েছেন। তিনি একজন স্বশিক্ষিত পালাকার, নিজে কখনো কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেন নি, অর্থাৎ কোনো স্কুলে বা নাইটস্কুলেও যান নি, তারপরও নিজের চেষ্টায় তিনি পড়তে ও লিখতে পারেন। নিজের সাদা খাতায় তিনি অঙ্কনশিল্পীর স্কেচের মতো প্রথমে পালার খসড়া তৈরি করেন এবং তা পড়ে শোনান তার বান্ধানী গানের দলের অভিজ্ঞ শিল্পীদের। এরপর তিনি বান্ধানী গানের শিল্পীদের মতামতের ভিত্তিতে পালাটিকে আসরের উপযোগী করে তোলেন। তবে তো ঐতিহ্যবাহী নাট্যের এই পাণ্ডুলিপি রচনা এবং তা আসরে উপস্থাপনের এই প্রক্রিয়াটি শেষ পর্যন্ত নিশ্চিতভাবেই সমাজের একটি সামষ্টিক সৃজনশীল ফসলই হয়ে ওঠে।

[৩৩] সাইমন জাকারিয়া, "পিতা-পুত্রের সঙখেলা", *প্রণমহি বঙ্গমাতা*, প্রথম পর্ব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮

[৩৪] সাইমন জাকারিয়া, "স্বদেশী আলকাপ কথা", *প্রণমহি বঙ্গমাতা*, দ্বিতীয় পর্ব, (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬), পৃ. ১২৭-১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ইতিহাস, ক্রমবিবর্তন ও বিষয়বস্তুর আলোচনা-বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয় যে, এদেশের সহস্রাব্দ প্রাচীন নাট্যচর্চার ইতিহাসের সাথে গ্রথিত রয়েছে সামাজিক মানুষের মানবিক আকাঙ্ক্ষার চিরায়ত প্রকাশ; জীবজগতের মধ্যে জনমানুষের সৃজনশীলতা জাতি, ধর্ম, ভূগোল, সময় ও রাজনৈতিক সীমাকে অতিক্রম করে কীভাবে সমন্বিত আবেগে একত্রিত হয়—তার পরিচয় গ্রথিত রয়েছে বাংলাদেশের ইসলামপন্থী, সনাতন ধর্মাবলম্বী, নাথসম্প্রদায়, বৈষ্ণব, খ্রিষ্ট, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মাচারী মানুষের ঐতিহ্যবাহী নাট্যকর্মে।

একদিকে *রামায়ণ-মহাভারতে*র অন্তর্ভুক্ত বৈদিকযুগের ধর্মচেতনা, পারিবারিক ও সামাজিক মানুষের নীতি-আদর্শ, মূল্যবোধ ইত্যাদি সমকালের বাংলাদেশের জনরুচির সাথে সংকরের মাধ্যমে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের আসরে প্রতিনিয়ত অভিনীত ও রূপায়িত হচ্ছে; অন্যদিকে ইসলামের ইতিহাসের করুণ ও মর্মান্তিক ঘটনা কারবালার বিষয়বস্তু নিয়ে এদেশের মানুষ সময় ও ভূগোলের সীমারেখা অতিক্রমের মাধ্যমে নানা ধরনের নাট্য, নৃত্য, গীত ও কৃত্যের উপস্থাপনে সীমাহীন সক্রিয়তা প্রদর্শন করেন। পাশাপাশি, এদেশে বসবাসরত খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী নাট্যামোদী মানুষ বাইবেলের নানা কাহিনি ও খ্রিষ্ট ধর্মের বিভিন্ন সাধক-উপাসকদের ইতিহাস নাট্যগীতাকারে অভিনয় করেন; বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা তাঁদের ধর্মগুরু গৌতমবুদ্ধের জীবনের ত্যাগের কাহিনি *সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ* নামে কীর্তনাঙ্গিকে, বৈষ্ণবগণ চৈতন্যমহাপ্রভুর মানবপ্রেমে জাগ্রত হয়ে ওঠা কাহিনি *নিমাই-সন্ন্যাস* নামে লীলানাট্যরীতিতে অভিনয় করেন।

বাংলাদেশে প্রচলিত সকল ধর্মসম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের মূলে গ্রথিত থাকে মানবিক মূল্যবোধ ও মানুষের জীবনের নৈতিক আকাঙ্ক্ষার মর্মবাণী, যাতে সেই অনাদিকাল থেকে এদেশীয় ঐতিহ্যবাহী নাট্যরীতিসমূহ অসাম্প্রদায়িক জাতি-রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষার উদ্বোধন গীত ধ্বনিত হয়। উল্লেখ্য, ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ভেতর দিয়ে এই সুগভীর দেশপ্রেমী ও মানবিক মূল্যবোধের মর্মবাণী প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে নাট্যশিল্পীরা যেভাবে নানা ধরনের কাহিনি, ঘটনা ও অভিনয়রীতিকে আশ্রয় করেন, ঠিক একইভাবে নাট্যের ভাব প্রকাশের নিমিত্তে ভাষারীতিকে গ্রহণ করেন।

এই অভিসন্দর্ভে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণ ও বিশ্লেষণের আলোকে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের বিষয় ও ভাষারীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ সূত্রাকারে নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপন করা যায় :

১. বাংলাদেশে প্রচলিত ধ্রুপদী আখ্যান-নির্ভর নাট্য, ধর্মীয় বা সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাস-নির্ভর নাট্য ইত্যাদি উপস্থাপনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিষ্ট বা মান্যভাষার প্রয়োগ লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব শব্দের মিশ্রণে বাংলা ভাষা-প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করা যায়। এছাড়া, সনাতন, বৈষ্ণব ইত্যাদি ধর্মীয় কাহিনির নাট্য-উপস্থাপনে ক্ষেত্রবিশেষে সংস্কৃত ভাষার নানা ধরনের প্রণাম, শ্লোক ইত্যাদি গৃহীত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২. ইসলামি-কাহিনির রূপায়ণে বাংলা ভাষার শব্দসমূহের সঙ্গে আরবি, ফারসি ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

৩. লোকায়ত জীবনের কাহিনি-নির্ভর নাট্য-পরিবেশনে সাধারণত আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয়।

এ ধরনের সিদ্ধান্ত-সূত্র থেকে স্পষ্ট হয় যে, বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ভাষারীতি নির্ভর করে মূলত নাট্য-উপস্থাপনের বিষয়বস্তু উপর। ঐতিহ্যবাহী নাট্যের অভিনয়শিল্পী, পালাকার, নির্দেশকগণ ঐতিহ্যের পরম্পরাসূত্রেই ভাষারীতি প্রয়োগের উপর্যুক্ত সূত্রসমূহ অনুসরণ করেন।

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যে ভাষারীতি প্রয়োগের একটি প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতি ঐতিহ্যসূত্রে লভ্য এবং এখনও তা ঐতিহ্যবাহী নাট্যের আসরে অনুসৃত হচ্ছে, প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণের অভাবে এতদিন তা অনুল্লিখিত। বর্তমান অভিসন্দর্ভে সেই অনুল্লিখিত, প্রচলিত সত্য যথাযথ তথ্য-প্রমাণ এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকাশ করা হল।

অতএব, এই অভিসন্দর্ভটির মাধ্যমে নতুন একটি তথ্য প্রতিষ্ঠিত হল যে, লোকনাট্য তথা ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ভাষামাত্রই আঞ্চলিক নয়, মূলত বিষয়ের সাথে সংগতি রেখে ঐতিহ্যবাহী নাট্যের আসরে ভাষার প্রয়োগ ঘটে; আর ভাষা প্রয়োগের কারণে বিষয়ের স্বতঃস্ফূর্ততা ও যৌক্তিকভিত্তি যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্যের ভাষা-প্রয়োগ স্পষ্ট করে যে, এদেশীয় নাট্যকলা জনগণের স্বাভাবিক সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে গ্রথিত এবং তা মানুষের নানন্দিক শিল্পচেতনা, সুচিন্তিত রুচিবোধের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট : ১

সংগৃহীত নাট্যপালা

ক. মণিপুরী নটপালা : রাধা-কৃষ্ণের পথরুদ্ধ

রাগালাপ [পুঙ ও করতাল বাদ্যের সাথে] :

তাই রি না তা নাই রি-
তিরি রি রি রি...
তাই রি না তা নাই রি-
তিরি রি রি রি...
তাই রি না তা নাই রি-
তিরি রি রি রি... ।

কথা : শ্রী রাধা ব্রজের মহিমা। কীর্তিশোভাময়ী। শ্রীরাধা প্রেমের মহিমা। কীর্তিশোভা দিও। রাধাকৃষ্ণ একই আত্মা-দুই দেহ ধরি অন্যান্যে বিরাজ করে। শ্রীরাধা কীর্তিময়ী ব্রজের॥

মধুরসের বৃন্দাবনে রাই-কান্হু কুঞ্জতীরে দরশনও ভেল। কৃষ্ণ দেখি বহুবিধ ভাব উপর্জ্জিল॥ কিল কিঞ্চিৎ ভাবও আদি কইলো আকর্ষণ। পলকি নিহারে ভরে চকিত নয়ন॥ লজ্জা-ভয়ে সুন্দরী পরাভদ্র করি। কুঞ্জরও বাহিরে চলে পদ দুইচারি॥ হেনকালে কৃষ্ণচন্দ্র পথরুদ্ধ করে।

কৃষ্ণ : শুন রাধে কমলিনী দুশোভন দিয়ে। আমায় ছাড়ি কোথা যাবে প্রাণও প্রিয়ে॥

কথা : রাই দেখি সুনাগরও জাগরিত হইয়া। পথরুদ্ধ করি রহে ভুজ প্রসারিয়া-

কৃষ্ণ : কুথা যাবে প্রাণো প্রিয়ে আমাকে ছাড়িয়া।
সঙ্গেতে বান্ধিয়া লেহ মোরে প্রেমো দরদিয়া ॥

রাধা : লোকো লজ্জা নাহি তোরে পুরাণো নাগরো...
কৃষ্ণ কহে-সখা নহে আমি নন্দেরো গোপাল।

রাই বলে :

রাধা : কত গোপাল দেখি পালে পাল ॥...

Dhaka University Institutional Repository

কথা : রাই অঙ্গ স্পর্শিতে সামসু নাগর দুহস্ত বাড়ায়। রাই রক্তোৎপলা দুহস্তে বারণ করে যায়...॥
লুফে আসি কৃষ্ণ করে রাইয়ের কাঞ্চুক আকর্ষণ।
অন্তরে আনন্দ রাধা বাহিরে করে নিরীক্ষণ॥ বাহিরে বাম্যতা ভিতরে সুখ মন। সুতন্বিত নাম এই ভাবও বিবিক্ষণ ॥ হেনকালে রাই বলে :

রাধা : লোকে দেখলে বলবে কী
আমি কুলবতী নারী
পথে বাধা করো না ॥

কৃষ্ণ : ওগো রাধে, লোকে দেখলে বলবে ভাল
তোমার ছাড়া রইতে নারি
শুন শুন প্রাণও পিয়ারী ॥ ...

রাধা : পথ ছাড়ো ছাড়ো কালা
আমি কুলবতী নারী
পথে বাধা করো না ॥...

কৃষ্ণ : ছাড়বো না ছাড়বো না-রাজও নন্দিনী।
নির্জনে পাইয়া তোরে-ছাড়িবো কেমনে ॥
বহুদিনের আশা করি-পাইনু এখনই
পাইয়া ধনে ছাড়ি মুই-বাঁচিমু কেমনে ॥

রাধা : ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না নির্লজ্জ কালা। আমি তো পরেরও নারী। পরপুরুষের পবনও পরশে সজলে স্নান করি।
যাও হে যাও চিকন কালা
আমি কুলবতী দিও না জ্বালা ॥

কৃষ্ণ : যাবো না হে রাজনন্দিনী
তোমায় ছাড়ি আমি যাবো কেমুনি ॥...

রাধা : আমি ভানু হারা ধনে যাইমু না বনে
পথের বিরুদ্ধ হও কী কারণে ॥
যাও হে যাও চিকন কালা...
হায় হায় কোন বিধি এ গড়িল তোরে।
নারী সঙ্গে লইতে লজ্জা নাহি তোরে ॥

কৃষ্ণ : ওগো রাধে, কী বলিমু তোরে...তুমি বিনে কে আছে আমার... ওগো রাধে, আমি উঠিতে

Dhaka University Institutional Repository

কিশোরী, বসিতে কিশোরী, কিশোরী চরণও সার, কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন, কিশোরী বাধা।

আমি ইহলোকে রাধা, কাননেতে রাধা, রাধাময়ও স্বপন দেখি,

রাধে, তোমার অন্তরও আমি।

আমারও অন্তরও তুমি।

তোমায়-আমায় একসূত্রে গাঁথা ॥

ওগো রাধে, কহিলে যে লজ্জা নাম। ওগো রাজনন্দিনী তরা ভেবে দেখো-চিন্তা করে দেখো-ওগো রাজনন্দিনী তরা-

যমুনা জল খেলিবারে

অঙ্গের বসন রাখো তীরে

তটের বসন আমি চুরি করি...

রাধে গো, সেদিন হইতে ব্রজধামে

লজ্জা হইল দেশান্তরী-ব্রজের লজ্জা না পাবে খুঁজিয়া...।

রাধা : তোমার চরিত্র এমন কালো। কথা কও যে এমন ভালো। পরের নারী দেখলে তুমি সদা বাড়াও লোভ। বামন হইয়া চাহ চাঁদ ধরিবারে। গুয়াল বলিয়া বিধি লজ্জা নাহি দিল তোরে।

ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না মাধবো...

কৃষ্ণ : রাধে, না বল রাধে। তোমায় ছাড়ি আমি বাঁচি নারে। না বল রাধে...

রাধা : জটিলারও বধূ আয়ওন বনিতা। লোকে দেখলে মোরে কী বলিবে।

ছুঁয়ো না মাধবো...

কৃষ্ণ : ওগো রাধে, লোকে দেখলে কী বলবে? দেখো-

নির্ভয়ে কহিলে মোরে।

আমি দৌড়াইব তারে।

অনঙ্গেরও প্রহরিয়া ধরি।

এ বনের রাজা আমি।

অনঙ্গেরও প্রহরিয়া ধরি।

নারী হইয়া বলে দিও-বন্য শোভা তুমি কর।

সাক্ষাৎ পাইলে কেমনি ছাড়ি।

রাধে, তোমারও অন্তরও আমি।

আমারও অন্তরও তুমি।

তোমায়-আমায় একসূত্রে গাঁথা।

Dhaka University Institutional Repository

শঙ্কা-লজ্জা-ভয় যত বিচিত্র মালার মতো।
ইহা হইলো পীরিতেরও প্রথা।

রাধা : ফিরে দাঁড়াও হে নাগর-ফিরে দাঁড়াও হে...
পরনারীর যৌবনও বিষ্ঠা-তাহা নিতে নাহি লজ্জা-ইহা যখন তোমার প্রথা।
তোমার চরিত্র যেমন কালো...তথা অঙ্গেও বরণ কালো-
ছিঃ ছিঃ কালাচান, ছুঁয়ো না মোরে-
তোরও অঙ্গেও কালো বর্ণ এই ভয়ও করে...
এই ব্রজবৃন্দাবনে কত কালা আছে।
কুন কৃষ্ণ হও তুমি এই ব্রজ মাঝে ॥
কুন কৃষ্ণ গোচারণে ধেনুপালও রাখিল।
কুন কৃষ্ণ রাখালের উচ্ছিষ্ট খাইল।
কুন কৃষ্ণ কদম তলায় বাঁশরী বাজাল...
এদো কৃষ্ণ অর্থে তুমি কুন কৃষ্ণ হও। নিশ্চয় করিয়া মোরে পরিচয়ও দাও।

কৃষ্ণ : রাধে, তুমি রাজারও নন্দিনী আজি বাহিরে আসিয়া। বিকৃতি হইয়াছো বুঝি রবিও তাপে পাইয়া। আবুল-তাবুল কথা কও তুমি রবিরই কিরণে ॥
মস্তকও শীতলও করো শামও কুঞ্জের তলে-
ছাড়বো না ছাড়বো না রাজও নন্দিনী...

কথা : কত না আদরও করি-রাই কোলে ধরি...রাধাকৃষ্ণ এক স্থানে বসিয়া দুজন। পূর্ণিত হইল শোভা ব্রজ-বৃন্দাবন॥ রত্নখচি সিংহাসনে বসিলা দুজন...দুহু তো সুন্দর কী দিবো তুলনা-
প্রাণও দেখি কাচ্চা সোনা।
আজি কনকও লতা যেমন
দোহারও দেহ তেমন
মেঘেরও মাঝে যেন বিজুলি চমকিছে...
সোনার কমল-নীল কমল
এক স্থানে ফুটিছে...॥

মনশিক্ষা : হরি হরি বল মনও রাধে রাধে বল-বেথায় মানব জনম যায় বেফলে। বহু দুঃখ করি ভাই পেয়েছি মানব...এমনও দুর্লভও জনম পাবো কি না পাবো ॥
... ...
আরে মন তুমি চল যাই সেই মথুরা বৃন্দাবনে...আর কবো-পালকিবো যথা এসবও করিয়া মনে যাবো বৃন্দাবনও ধারে...এই মনে করিয়াছি আশা। ধন-জন-পুত্র এসবও করিয়া দূরে

একান্ত হইয়া চলে যাবো-সব দুঃখ পরিহারি বৃন্দাবন বাস করি মাধবপুর মাতিয়া খাইবো—আরে মন তাই বলি—হরি বোল বোল বলিয়া:

দুটি বাহু তুলিয়া
চলো মন বৃন্দাবন নাচিয়া নাচিয়া... ।

এরপর থাকে আকর্ষণীয় ফাগুখেলা। ফাগুখেলায় মূলত ডাখুলারা মৃদঙ্গ বাদনে শূন্যে ঝাপিয়ে উঠে নৃত্য করেন। এ সময়ে সমান তালে পালারাও দুহাতের আবেগে করতাল বাজাতে থাকেন। আর ইশালপা তথা মূলগায়ক বাদ্যের মধ্যে গীত করেন। যেমন :

তরুণী সঙ্গে নট রাই
ভনহি, বিদ্যাপতি দুহু সংহতি...
জনমে জনমে বহু দুহু প্রেমে আরতি॥

সমাপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

খ. সঙযাত্রা : পিতা-পুত্র

বন্দনা :

আমরা পুবেতে বন্দনা করি গো মা
মা গো পুবে ভানুশ্বর।
একদিকেতে উদয় ভানু চৌদিকে আলো ॥
আমরা দক্ষিণে বন্দনা করি গো মা
মা গো ক্ষীর নদী সাগর।
যেই সাগরে চালায় ডিঙ্গা চান্দু সওদাগর॥
আমরা পশ্চিমে বন্দনা করি গো মা
মা গো নবীজীর রওজায়।
তাহারও চরণে জানায় হাজার সালাম॥
আমরা উত্তরে বন্দনা করি গো মা
মা গো কৈলাশ পর্বত।
যেই পর্বতের হাওয়ায় গলে এই দেশের পাথর॥
আমরা চৌদিকে বন্দনা করি গো মা
মা গো মধ্যে করলাম স্থান।
মন দিয়া শোনবেন সবাই সঙখেলার গান॥
আমরা স্বর্গেতে বন্দনা করি গো মা
মা গো স্বর্গেও দেবগণ
পাতালে বন্দনা করি মনসার চরণ॥

পুত্র : বাবারে বাবারে...।

পিতা : এই বাবারে বাবারে করবা না... তোরে খুঁজতি খুঁজতি আমার চোক একেবারে ঘুলা হয়ে গেছে গা...এই কই আছিলি?

পুত্র : কাম-কাজ করতি করতি ভুইলা গিছি গা বাবা...।

পিতা : কাম-কাজ করতি তুই ভুইলা গিছিস গা!

পুত্র : হ'...এই এই...

পিতা : এই রকম মিছা কতা কস ক্যান...কোন ক্ষ্যাতে কাম করছোস...?

Dhaka University Institutional Repository

পুত্র : এট্টাও না।

পিতা : এই দেখেন-কইলাম কাম-কাজ করতি...অহনও এট্টা ক্ষ্যাতেও যায় নাই...এই কোনে আছিলি?

পুত্র : এই না...আমার না...এই না...এই বাবারে...।

পিতা : কী হয়ছে-ভাইঙ্গা বুললেই না আমি বুঝতি পারি।

পুত্র : এই না...এই না...বাবারে...।

পিতা : আরে কী হয়ছে বলবি তো।

পুত্র : ভালো লাগে নারে বাবা।

পিতা : আরে ভালো লাগে না ক্যান? ক' কী হয়ছে-তোর কি সদ্দি-জ্বর হয়ছে?

পুত্র : না, সদ্দি লাগে নাই গা।

পিতা : তে কী হয়ছে-মাথা বিষ করে?

পুত্র : ভালো লাগে না।

পিতা : ভালো লাগে না—তাহলি আমি দাঁড়া ডাক্তারখানা থিকে ভিটামিন আইনে দিই...তুই সুস্থ হোবি গা।

পুত্র : ওতি ভাল হোবি নারে বাবা...।

পিতা : কী খাইলি তাহলি ভাল হোবি...?

পুত্র : এই না... এই না... বাবা রে... এই না...

পিতা : কি হয়ছে বলবি তো...

পুত্র : এই না... এই না...জানস না বাবা তুই...।

পিতা : আরে আমি জানলে তে কইতাম-ই...এই কি হইছে...?

পুত্র : বাবারে...।

পিতা : ক' কী হয়ছে তোর...?

পুত্র : বাবারে...।

পিতা : আচ্ছা, তোরে বিয়া করাতি হোবি আমি বুঝছি...।

পুত্র : বাবারে—ইস্‌রে—বুঝছোস বাবারে...।

পিতা : আমি তোরে বিয়া করামুনে...একটা কাম-কাজ দেইখা করস না...পরের একটা মেয়ে যুদি ঘরে আনি তাহলি...।

পুত্র : আমি সব করবো রে বাবারে...হায়রে যেই কতা মোর মনে ছিল বাবা—সেই কতা তোর মনে হয়ছেরে বাবা...।

পিতা : ঠিক আছে, তুই বাড়ি থাক—কয়দিন ঠিকমতো দেখাশুনা করবি—আমি তোর জন্যি সুন্দোর দেখে একটা পাত্রী দেইখা আসি গা...তাহলি কাম-কাজ দেখে করবি তো...।

Dhaka University Institutional Repository

পুত্র : ঠিক আছে বাবা...ভেড়া-ছাগল সব দেকে রাকবো নে...

পিতা : এটা কতা শোন...এই ইলাকা ছা'ড়ে যাবি না...গরু-বাছুরির ঠিক মতো পানি খাতি দিবি...

পুত্র : বাবারে তুমি আগে যাওরে-পরে ব'লোনে কামের কতা...।

পিতা : ঠিক আছে যাচ্ছি...।

পুত্র : তাড়াতাড়ি আসিসরে বাবারে...।

বিয়ে পাগলা ছেলের জন্য বাবা পাত্রী দেখতে বের হয়। বাবা ছেলের জন্যে পাত্রীর খোঁজে এক বাড়িতে যেয়ে হাজির হয়ে দুয়ারে দাঁড়িয়ে বলতে থাকে :

পিতা : বাড়িতি কোনো লোকজন আছেন গো...

নারী ১ : আছি...আপনি কিডা?

পিতা : আমারে আপনি চিনবেন না।

নারী ১ : কেন আইছেন?

পিতা : আইছি একটা শুভ কাজ উপলক্ষে...

নারী ১ : কি শুভ কাজ?

পিতা : শুভ কাজ হলো আমার একটা ছেলের বিয়া করান লাগবো-

নারী ১ : পাত্রী দেখছেন কুনুহানে?

পিতা : পাত্রী দেখি নাই, তবে আশা আছে...আপনাদের এই গিরামে নিশ্চয় কোনো পাত্রী আছে।

নারী ১ : পাত্রী তো আমার একটা মেয়েই আছে।

পিতা : আচ্ছা ঠিক আছে... আপনি মেয়েটাকে আমাকে দেখাইতে পারেন।

নারী ১ : হ দেখাইতে পারি... আপনি যদি দেখেন... তাইলে আপনি ইট্টু ভিতরে আসেন।

পিতা : আচছা ঠিক আছে... আমি ভিতর আইতাছি...।

ঘরের ভিতরে ঢোকার অভিনয় না করেই ভিতরে ঢোকার ইঙ্গিত প্রকাশার্থে খুবই স্বাভাবিকভাবে স্থান পরিবর্তন করে বাবা এবার মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলে :

পিতা : মেয়ে তো দেখতে শুনতে বেশ ভালই তাই না- আচ্ছা তুমি লেখা-পড়া করছো?

নারী ২ : কিছু করছি?

পিতা : আচ্ছা তুমার নামটা কি?

নারী ২ : নাম হল সন্ধ্যারাণী...।

পিতা : সুন্দর নাম...তাইলে সন্ধ্যাবাতি জ্বালাতি তো তুমার আর ভুল হইবো না, তুমার নামই তো সন্ধ্যারাণী।

Dhaka University Institutional Repository

নারী ১ : আচ্ছা...আপনের পছন্দ হইছে?

পিতা : হ... অবশ্য আমার পছন্দ হইছে... ।

নারী ১ : পছন্দ হইলে তো আমাদেও দ্যাশে নিয়ম আছে... ।

পিতা : কি নিয়ম আছে?

নারী ১ : কেউ যদি মেয়ে দেখতি আসে...মেয়ে যদি তার পছন্দ হয়...তবে তারেই বিয়ে করে যাইতে হয়।

পিতা : এটা একটা সম্ভব কতা না-কি...আমি পাত্রী দেখতি আইছি আমার ছেলের জন্যি...এই নিয়ম কত্দিন তে... ।

নারী ১ : অনেকদিন থেকে... ।

পিতা : তাহলে আমারেই করন লাগবো বিয়ে।

নারী ১ : হ... আপনরারেই করন লাগবো... ।

পিতা : না এটা সম্ভব না।

নারী ১ : সম্ভব করতে হবে।

পিতা : আচ্ছা এখন কি আর করন যাইবো...আপনাদের দ্যাশের আইন যখন... আমি রাজি। ছেলের জন্যে মেয়ে দেখবার লাগি আইছিলাম...অহন দেশের আইন-প্রথার হিসাবে নিজিরই বিয়ে করতি হইল...অহন কি করন যাইবো... ।

এই পর্যন্ত বলে নিয়ে বাবা এবারে নব বিবাহিত বউয়ের উদ্দেশ্যে কয় :

পিতা : তোমার মায়ের ইট্টু আশির্বাদ নিয়ে লও যাইগা... আর কি... ।

বউয়ের মা এগিয়ে আসতেই নব বিবাহিত দম্পতি তার পায়ে প্রণাম করে এবং রউনা দেয়। [এদিকে পাত্রী দেখতে যেয়ে বাবার ফিরতে দেরী দেখে ছেলে বেশ অস্থিও হয়ে নিজের মনে নিজে কথা বলতে থাকে :

পুত্র : বাবারে দুইদিন ধরে গেছ না বাবারে...আহস নারে বাবারে... ।

এরমধ্যে বাবা নতুন বউ সাথে বাড়ি ফিরে আসে। ছেলে পিছন ফিরে হঠাৎ বাবাকে দেখে এবং বাবার পিছে নতুন বউ দেখে খুব খুশি হয়। ছেলে ভাবে বউটা তার জন্যই নিয়ে এনেছে বাবা। ছেলে তাই নতুন বউয়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে ওঠে :

পুত্র : বাবা খুব খুশি হইছিরে বাবা... ।

পিতা : খুশি হওন যাইবো না...ভক্তি কর।

পুত্র : ক্যা?

পিতা : এইটা তোর মা।

Dhaka University Institutional Repository

পুত্র : কয় কী! হা, এই আমার বউ-আর...।

পিতা : এই এইটা তো সম্ভব হয় না।

পুত্র : এই না না।

পিতা : এই শোন—জানস না তো তুই। আমি গেছিলাম তোর জন্য মেয়ে দেখতে...ওই দেশের প্রথা-রাজাই ঢোল দিয়া দেছে—যে মেয়ে দেখবার জন্য যায় তারে বিয়ে করে আসা লাগবি...।

পুত্র : হায় হায়রে, বাবারে... তুই আমারে মারছোসরে—এত কষ্ট মোর পরানে সয় নারে।

পিতা : কী করন যাইবো।

পুত্র : হায়! তোরে আমি জীবন ভরে কিয়ের বাবা কইলাম...হায়রে আমি পাড়ার মানুষেরও বাবা কইলেও না আমারে দশ-পাঁচটা বিয়ে করাইয়া দিত...।

পিতা : কী করন যাইবো...।

পুত্র : তুই কেনে আমার জন্যে মেয়ে দেখতে গেলিরে বাবারে...মরছি রে...।

ছেলের পাগলামি দেখে তখন নতুন বউ বলে ওঠে :

নারী ২ : ছেলের তো মাতায় ছিট!

বাবা তখন বউকে বোঝায় :

পিতা : ছেলের মাতায় ছিট নাই। ছেলে তো বিয়ের উপযুক্ত হয়ে গেছে গা-অহন তুমার দ্যাশের আইন হিসেবে আমারে বিয়ে করে আসতি হোলো...।

পুত্র : ক্যান, সব্বোনাশে কাম করছোস বাবা...!

বাবা ছেলের আহাজারি দেখে নতুন বউকে বলে :

পিতা : তুমি ওরে ইট্টু আদও করে থামাওগাচি...।

কথামতো নতুন বউ ছেলেকে থামাতে গেলে ছেলে বলে :

পুত্র : এই তুমি সরো।

এবারে বাবা ছেলের কাছে গিয়ে বলে :

পিতা : অহন তো মনে কর গা-এ তোর মা...।

পুত্র : অ্যার সব্বোনাশে কাম করছো রে-এতদিন ধরে ক্যানে বাবা কইলামরে, অ্যা?

পিতা : তুই না-ইট্টু ভাল কতা ক'য়া তোর মা'রে ইট্টু সান্ত্বনা দে...।

পুত্র : তুই খালি মা ক'য়া ধাপ্পা দিতি চাস।

Dhaka University Institutional Repository

ছেলের অবস্থা দেখে বাবা নতুন বউকে বোঝায় :

পিতা : অহন কী করন যাইবো-তাই না? অহন পুলার যা রাগ না... অহন তো কিছু কইতেও পারি না-যাই হোক না...তুমি তো ঘরে আয়ছো, তুমি এই ছেলেডার ভালো জ্ঞান দিয়ে ছেলেডার ইট্টু মাথাটাথা বাড়াইতে পারো...এইটাই কিন্তু তুমার কাছে আমি চাই...ও যুদি রাগের এট্টা কুাও কয় তুমি কো'ল বল না... ।

নারী ২ : ঠিক আছে... ।

বাবা আর নতুন মায়ের অনুপস্থিতিতে ছেলে এবার একা একাই বিয়ে করার কথা ভাবে এবং বিয়ে করতে বের হয়। শেষে বিয়ে করে বউ নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে।

পুত্র : বাবা একাই বিয়া করবা...আমি বিয়া করবাম না—আমার কি ক্ষমতা নাই—চিহারাই কম আছি না আমি! রাজার নাহাল চিহারা...পছন্দ করবো না—বাবারে মেয়ে দেখতে পাঠায়া ভুল করছলাম... ।

কোনো এক বাড়ির সামনে গিয়ে সে হাঁক ছাড়ে :

পুত্র : বাড়িতি আছ না কি গো কে-রোই...?

নারী ১ : কী-ডা আপনি?

পুত্র : অ্যা?

নারী ১ : আপনি কী-ডা?

পুত্র : বিয়া করবার আইছি।

নারী ১ : আপনার বাড়ি কোথায়?

পুত্র : এই হয়ছে গো...বাড়িতি মর্দা মানুষ নাই?

নারী ১ : না। আমি একাই বাড়িতি।

পুত্র : তে আমি যাই গা।

নারী ১ : না, যাওন যাইবো না, ভিতরে আসো—ভিতরে আসো।

পুত্র : আ'সে গিছি।

নারী ১ : আপনি বিয়া করেন নাই।

পুত্র : এই চিন্তাইতো মরলাম।

নারী ১ : বিয়া করবেন আপনি।

পুত্র : পামু কোনে?

নারী ১ : আমি জুগাড় করে দিবুনি।

পুত্র : দিবুনি...বাবাও করচে বিয়া... ।

নারী ১ : আইচ্ছা একটা কথা বলি—আপনার তো কেউ নাই—আমারও কেউ নাই।

Dhaka University Institutional Repository

পুত্র : আমার বাবাই আছে না।

নারী ১ : তা থাক অসুবিধা নাই, আমার কেউ নাই আমরা দুইজন যুদি স্বামী-স্ত্রী হয়ে যায়...।

পুত্র : বাড়িতি একাই শুয়ে থাকো? তে করো বিয়া...।

বিয়ে করে ছেলে বাড়ি ফিরে আসে। বাড়িতে ঢুকতেই বাবার সঙ্গে দেখা হয়।

পুত্র : ও বাবা রে আমারও বরাত ভাল রে...।

পিতা : বরাত ভাল...তোর মা সারারাত তোর নাগে খালি কান্দে।

পুত্র : আমার মায় কান্দে—কয় কী? বাবা রে আনছি রে...।

পিতা : কী আনছোস?

পিছনে হেঁটে আসা বউকে দেখায় :

পুত্র : এই যে দেক।

বাবার নতুন বউ ছেলের সাথে আসা বউকে দেখে বলে :

পিতা : ইডা তো আমাদের মা-র নাকাল দেকা যায়!

পুত্র : ই' কয় কী?

বাবার বিয়ে করে আনা বউ অর্থাৎ ছেলের নতুন মা ছেলের বিয়ে করে আনা বউয়ের দিকে এগিয়ে এসে ভাল করে দেখে দেখে বলে :

নারী ২ : হ' হ'—এ তো আমাদের মা-ই।

বাবা তার শাশুড়িকে নিশ্চিতভাবে চিনে কুশল জিজ্ঞাসা করে :

পিতা : ভাল আছেন আপনি?

কুশল জিজ্ঞাসার সাথে সাথে বাবা নিজের শাশুড়ি ও ছেলের বউয়ের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে। ছেলে তখন নিজের পা এগিয়ে দিয়ে বাবাকে প্রণাম করতে বলে :

পুত্র : আমারে আমারে...।

পিতা : তুই তো আমার পোলা!

পুত্র : ওইডা আমার বউ না... ওরে সালাম দিলি... আমারেও দেও...।

পিতা : ওইডা তোর বউ হোবি কিয়ের নাইগা?

পুত্র : আমারে আমারে ভক্তি করো...আমি তো তোমার শ্বশুর।

পিতা : শ্বশুর তো মারা গেছে, এইডা তো যখন বিয়া করছি তহন তো শুইনা আইছি...।

Dhaka University Institutional Repository

পুত্র : শুইনা আইছো...অহন কী-ডা? অহন?

পিতা : অহন কী-ডা মানে! এই তোর কতার তো কোন বইল বুঝি না...।

পুত্র : বোঝস না? আমি বিয়া করছি—এই যে তুমার শাওড়িরে...।

পিতা : তুই বিয়া করলি আবার কোন তালে?

পুত্র : তুই একাই বিয়া কইরা আইলা, আমিও তাই একাই কইরা আইলাম, বোঝছ না!

পিতা : এ আবার কেমুন তালের কতা কয়...[স্ত্রীকে লক্ষ করে] এই তুমি তুমার মা'রে নিয়ে ভিতর বাড়ি যাও।

ছেলে এবার তার নিজের বউকে শুনিয়ে বলে :

পুত্র : ভক্তি খালি তুমারে করলো—আমারে তো করলো না...।

নারী ১ : অহন কি করবো...!

পিতা : উনি তো ওর মা লাগে...

পুত্র : আমারও তো বউ নাগে।

পিতা : তাই বুলে তোরে ভক্তি করবো কেমনে?

পুত্র : এইডা কোনো কতা হইল নাকি...।

নারী ২ : আমি কইছিলাম না...ছেলের মাথায় ছিট আছে...।

পুত্র : আমারে ছেলে কইবা না...শ্বশুর কইবা।

পিতা : তাই কি আর কওন যায়—তুই না আমার আপন পুলা।

পুত্র : দেশে বিচার-আচার নাই—তুমি চার-পাঁচটা বিয়া করে আইলা—অহন আমি...আমার ক্ষমতায় করলাম বিয়া...তুমারডা থেকে আমারডা বড়ই আছে...। তাও ভক্তি করবা নাই! তুমি তো দেকছি আইন মানো না।

সমাপ্তি সংগীত

ভালো শেহড়াতৌল গ্রামে সরস্বতী নামে আছে রঙতাম্‌সার গান।
রঙতাম্‌সার জন্ম বাবু রঙতাম্‌সার গ্রাম ॥
এই দলের ওস্তাদ আমার শ্রীচরণ সরকার ॥
এই দলের ম্যানেজার হয় নেপাল সরকার নাম।
এই দলের মাস্টার হয় মোর হরিপদ নাম ॥
এই দলের কমিক হয় মোর বলাই গোপাল শ্যামল নাম।
এই দলের ফ্যামিলি হয় রতন গোপাল নেপাল নাম ॥

সমাপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট : ২

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

ইতিহাসগ্রন্থ :

অমূল্যচন্দ্র সেন : *অশোকলিপি*, (কলিকাতা : ২০০১)

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড*, (কলিকাতা : ১৯৫৯)

আফসার আহমদ : *বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠী নাট্য*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৮)

আশুতোষ ভট্টাচার্য : *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস*, (কলিকাতা : ১৯৭৫)

আহমদ শরীফ : *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, (ঢাকা : ২০০০)

দীনেশচন্দ্র সেন : *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (দ্বিতীয় খণ্ড)*, (কলিকাতা : ১৯৯১)

নীহাররঞ্জন রায় : *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব*, (কলিকাতা : ১৩৮২)

ভূদেব চৌধুরী : *বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, (কলিকাতা : ১৩৬৬)

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : *বাংলা সাহিত্যের কথা, প্রথম খণ্ড-প্রাচীনযুগ*, (ঢাকা : ২০০৬)

... ... : *বাংলা সাহিত্যের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড-মধ্যযুগ*, (ঢাকা : ২০০৭)

শশিভূষণ দাশগুপ্ত : *বাংলা সাহিত্যের নবযুগ*, (কলিকাতা : ১৩৬৩)

সাইমন জাকারিয়া : *প্রাচীন বাংলার বুদ্ধ নাটক*, (ঢাকা : ২০০৭)

সাইমন জাকারিয়া ও নাজমীন মর্তুজা : *বাংলা সাহিত্যের অলিখিত ইতিহাস*, (ঢাকা : ২০১০)

সুকুমার সেন : *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)*, (কলকাতা : ১৯৯৩)

... ... : *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ*, (কলিকাতা : ১৯৫৯)

... ... : *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড অপরার্ধ*, (কলিকাতা : ১৯৬৩)

... ... : *নট নাট্য নাটক*, (কলিকাতা : ১৩৯১)

সুখময় মুখোপাধ্যায় : *প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম*, (কলিকাতা : ১৯৫৮)

সুরেশচন্দ্র মৈত্র : *বাংলা নাটকের বিবর্তন*, (কলিকাতা : ক্যালকাটা বুক হাউজ, ১৯৭৩)

সেলিম আল দীন : *মধ্যযুগের বাঙলানাট্য*, (ঢাকা : ১৯৯৬)

... ... : *বাঙলা নাট্যকোষ*, (ঢাকা : ১৯৯৮)

সৈয়দ আলী আহসান : *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আদিপর্ব*, (ঢাকা : ১৯৯৪)

সৈয়দ জামিল আহমেদ : *হাজার বছর : বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা*, (ঢাকা : ১৯৯৫)

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-সংগীত ও নাট্য বিষয়ক গ্রন্থ :

অতীন্দ্র মজুমদার : *চর্যাপদ*, (কলকাতা : ১৪০০)

অদ্বৈত মল্লবর্মণ : *রচনাসমগ্র*, [সম্পাদনা : অচিন্ত্য বিশ্বাস], (কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১১)

অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায় : *সামাজিক চালচিত্রে যাত্রাগান*, (কলিকাতা : এপ্রিল ১৯৯৮)

অলকা চট্টোপাধ্যায় : *চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী*, (কলিকাতা : ১৯৯৮)

আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পাদিত) : *কুষ্টিয়া পাবলিক লাইব্রেরী : প্লাটিনাম জুবিলী স্মারকগ্রন্থ*, (কুষ্টিয়া : ডিসেম্বর ১৯৮৫)

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (সম্পা.): *কবি শুকুর মাহমুদ বিরচিত গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস*, (ঢাকা : ১৯৭৪)

ওয়াকিল আহমদ : *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, অক্টোবর ১৯৭৪)

গোলাম মুরশিদ : *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*, (ঢাকা : ২০০৬)

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য : *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা*, (কলিকাতা : ১৯৭২)

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : *শূন্যপুরাণ*, (কলিকাতা : ১৩৩৬)

জসীমউদ্‌দীন : *জারীগান*, (ঢাকা : কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড, জানুয়ারি ১৯৬৮)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর : *প্রসঙ্গ নাট্য*, প্রত্যুষকুমার রীত (সংকলন সম্পাদনা), (কলিকাতা : কমলিনী প্রকাশন, ২০১১)

দীনেশচন্দ্র সেন : *পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা*, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, (কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩০)

... ... : *মৈমনসিংহ-গীতিকা*, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, (কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩)

দুলাল ভৌমিক : *সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস*, (ঢাকা : ১৯৯৪)

নির্মল দাশ : *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, (কলিকাতা : ১৯৯৭)

পবিত্র সরকার : *লোকভাষা লোকসংস্কৃতি*, (কলিকাতা : চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৯৭)

বরুণকুমার চক্রবর্তী : *প্রসঙ্গ : লোকপুরাণ*, (কলিকাতা : ১৯৯১)

বসন্তরঞ্জন রায় (সম্পাদিত) : *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, (কলিকাতা : ১৩৫৬)

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গে*, (কলকাতা : মনীষা গ্রন্থালয়, ১৯৯৬)

মণীন্দ্রলাল কুনডু : *বাঙালির নাট্যচেতনার ক্রমবিকাশ*, (কলিকাতা : সাহিত্যলোক, ২০০০)

মহেন্দ্রনাথ দত্ত : *বাংলা ভাষার প্রধাবন*, (কলিকাতা : ১৩৬৪)

যতীন সরকার : *বাংলাদেশের কবিগান*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী ১৯৮৫)

যেরোম ডি'কস্তা : *বাংলাদেশের কাথলিক মণ্ডলী, প্রথম খণ্ড*, (ঢাকা : ১৯৮৮)

Dhaka University Institutional Repository

যোসেফ ডি' রোজারিও (সম্পাদিত) : *মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিষ্ট*, (ঢাকা : পাদ্রীশিবপুর খ্রিষ্টান ডেভলপমেন্ট কমিটি, ডিসেম্বর ১৯৯৩)

রবীন্দ্র গোপ (সম্পাদিত) : *প্রতিবেদন : লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব ১৪২২*, (নারায়ণগঞ্জ : বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, ২০১৫)

রশীদ হারুন : *বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পুতুলনাট্য*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১৪)

শফিকুর রহমান চৌধুরী : *আবদুল হালিম বয়াতী : জীবন ও সঙ্গীত*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০০)

শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত) : *বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য*, (ঢাকা : ১৯৮৫)

সত্যেন্দ্রনাথ বসু ভক্তিসিদ্ধান্ত বাচস্পতি (সম্পা.) : *শ্রীচৈতন্যভাগবত*, (কলিকাতা : দেবসাহিত্য কুটির, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ)

সনৎকুমার মিত্র (সম্পাদিত) : *বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক*, (কলিকাতা : পুস্তক বিপণি, ২০০০)

সাইমন জাকারিয়া : *বাংলাদেশের লোকনাটক : বিষয় ও আঙ্গিক-বৈচিত্র্য*, (ঢাকা : ২০০৮)

... ... : *প্রণমহি বঙ্গমাতা, প্রথম থেকে চতুর্থ পর্ব*, (ঢাকা : ২০০৪-২০০৭)

সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) : *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড-৩, (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩)

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : *ভরত নাট্যশাস্ত্র (প্রথম খণ্ড)*, (কলিকাতা : ১৯৮০)

সৈয়দ আলী আহসান : *চর্যাগীতিকা*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪)

হরিদাস পালিত : *আদ্যের গম্ভীরা*, (কলিকাতা : লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০০৩)

ইংরেজি গ্রন্থ :

Albert B. Lorad : *The Singer of Tales*, (Cambridge : 1981)

Dusan Zbavitel : *Bengali Folk-Ballads from Mymensing and The Problem of Their Authenticity*, (Kolkata : 1963)

Walter J. Ong : *Orality and Literacy: The Technologizing of the Written Word*, (London: 2002)

Dimock Jr, E.C.; Dimock, E.C. : *The Place of the Hidden Moon: Erotic Mysticism in the Vaisnava-Sahajiya Cult of Bengal*, (Chicago : 1989)

John Miles Foley : *Traditional Oral Epic : The Odyssey, Beowulf, the Serbo-Croation Return Song*, (California : 1993)

Mary Frances Dunhan : *Jarigan: Muslim Epic Songs of Bangladesh*, (Dhaka : 1997)

Maria Leach (Edited) : *Standard Dictionary of Folklore, Mythology, and Legend*, (New York : 1984)

Stella Dupuis : *The Yogini Temples of India: In The Pursuit of a mystery: Travel notes*, (Varanasi: 2008)

Syed Jamil Ahmed : *Acinpakhi Infi nity : Indigenous Theatre of Bangladesh,* (Dhaka: 2000)

... ... : *In praise of Niranjan : Islam, Theatre and Bangladesh,* (Dhaka : 2001)

... ... : *Reading Against the Orientalist Grain: Performance and Polilitcs Entwined with a Buddhist Strain,* (Kolkata: 2008)

T. Richard Blurton : *Bengali Myths,* (The British Museum Press : 2006)

সহায়ক পত্র-পত্রিকা :

তাপস ভৌমিক (সম্পাদিত) : *কোরক : সাহিত্য পত্রিকা*, (কলিকাতা : দেশবন্ধুনগর, শারদ ১৪০৫)

সাগরময় ঘোষ (সম্পাদিত) : *দেশ*, সাহিত্য সংখ্যা, (কলিকাতা : ১৩৭২)

Sirajul Islam (Ed.) : *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh,* (Dhaka : June 1995)

সহায়ক প্রবন্ধাবলি :

প্রদ্যোত ঘোষ : "গ্রামীণ লোকনাটক : গম্ভীরা", *বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক: আলোচনা এবং সংগ্রহ,* সনৎকুমার মিত্র (সম্পাদিত), (কলিকাতা : লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, ডিসেম্বর ২০০০)

ফাদার যোফেস ম. গোমেজ (জীবন) : "রামুর পালার ইতিবৃত্ত", *মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিষ্ট*, যোসেফ ডি' রোজারিও (সম্পাদিত), (ঢাকা : পাদ্রীশিবপুর খ্রিষ্টান ডেভলপমেন্ট কমিটি, ডিসেম্বর ১৯৯৩)

মাধুরী সরকার : "লোকনাট্য", *লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*, দুলাল চৌধুরী ও পল্লব সেনগুপ্ত (সম্পাদিত), (কলিকাতা : পুস্তক বিপণি, ২০১৩)

মহম্মদ আয়ুব হোসেন : "গ্রামীণ লোকনাটক : লেটো", সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত *বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক,* (কলিকাতা : ২০০০)

মাইকেল এ লেয়ার্ড : "খ্রিষ্টধর্ম", সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড-৩, (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৩)

রামবহাল তেওয়ারী : "তুলসীদাসের রামচরিতমানসের একদিক", তাপস ভৌমিক (সম্পাদিত), *কোরক : সাহিত্য পত্রিকা,* (কলিকাতা : দেশবন্ধুনগর, বাগুইআটি, খালধার, শারদ ১৪০৫)

সাইমন জাকারিয়া : "চর্যা-সংস্কৃতির আলোকে বাংলাদেশের বুদ্ধ নাটকের ঐতিহ্য অন্বেষণ", রবীন্দ্র গোপ (সম্পাদিত), *প্রতিবেদন : লোককারুশিল্পমেলা ও লোকজ উৎসব* ১৪২২, (নারায়ণগঞ্জ : বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, ২০১৫)

সুকুমার সেন : "বাংলার সংস্কৃতিতে মুসলমান প্রভাব ও মুসলমানী কেচ্ছা", দেশ : সাহিত্য সংখ্যা, (কলিকাতা : ১৩৭২)

সেলিম আল দীন : "বাঙলা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্বের পূর্বাপর", *থিয়েটার স্টাডিজ*, (ঢাকা : নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, জুন ১৯৯৫)

সৈয়দ মুর্তাজা আলী : "কুষ্টিয়ার কথা", আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পাদিত), *কুষ্টিয়া পাবলিক লাইব্রেরী : প্লাটিনাম জুবিলী স্মারকগ্রন্থ*, (কুষ্টিয়া : ডিসেম্বর ১৯৮৫)

Syed Jamil Ahmed : "Buddihist Theatre in Ancient Bengal", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, (Dhaka : June 1995)

গবেষণা-পদ্ধতি বিষয়ক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা :

Joseph Gibaldi : *M L A Handbook for Writers of Research Papers*, (New Delhi : 2000)

জগমোহন মুখোপাধ্যায় : *গবেষণা-পত্র অনুন্ধান ধারণা*, (কলকাতা : ১৯৯২)

সনৎ কুমার মিত্র (সম্পাদিত) : *লোকসংস্কৃতি গবেষণা*, লোকসংস্কৃতি : পদ্ধতিবিদ্যা (Methodology) বিশেষ সংখ্যা, ১৪ বর্ষ ৪ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র ১৪০৮, (কলিকাতা : ২০০২)

সেলিম আল দীন (সম্পাদিত) : *থিয়েটার স্টাডিজ*, ৮ম সংখ্যা, জুন ২০০১, (ঢাকা : নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ২০০১)